# একটি শহরের অলৌকিক কাহিনি

সংস্কৃতি সংসদ

১/১২ রোল্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-২০

## ॥ এক ॥

রাতের ট্রেনটা কখন আসবে কোনো ঠিক নেই। টাইমটেবিলে লেখা আছে, আসার কথা এগারোটা পঁচিশে, কিন্তু বারোটা সাড়ে বারোটার আগে ট্রেনের টিকিও দেখা যায় না। আধঘণ্টা আগে ঘণ্টা বাজলেই বোঝা যায়, তিনি আসছেন। সন্ধের পরই স্টেশনটা ঘুমিয়ে পড়ে। সাড়ে ছ-টার ট্রেন চলে যাবার আধঘণ্টার মধ্যেই গোটা চত্বর ফাঁকা। গরমকালে তাও রাত পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মে কিছু লোকজন থাকে, অন্ধকারে মধু গোঁসাইয়ের লোকেরা গাঁজার ঠেক বসায়। সুবলা মাসির দু-একটা মেয়েকে দেখা যায় এদিক-ওদিক ঘুরঘুর করতে। হাওয়া খেতেও কিছু লোকজন জড়ো হয়। তবে নানা কারণে প্ল্যাটফর্মটার বদনাম আছে, কাজেই তখনো যে খুব ভিড় হয় তা নয়। আসলে প্ল্যাটফর্মটা রাস্তা থেকে অনেকটা উঁচুতে। স্টেশনের বাড়িটা রাস্তার লাগোয়া, সে-বাড়ির পাশ দিয়ে খাড়া ভাঙাচোরা সিঁড়ি বেয়ে অনেকটা উঠে তবে প্ল্যাটফর্ম। স্টেশনের এপার থেকে ওপারে যাবার রাস্তাটা রেললাইনের তলা দিয়ে, তাই নেহাত দরকার না পড়লে কেউই ওপরে ওঠে না। শীতকালে তো কথাই নেই, আর গত দু দিনে শীতটাও পড়েছে জাঁকিয়ে। শেষ যে লোককে নব নামতে দেখেছে সে হল হেমন্ত। 'অন্ধ নাচারকে দুটি ভিক্ষে দাও' বলে ভিক্ষে করলেও, হেমন্তের আসলে বাঁ চোখ কানা, ডান চোখে দিব্যি দেখতে পায়। কিন্তু সে-ই বা এত রাতে কী করছিল? অবশ্য হেমন্তের কাজকারবার আলাদা, সত্যি মিথ্যে জানে না, কিন্তু লোকে বলে, সুবলা মাসির হয়ে স্টেশনের কাজকর্ম হেমন্তই দেখাশোনা করে।

স্টেশনের সামনের চাতালটায় আলো জ্বলে না বহু দিন। আলো বলতে আশেপাশের দোকানের আলো যেটুকু। কিন্তু তারাও শীতের রাতে খদ্দেরের অভাবে এক এক করে ঝাঁপ ফেলেছে অনেকক্ষণ। এখন খোলা বলতে দুটো, সুশান্তের পান বিড়ি আর রামপূজনের ছোলামুড়ির দোকান। সুশান্তের দোকান অবশ্য রোজই খোলা থাকে এ সময়। স্টেশনবাড়ির দালানের পেছনে রামবাবুর

চোলাইয়ের ঠেক। দিনের বেলায় সামনে ঘুগনি, আলুর দমের একটা ঢপ থাকে, সন্ধের পর সে-সব উঠে যায়। সুশান্তের দোকানের খদ্দের আসে ওই ঠেক থেকে। কিন্তু রামপূজনের দোকান আজ এত রাত পর্যন্ত খোলা কেন, কে জানে। স্টেশনের ছোটো রাস্তা যেখানে গিয়ে বড়ো রাস্তায় পড়েছে, সেই মোড়টায় কারা যেন পুরোনো সাইকেলের টায়ার জ্বালিয়েছে, তাকে ঘিরে একটা ভিড়। সেই জ্বলন্ত টায়ার আর দুটো দোকানের আলো মিলে তাদের এই রিকশা স্ট্যান্ডে যত না আলো, তার থেকে বেশি আঁধার।

স্ট্যান্ডে পাঁচটা রিকশ। তার থার্ড লাইন। অবশ্য এত রাতে ফার্স্ট লাইন আর লাস্ট লাইন, সবই এক। ফার্স্টে সনাতন, পরের লাইন আব্বুর, তারপর তার, তারপরে জব্বর, কিন্তু শেষ লাইনটা কে দিল সেটা নব খেয়াল করেনি। সে চাদর মুড়ি দিয়ে সিটে বসে, আশেপাশে কেউ নেই। আগুনের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে খুব ইচ্ছে করছে, কিন্তু পোড়া টায়ারের গন্ধে তার ভীষণ গা গোলায়। তাই এই হাড়কাঁপানো শীতেও সে চুপচাপ একা বসে।

ওপরের প্ল্যাটফর্মে কেবল দুটো আলো জ্বলে। একটা নীচে নামার খাড়া সিঁড়িটার মুখে, আর একটা প্ল্যাটফর্মের একদম দক্ষিণ দিকে। দূরের আলোটার চারদিকে গোল হয়ে আছে কুয়াশা। এ স্টেশনে চালু একটাই প্ল্যাটফর্ম। মাঝখানে একটা ভাঙাচোরা প্ল্যাটফর্ম, যেটা ফাঁকাই পরে থাকে, আর তারপর সারিসারি রেল লাইন। যখন বড়ো নদীর ওপর রেলব্রিজ হয়নি, তখন এই স্টেশনের ছিল রমরমা। অনেক দিন হয়ে গেল, তাও নবর চোখে ভাসে, সারাদিন গাদাগাদা ট্রেনের যাতায়াতে স্টেশনটা একদম গমগম করত। লাইনের পর লাইন সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত মালগাড়ি। এখন শীতের রাতে একদম খালি পড়ে আছে লাইনগুলো। দিনের আলোয় দেখা যায়, চালু প্ল্যাটফর্মের লাগোয়া লাইনটা বাদে বাকি লাইনগুলোতে জং ধরেছে। মাঝদুপুরের রোদেও সেগুলো আর চকচক করে না। একদম শেষ লাইনের ওপর বহুদিন থেকে দাঁড়িয়ে আছে গোটা চারেক মালগাড়ির ডিব্বা। রেল কোম্পানি কেবল না, এই টাউনের লোকেরাও ওগুলোর কথা বেমালুম ভুলে গেছে। লাইনগুলো শেষ হলে জমিটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে টাউনের একমাত্র কবরখানার দিকে। পার্টিশনের আগে কালীটোলার দিকে সবটাই ছিল মুসলমান বসতি, এখন আছে বড়োজোর বিশ-পঁচিশ ঘর। আর কবরখানাও আস্তে আস্তে হয়ে গেছে ঝোপজঙ্গালে ভরা পোড়ো জমি। কবরের ওপর ভাঙাচোরা ইটের ঢিপিগুলো শুধু জানান দেয়, এর নীচে মরা মানুষের কবর আছে। কিন্তু নতুন হোক পুরোনো হোক, কবরখানা, তাই গোটা টাউনের লোকেরা

জায়গাটা এড়িয়ে চলে। দু-একটা নতুন কবর যা দেওয়া হয়, কবরখানার সামনের দিকে, রেললাইনের লাগোয়া দিকটায় বিশেষ কেউ আসে না। কয়েক বছর আগে বানজারারা এসে ঠেক গেড়েছিল পড়ে থাকা মালগাড়ির ডিব্বাগুলোয়। তারপর একদিন সন্ধের সময় স্টেশন রোডের ছেলেদের সঙ্গে ছুরি মারামারি হল, আর পরের দিন সকালে বানজারারা হাওয়া। তারপর থেকে ডিব্বাগুলো আবার খালি। ডিব্বাগুলোর এখন রং চটে গেছে, ভেতরে আগাছা গজিয়ে উঠেছে। শীতের উত্তরের হাওয়া প্ল্যাটফর্মের ধুলো উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে লাইনগুলোর ওপর দিয়ে, ধাক্কা খাচ্ছে ডিব্বাগুলোর গায়ে। ভাঙা ডিব্বার ফুটোফাটা দিয়ে হু হু করে ঢুকছে বরফের মতো ঠান্ডা হাওয়া, অমঙ্গলের শাঁখের আওয়াজ তুলছে। আর একটা অংশ ছুটে যাচ্ছে কবরখানার ওপর দিয়ে, বুনো কুল আর বাবলাগাছের পাতা বেয়ে সেই বরফঠান্ডা হাওয়া নেমে আসছে কবর চাপা দেওয়া শ্যাওলা ধরা ইটের স্তূপে। এ রাত নবর ভালো লাগছে না। কেন যেন মনে হচ্ছে আজ অমাবস্যা, কিন্তু সে নিশ্চিত না, কারণ বহুদিন হল নব চাঁদের দিকে তাকায়নি।

নবর হঠাৎ সব রাগ গিয়ে পড়ল নিত্যবাবুর ওপর। শালা, এই লোকটার জন্যই আজ এত দুর্ভোগ। এই রিকশর লাইনে বারো-তেরো বছর হয়ে গেল, কোনো দিন এ রকম রাতে ডিউটি করতে হয়নি। তার ঘর স্টেশন থেকে অনেকটা দূর, টাউনের একদম অন্য দিকে। ঝামেলা শুরু গত বছর শীতকাল থেকে। নিত্যবাবু কলকাতা না কোথায় যেন গিয়েছিল। রাতের প্যাসেঞ্জার যথারীতি দু'ঘণ্টা লেট। অন্য দিন কেউ না কেউ থাকে, তাদের কপাল খারাপ, সেদিনই রাতে স্টেশনে কেউ ছিল না। ওই শীতের রাতে বুড়োকে একা হেঁটে ফিরতে হয়, মাঝখানে কুকুরের তাড়া খেয়ে ধুতিটুতি ছিঁড়ে একশা। অন্য কেউ হলে তাও কথা ছিল, নিত্যবাবু টাউনের চেয়ারম্যান। পরের দিনই তলব, সবাই তাদের এই মারে কি সেই মারে। সেদিনই ফতোয়া জারি হয়ে গেল রোজ দশজনকে হোলনাইট ডিউটি দিতে হবে। হাতে পায়ে ধরে রাজি করা গিয়েছিল—সারা রাত না, থাকতে হবে রাতের প্যাসেঞ্জার অব্দি, আর দশটা কমে সাত হয়েছিল। নিজেরা বসে ডিউটি ভাগ করে নিয়েছিল। শুধু ছাড় ছিল কদমতলার শিবুর [illegible] বউটা পাগল। রাতে ফিরে শিবু রান্না করলে বাচ্চাগুলো খেতে পায়। নবর ডিউটি মাসের প্রথম শুক্কুরবার, অবশ্য আগে জানালে অসুখবিসুখ দরকার-অদরকারে ছাড় আছে। সবাই ঠিকঠাক ডিউটি করে না, আজই যেমন সাতজনের জায়গায় আছে পাঁচজন। তবে নব ঠিকঠাক ডিউটি করে। এক-আধ দিন ডিউটিতে ডুব দিলে কিছুই না। কখনো-সখনো নিত্যবাবুর

দারোয়ান আছে লখন, সে দেখতে আসে সবাই ডিউটি দিচ্ছে কিনা। বিশেষত যখন লখনের মাল খাবার পয়সার টান পড়ে, তখন। সে আর ক-দিন? কিন্তু লখন এলে ঝামেলা। ডিউটিতে না থাকলে ঝামেলা, বোর্ডের অফিসে গিয়ে দু টাকা ফাইন দাও। আর ডিউটিতে থাকলে ডবল ঝামেলা, লখন এদিক-ওদিক দেখে রামবাবুর ঠেকে গিয়ে বসবে। তিনি মাল গিলবেন আর তার পয়সা দিতে হবে লাইনে যারা আছে তাদের। থানার সেপাইগুলোর সে ঝামেলা নেই, অন্তত ওদের মাল খাবার পয়সা কাউকে দিতে হয় না, ওটা রামবাবুর যায়। মাল খাওয়া হয়ে গেলে লখনকে আবার বাড়ি পৌঁছে দিতে হয়। মাঝখান থেকে রাত জেগে বিনা পয়সার ডিউটি। মনে মনে মা-মাসি তুলে খিস্তি মারতে মারতে যখন নিয়ে যাবে তখন মালে টইটুম্বুর হয়ে সওয়ারি গলা ছেড়ে গান ধরবেন,

বাবুর বিবির ঢং দেখে ভাই
বুকখানি মোর জ্বলে রে

তখন মনে হয় গাড়ি থেকে নামিয়ে পোঁদে এক লাথি মেরে শুয়োরের বাচ্চাকে নর্দমায় ফেলে দিয়ে চলে যাই।

কিন্তু এখন জাড়ে কাঁপতে কাঁপতে রিকশয় বসে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই। এই জাড়ের হাত থেকে বাঁচবার একটা রাস্তা হল রামবাবুর ঠেকে গিয়ে বসে পড়া, কিন্তু সে রাস্তাও তার বন্ধ।

গত বছর আশ্বিনে পুজোর ঠিক আগে ব্যথাটা উঠেছিল। টানা প্রায় তিন দিন। কমে যাবে ভেবে সেদিনও নব গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল, কিন্তু ব্যথাটা বেড়ে যাওয়ার বিকেলের পর আর টানতে পাবেনি। সারারাত ব্যথায় কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করেছে, সকালবেলায় বিছানায় মাথা তোলার মতো অবস্থাও ছিল না। শিবতলার ঠাকুরের জল, সুশীল ডাক্তারের হোমিয়োপ্যাথির গুলি—কিছুতেই যখন ব্যথা কমে না, তখন চম্পাই ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। হাসপাতালের ডাক্তার পেট টেপাটেপি করে তার ব্যথা বাড়িয়ে দিয়েছিল। ওষুধ দিয়েছিল দেড় টাকার। কিন্তু ব্যথাটা কমেছিল সে-দিন রাত থেকেই। ডাক্তার তার আসল সর্বনাশ করেছিল অন্য জায়গায়। পেট-টেট দেখে ওষুধ লিখতে লিখতে বলেছিল, আর কোনো দিন যদি মদ খাও, আমার কাছে আসতে হবে না ; হাসপাতালের পেছনে মর্গ আছে, সোজা ওখানে গিয়ে শুয়ে পড়বে। ব্যাস, চম্পাকে আর কে পায়। বোধহয় হাসপাতালের গেট থেকে খিস্তি শুরু, আর সে খিস্তি পারলে এখনো দেয়। তারপর থেকে নব আর মাল ছোঁয় না। কিছুটা সেই

পেটব্যথার ভয়ে, আর কিছুটা চম্পার খিস্তির ভয়ে। কিন্তু এখন এই হাড়কাঁপানো জাড়ে গুটিশুটি মেরে বসতে থাকতে থাকতে ভীষণ ইচ্ছে করছে একবার ঠেকে দিয়ে বসতে। এই ঠান্ডায় জলটল না মেরে বড়ো এক চুমুক—তেতোতে মুখটা একদম বিষ হয়ে যাবে, গলার কাছ থেকে জ্বালাতে জ্বালাতে মালটা নামতে থাকবে পেটের দিকে, কিন্তু একটু পরেই মড়ার মতো ঠান্ডা পা-টায় সাড় ফিরে আসতে থাকবে। এই সাড় ফিরে আসাটা যে কী আরামের! তার কিছুক্ষণ পরে গরম হবে কানটা, তখন চাদরটা মাথা থেকে খুলে বসতে পারবে। নাকটা তখনো ঠান্ডা থাকবে, সে থাক গিয়ে। আচ্ছা, মাল খাবার দরকার নেই শুধু ওই ঠেকে গিয়ে বসবে। এই বরফের মতো ঠান্ডার থেকে রামবাবুর ঠেকটা অন্তত গরম। দরমার বেড়াটায় যতই ফাঁকফোকর থাক, এই বরফের মতো ঠান্ডার থেকে রামবাবুর ঠেকটা অন্তত গরম। দরমার বেড়াটায় যতই ফাঁকফোকর থাক, এই চাকুর ফলায় মতো হাওয়াটা থাকবে না। আর অতগুলো লোক গা ঘেঁযাঘেঁযি করে বসলে গরমও হয়।

কিন্তু ওখানে গিয়ে বসলে চেনাজানা যারা আছে, তারা নানা রকম আওয়াজ দেবে। মাল ছাড়া নিয়ে তাকে কম আওয়াজ খেতে হয়নি। আর নানা তালে যদি মালটা খেয়ে ফেলে? কী হবে? এতদিন পরে একবার যদি খায়ও ব্যথাটা নিশ্চই আবার উঠবে না। কিন্তু চম্পা? ভয়টা সেখানেই। আচ্ছা, আজ যদি সে মাল খায়, কী হবে? সে তো কারও বাপের পয়সায় খাচ্ছে না। নব জানে, আজ চম্পা কিছু বলবে না, শধু গুম হয়ে থাকবে আর কয়েক বার তাকে মাপবে। আসল খেল শুরু হবে কাল সকাল থেকে—নবর বাপঠাকুরদা দিয়ে শুরু হবে, আর শেষ হবে কাকে দিয়ে আর কত দিনে, ভগবানও জানে না। আগে আগে মাথা গরম হলে সে হাত চালিয়ে দিত। তাতে মুখ বন্ধ হত, কিন্তু ঝামেলা বাঁধত অন্য দিকে। সঙ্গে সঙ্গে কথা বন্ধ, আর পরের দিন সকাল থেকে হেঁশেল বন্ধ। ঘরে ছেলেপুলে নেই, বাবুদের বাড়িতে ঠিকে কাজ করতে গিয়ে দুপুরে কারো রোয়াকে শুয়ে থাকলে কে আর কী বলবে। প্রথম প্রথম সে চম্পাকে খুঁজতে বেরুত। তার মতো চম্পারও তিনকুলে কেউ নেই। বিয়ের আগে যে মাসির ঘরে চম্পা থাকত, ক-মাস পরে সে মাসিও রেলে কাটা পড়ার পর আত্মীয় কুটুমের পাট খতম। খোঁজ করা মানে, যে সব বাড়িতে কাজ করতে যায়, সেখানে। খুঁজে পাবার পর হাতে-পায়ে ধরে ফিরিয়ে আনা। পরে অবশ্য আর খুঁজতে বেরুত না। এমনিতেই সারা সকাল রোদ্দুরে রোদ্দুরে গাড়ি টেনে মাথা গরম থাকে, তারপর বাবুদের বাড়ি থেকে চম্পাকে ডাকতে গেলে গিন্নি মায়েরা নানা কথা শোনায়।

সে সব জ্ঞান শুনলে তার একদম মাথা গরম হয়ে যায়, মুখে খারাপ কথা চলে আসে। বাবুদের হেঁশেলের খবর তারা যেন জানে না। তারা গরিব ছোটোলোক, তারাই কেবল বউয়ের গায়ে হাত তোলে। আর বাবুরা সব তাদের গিন্নিদের আদর করে শিমুল তুলোয় শুইয়ে রাখে? যাকগে, সে সব তো আর বলা যায় না। তার থেকে বটতলায় ছাতু খেয়ে আবার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ো. মেজাজ না হোক শরীর তো ঠান্ডা হয়। যা হবার তা রাতে হবে। আর যাই হোক, রাতে ঘরে ফিরবে। চম্পার আবার ভীষণ ভূতের ভয়। মাঝে মাঝে মাথা গরম হলে তার মনে হয়, বোধহয় তার মাসতুতো বোন অনুই ঠিক বলে, সে একটা বউয়ের পা-চাটা ম্যাদামুখো মিনসে। ধুর শালা, সে কেন অন্যের রোয়াব সইতে যাবে? পারে না কিছু করতে একটাই কারণে, রাগ করে চম্পাটা বোধহয় কিছু না খেয়ে থাকে। দুনিয়ার অনেক কিছুকে নব ভয় পায় না, কিন্তু ভয় পায় পেটের খিদেকে। খিদে পেলেই তাকে তাড়া করে আসে অনেক দিন আগের কথাগুলো। যে কথাগুলোকে নব প্রাণপণে ভুলতে চায়। উঠোনে পড়ে থাকা সারা জীবন কোনো কাজ না করা তার অপোগণ্ড মরা বাপ, সে কোনো এক ধ্যাড়ধেড়ে গ্রাম—যে গ্রামের নাম নব মনে আনতে চায় না। নোংরা ন্যাকড়া পরা তার মা কোন এক শহরের কোন সব রাস্তায় তাকে টানতে টানতে নিয়ে ভিক্ষে করত। মায়ের বুকের দুধের কথা তার মনে নেই, কিন্তু মনে আছে উকুনে বিড়বিড় করা তার মা-র জট পাকানো চুল। নব এসব কিছু মনে রাখতে চায় না। কিন্তু না চাইলেও তার মনে থেকে যায় শুধু খিদে, দুনিয়া গিলে খেতে চাওয়া চুলোর গনগনে আঁচের মতো এক খিদে। মা কালীর কিরে, সে চম্পাকে ভালোবাসে। চম্পা খিদেয় কষ্ট পাক, মরে গেলেও এটা নব চায় না। খিদেই দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো শাস্তি। ছেলেপুলে নেই, মিউনিসিপ্যালিটির জমিতে নিজেদের হাতে তোলা ঘর, কাউকে ভাড়া দিতে হয় না। অল্প হলেও দু জনের আয়, তাদের দু বেলা দু মুঠো জুটে যায়। নব এতেই খুশি, আর একজন মানুষের জিন্দেগিতে এর থেকে বড়ো সুখ আর কী বা হতে পারে? রেশনের চালের মধ্যেকার কাঁকরের মতো সুখের মধ্যে এই দুঃখের মিশেলকে নব বিশেষ পাত্তা দেয় না।

গায়ে হাত তোলা সে একদম বন্ধ করে দিয়েছে দুলালের বউটা গলায় দড়ি দেবার পর। এটা ঠিক, দুলালের মতো লাথখোর লোক এই টাউন ঢুঁড়লে আর একটা পাওয়া যাবে না। সবাই বলেছিল বউটা মরে বেঁচেছে। লাশটা বোধহয় দুদিন ধরে ঝুলছিল। মড়া পচার গন্ধে টের পেয়ে তাদের বস্তির লোকেরা দরজা ভেঙে লাশটা নামিয়েছিল। কালচে নীল জিভটা বেরিয়ে এসেছে। কোণ দিয়ে

পিঁপড়ে ঢুকে বাঁ চোখের অর্ধেকটা খেয়ে ফেলেছে। মুখের চারিদিকে ভনভন করছে মাছি। নাক আর কষ দিয়ে গড়াচ্ছে থকথকে কালো রস। আঁচলটা মাটিতে লুটোচ্ছে। বুকটা খোলা। ততক্ষণে লাশটা ফুলে উঠেছে। নব কয়েক দিন ঘুমোতে পারেনি। দুলালের বউটা বাঁজা ছিল, আর চম্পারও তো বাচ্চাকাচ্চা হয়নি। কার দোষ নব জানে না। মাদারতলায় গুনিনের জল, কালীথানের প্রসাদি ফুল—কিছুতেই কিছু হয়নি। চম্পা বোধহয় আরো অনেক জায়গায় গেছে, কিন্তু লাভ হয়নি। চম্পা শেষে ধরেছিল, যত টাকা লাগুক নতুনপল্লির স্বদেশ ডাক্তারকে দেখাবে। স্বদেশ ডাক্তার বিলেত ফেরত। নব রাজি হয়নি। ডাক্তারবাবু যত ভালো লোকই হোক, অন্য কারুর কাছে গিয়ে সে এ সব কথা বলতে পারবে না। আর ভেতরে ভেতরে তার একটা ভয় আছে, দোষ বোধহয় তার নিজের। কেন এই ভয়, সে জানে না। ডাক্তারের কাছে গেলে সে ধরা পড়ে যাবে, আর পাঁচজন জানাজানি হয়ে গেলে গোটা টাউনে সে আর মুখ দেখাতে পারবে না। চম্পা কোনো কারণ ছাড়াই মাঝেমাঝে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। দু একদিন রাতে ঘুম ভেঙে গেলে দেখেছে বউটা একা চুপচাপ উঠোনে বসে আছে। জিজ্ঞাসা করলে কিছু বলে না। নব বোঝে এ সবই মা না-হতে পারার দুঃখে। দুলালের বউটা গলায় দড়ি দেবার পর পুনিমাসি বলেছিল, বাঁজা মেয়েমানুষের কোনো পিছুটান থাকে না। সে দিন থেকেই তার ভয়, রাগ করে চম্পা যদি কিছু করে বসে। ভগবান জানে, সে চম্পাকে কোনো কষ্ট দিতে চায় না।

এই সব ভাবতে ভাবতে নবর পেয়ে গেল খিদে। বিকেলে বড়ো ঘড়ির মোড়ে মুড়ি আর আলুর চপ খেয়েছিল, সে সব কখন হজম হয়ে গেছে। বললে লোকে নজর দেবে, আজ তার আমদানি ভালো হয়েছে। বড়ো ঘড়ির মোড়ের পর থেকে তাকে আজ বেশি বসে থাকতে হয়নি। প্যাডল মেরে মেরে পা টনটন করছে। এই রাতের ঝামেলাটা না থাকলে খুশ হয়ে বাড়ি যেতে পারত নব। বাড়ি যেতে পারলে ভাত খাওয়া যায়। অবশ্য ভাত এতক্ষণে ঠান্ডায় কড়ি কড়ি হয়ে গেছে। চম্পা কাজ থেকে ফিরেই ভাত চাপিয়ে দেয়। আজ চম্পা কী রেঁধেছে? শীতকালে তরকারিটা খারাপ থাকবে না, তেলের টানাটানি না থাকলে বেগুন ভাজতে পারে। ভাজা না হোক, বেগুন পোড়া। কাঁচালংকা আর কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে জমে যায়। মোদ্দা কথা, বেগুন হলে নবর আর কিছু লাগে না। এতেই এক থালা ভাত উঠে যায়। মনে পড়ে গেল, আজ বড়ো ঘড়ির মোড়ে ফুলকপির বড়া বেচছিল এক আনা জোড়া। নব কেনেনি। যদি আজ চম্পা কুঁচো মাছের ঝাল করে? আলু বেগুনের তরকারি আর শেষ পাতে শুকনো লংকা পোড়া দিয়ে

কয়েতবেল মাখা? কপালে থাকলে বাবুদের কারোর বাড়িতে যদি খ্যাঁট থাকে, আর চম্পা বাড়ি ফেরে পোনা মাছের কালিয়া দু পিস নিয়ে? চম্পা বাবুদের বাড়িতে কাজ না নিলে এ সব খাবারের কথা নব বোধহয় কোনো দিন জানতই না। যাই বলো বেড়ে খেতে। ধুর শালা. সেও তো পোনা মাছ কখনো কিনতে পারে, বাবুদের বাড়ির মতো অত তেল মশলা দিতে না পারে, কিন্তু চম্পা রাঁধবে। সে কোনো দিন বড়ো পোনা মাছ কেনে না, ইচ্ছে হলেও এক আনা দিয়ে দু খানা ফুলকপির বড়া কিনে খায় না। কেন? এক-আধদিন করলে না খেতে পেয়ে মরবে না। চম্পা তিন বাড়িতে ঠিকে কাজ করে। মালিক কালুমাস্টারকে ডেইলি তিন টাকা দিয়েও হাতে যা থাকে তাতে শখ করে দু একটা জিনিস করতেই পারে। করে না বোধহয় ওই খিদের ভয়ে, যদি আবার ফিরে আসে।

যখন সে এ লাইনে এল তার আগে কোনো চালচুলো ছিল না। স্টেশন মোড়ের আশেপাশে নানা ধান্দায় ঘুরে বেড়ানো, এই ছিল কাজ। রাতে শোয়ারও কোনো জায়গা ঠিক ছিল না। কোনো দিন খাওয়া জুটত, কোনো দিন জুটত না। বিয়ে-থার কোনো ব্যাপারও নেই। নিতাইদা তাকে নিয়ে গিয়েছিল কালু-মাস্টারের কাছে। কালুমাস্টার তখনো থানার হেড কনস্টেবল। বড়োবাবুর থেকেও বেশি দাপট। কুড়ি পঁচিশটা রিকশর মালিক। নিতাইদা এ লাইনে টেনেছিল বহু দিন। কিন্তু বুড়ো হয়ে হাঁপ ধরে যেত শেষকালে, আর টানতে পারছিল না। নিতাইদার ছেলে কাজের খোঁজে কলকাতায় চলে গিয়েছিল. তার আর কোনো খোঁজ নেই। বুড়োকে অনেক তেল দিয়ে নব কাজটা ধরেছিল। কালুমাস্টারকে তখন দিতে হত ডেইলি দু টাকা। আর নিতাইদার ঘরেই সে রাতে থাকত, গাড়ি থাকত নিতাইদার উঠোনে। নিতাইদাকে হপ্তায় পাঁচ টাকা দিতে হত। নবর কাছে ওই তখন স্বর্গ। প্রথম প্রথম যখন হাতে টাকা আসত, তখন ভয় হত কালুমাস্টার যদি কাল থেকে গাড়ি না দেয়, তা হলে আবার না খেয়ে থাকতে হবে। যতটা পারত হাত টেনে খরচ করত। তবে কিছুদিন যেতেই বুঝে গিয়েছিল, প্যাডল ঠ্যালার জোর থাকলে কাজ তার যাবে না। কালুমাস্টার গেলে অন্য মালিক আছে। কিন্তু তখন আবার মাথায় চাপল—ঘর বসাবে, বিয়ে করবে। বিয়ের পর মাথায় চাপল, নিজে গাড়ি করবে। তাদের লাইনে নিজের গাড়ি যে চালায়, সেই মাস্তান। নিতাইদার কপাল খারাপ আর তার কপাল ভালো, বছর ঘুরতেই নিতাইদা চোখ বুজল। ছেলেপুলে নেই দুজনের সংসার, মাসে তখন নবর দশ বারো টাকা জমছে। নতুন গাড়ির দাম তখন তিনশো টাকা মতো। সিট আর মনের মতো করে সাজাতে আরো পঞ্চাশ। বছর দুয়েক ঠিকঠাক খাটলেই এ টাকা উঠে আসবে। নব তখন

রোজ মনে মনে নতুন গাড়ির সাজগোজ কেমন হবে তার খোয়াব দেখে। নতুন গাড়ির কথা ভাবতেই তার গাড়ির স্পিড বেড়ে যায়, মনে হয় সে উড়ছে। নতুন গাড়িতে চম্পাকে সওয়ারি করে সে নাইট শোতে ফুল্লরায় সিনেমা দেখতে যাবে। দুজনে বসবে এক টাকা চার আনার টিকিটে। ইন্টারভ্যালে বরফকাঠি নিয়ে আসবে চম্পার জন্য। ঠিকে কাজ ছাড়িয়ে দেবে চম্পার, ভদ্রলোকদের বাড়ির মতো তার বউও বাইরের কাজে যাবে না। গাড়িতে সে ঠাকুর দেবতার ছবি লাগাবে না। ছবি দেবে দিলীপকুমার আর মধুবালার। গোমসকে দিয়ে গাড়ির পেছনে ঢেউ খেলিয়ে লেখাবে, চম্পাকলি। সিট হবে টকটকে লাল, হ্যান্ডেলের দুপাশে ঝুলবে লাল রঙের ঝুলমি। হ্যান্ডেলে লাগাবে একটা আয়না। নীল রঙের টুপি পরে গাড়ি ছোটাবে, আড়চোখে তাকাবে আয়নার দিকে। গাড়ি দেখে টাউনের সবাই চিনবে এটা কার গাড়ি। একটা নিজের গাড়ি মানে আরো টাকা। আর একটা নতুন গাড়ি কিনতে আর কতদিন? এ ভাবে চালাতে পারলে, কালুমাস্টারের মতো না হোক, সেও ছোটোখাটো মালিক হবে। সকালবেলা মুখে নিম ডাল দিয়ে, নীল লুঙ্গি আর ধপধপে সাদা হাতকাটা গেঞ্জি পরে নব যাবে স্ট্যান্ডে ছেলেরা ঠিকঠাক গাড়ি বার করেছে কিনা দেখতে, ফেরার সময় ছাতুবাজার থেকে কাটা পোনা নিয়ে ফিরবে। চম্পা কালিয়া বানাবে বেশি করে তেল মশলা দিয়ে।

এখন আর নব এ সব কথা ভাবে না, কিন্তু পয়সা খরচা না করার অভ্যাসটা রয়ে গেছে। এমনকী দু-পাঁচ টাকা জমল কিনা খোঁজও নব রাখে না, যা করার চম্পাই করে। যদি কাল কেউ এসে টাকা এনেও তার হাতে দেয়, তবুও সে নতুন গাড়ির কথা ভাববে না। নতুন গাড়ির কথা ভাবলে তার যেটা হয় সেটা যে আসলে কী, তাও নব জানে না। ভয় না রাগ, না কি দুঃখ, সে বোঝে না। সব মিলিয়ে খারাপ লাগে, ভীষণ খারাপ লাগে। এত খারাপ আর কিছুতে লাগে না।

## ॥ দুই ॥

রাতে ফিরে নব গুনে দেখেছিল জমেছে দুশো উনআশি। যদি এর থেকে আড়াইশো টাকা দেয়, তবে হাতে আসবে পাঁচশো। প্রথমে আসলের আড়াইশো। কিছুদিন পরে মাস্টারমশাই বাকিটা দিয়ে দেবে, ততদিনে আর একটু জমিয়ে হাতে থাকবে শ-খানেক, সব মিলিয়ে ছশো মতো। গাড়ি বানিয়েও হাতে যা থাকবে চড়াইডাঙার ওদিকে দুটো ঘর তোলার মতো অল্প একটু জমির বায়না করে দিতে পারবে। একটু দূর পড়বে, কিন্তু তার তো গাড়িই থাকবে। আর ঠিকে কাজ ছেড়ে দিলে চম্পাকেও রোজ এতটা হেঁটে আসতে হবে না।

বটতলার মোড়ে সে ছিল। দূর থেকে খুকিই তাকে ডাকে। লাইনে সে ফার্স্ট ছিল না, কিন্তু বাঁধা বাড়ির প্যাসেঞ্জার নিতে লাইন লাগে না। এখন অবশ্য মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি তার বাঁধা বাড়ি না, কিন্তু লাইনের সবাই সেটা জানে না। গাড়িতে উঠতে উঠতে মাস্টারমশাই বলল,

—বুঝলি নব, আমাদের সুস্মিতা কলকাতার বড়ো স্কুলে ভরতি হতে যাচ্ছে।

—জানো নবকাকু, স্কুলের সামনে অনেক বড়ো মাঠ। সেখানে দোলনা আছে। আর বাসে করে স্কুলে যেতে হয়।

গোটা রাস্তাটায় খুকি চড়াই পাখির মতো কিচিরমিচির করে গেল। যে স্কুল সে এখনো দেখেনি সেই স্কুলের গল্প। এই টাউনের বাচ্চাদের মুখে বুলি ফুটলেই রিকশওয়ালাদের নাম ধরে ডাকে। একমাত্র খুকিই তাকে কাকু বলে ডাকে। দু মাস আগে পর্যন্ত রোজ ভোরবেলায় সেই খুকিকে স্কুলে পৌঁছে দিত। সে স্কুল অবশ্য টাউনের মেয়েদের বড়ো স্কুল, নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়। নতুন ক্লাসে ওঠবার পর মাস্টারমশাই ডেকে বলেছিল, খুকি বড়ো হয়ে গেছে, তাকে রিকশ করে স্কুলে পৌঁছে দিতে হবে না। নব বুঝেছিল কথাটা মিথ্যা, আসলে পয়সার জন্য রিকশ ছাড়িয়ে দিচ্ছে। নবর নিজের ছেলেমেয়ে নেই, কিন্তু ভদ্রলোকের ঘরের মেয়েকে নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসে এ কথাও বলা যায় না।

খুকিটাকে সে সত্যিই ভালোবাসে। এই তো সে দিন তার চোখের সামনে মেয়েটা হল। মাস খানেকের বাচ্চাটাকে নিয়ে কলকাতা থেকে বউদি স্টেশনে নামল, মনে হয় এই সে দিন। বাবা মা তো সুমি বলে ডাকে, কিন্তু নব ডাকে খুকি বলে। চম্পাও জানে, মাঝে মধ্যে আচার বানালে পরিষ্কার বয়ামে খুকির জন্য আগে তুলে রাখত। কত দিন স্কুল থেকে বেরিয়ে এসে খুকিটা তার কাছেই বায়না করত হজমি কিংবা চানাচুর কিনে দেবার জন্য. কোনো দিন নব না বলেনি। বউদি জানতে পেরে পরে বকাবকি করত। অবশ্য একটু বড়ো হয়ে আর বায়না করত না। সে গরিব হতে পারে, তারও তো শরীরে মায়াদয়া আছে। নব আপত্তি করে বলেছিল, তার টাকাপয়সা লাগবে না—সে আগের মতোই খুকিকে স্কুল থেকে দেওয়া-আনা করবে। তার কথা শুনে মাস্টারমশাই উল্টে রেগে গেল। বলল, টাকাপয়সা কোনো ব্যাপার না। খুকি বড়ো হয়েছে, তাকে নিজের পায়ে চলতে শিখতে হবে। নব আর কী বলে? চুপ করে রইল। প্রথম প্রথম তাও মাঝপথে খুকিকে ধরে গাড়িতে তুলে স্কুলে পৌঁছে দিত। পরে নানা ঝামেলায় তাও আর করে উঠতে পারেনি।

বছর দেড়েক হল মাস্টারমশাইয়ের চাকরি নেই। এ নিয়ে গোটা টাউন তোলপাড় হয়েছে ক-মাস। সেখানেও শালা ওই নিত্যবাবু। এ টাউনে যা হবে, সব কিছুর মাথায় থাকবে নিত্যবাবু। মাস্টারমশাইদের স্কুলের কমিটির প্রেসিডেন্ট না কী বলে তাই ছিল নিত্যবাবু। এমনিতে ব্যাটা কত বড়ো পণ্ডিত কে জানে, সে শালা ছাত্রদের গিয়ে মাঝে মাঝে লেকচার দিত। কবে মাস্টারমশাইয়ের ক্লাসে গিয়ে কী সব বলেছে, আর মাস্টারমশাইও মাথা গরম করে বলে দিয়েছে, বাচ্চাদের উল্টো-পাল্টা কথা শেখাবেন না। ব্যাস, সেই নিয়ে ধুন্ধুমার। মাস্টারমশাইকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিল। প্রথমে স্কুল গরম, তারপর আস্তে আস্তে গোটা টাউন। মাস্টারমশাইকে ছাঁটাইয়ের নোটিশ দিতেই স্কুলে স্ট্রাইক, আর পরের দিন থেকেই ভিড়ে গেল কলেজের ছাত্ররা। সবাই তো মাস্টারমশাইয়ের ছাত্র। গোটা টাউন জুড়ে পোস্টার, মিটিং, মিছিল—একদম হুজ্জত। আর এর সব কিছুর লিডার উকিলপাড়ার অপুদা, নবারুণ সংঘের অপুদা।

ঝামেলা তুঙ্গে উঠল, যে দিন বোর্ড অফিসে হাঙ্গামা হল। কলেজের ছেলেদের নিয়ে একদম নিত্যবাবুর অফিসে ঢুকে পড়ল অপুদারা। মজা দেখতে পেছন পেছন নবরাও কয়েকজন ভিড়ে গেছে। বুড়োটাকে সাহস করে কেটু দু ঘা লাগাতে পারলে তারা সবচেয়ে খুশি। ভেতরে ঢুকে দেখে বুড়ো গলা ফাটিয়ে চাঁচাচ্ছে—

—তোমার এই বেয়াদবির শাস্তি তুমি পাবে, অপু। আমার অফিসে ঢুকে আমাকে চোখ রাঙানো? অনন্তমাস্টার ভেবেছে, ছেলে খেপিয়ে আমায় জব্দ করবে? আমিও দেখব। আমাকে দুধের শিশুদের সামনে অপমান করা, আমি স্বাধীনতা সংগ্রামের কিছু জানি না? আমার পরিবার দু পুরুষ ধরে স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে যুক্ত। মোতিলাল নেহরু আমার বাবাকে চিঠি লিখেছিলেন, সে-চিঠি আমার ঘরে বাঁধানো আছে। আমাকে এত বড়ো কথা! ভেবেছে কি অনন্তমাস্টার। আমি জানি না, তলায় তলায় কী হচ্ছে? সরলমতি ছাত্রদের শেখানো হচ্ছে—ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়। আমার নামও নিত্যগোপাল ঘোষাল, এই মিউনিসিপ্যালিটির দশ বছরের চেয়ারম্যান।

—কেন শুধু শুধু মাথা গরম করছেন জ্যাঠামশাই।

অপুদা একদম ঠান্ডা।

—আপনারা দুজনই আমাদের গুরুজন। দুজনে বসে মিটিয়ে নিন। আপনাকে হাতজোড় করে বলছি, আপনার স্কুল কমিটিকে বলুন, অ্যাপোলজি চেয়ে সাসপেনশন অর্ডারটা তুলে নিতে।

—অ্যাপোলজি! সাসপেনশন অর্ডার তোলা! নাকে খত দিলেও তা হবে না। আমি শেষ দেখে ছাড়ব।

—কিচ্ছু দেখাতে পারবেন না জ্যাঠামশাই, আপনার দেখানো শেষ হয়ে গেছে।

অপুদা আস্তে আস্তে গরম হচ্ছে।

—আপনারা এতদিন শুধু আমাদের খারাপ জিনিস দেখিয়েছেন। ব্যাস, আর দেখাবেন না। আর, কাউকে পছন্দ না হলেই তার গায়ে 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' কালি লাগিয়ে দেবার চালাকিটাও পুরোনো হয়ে গেছে। আর প্লিজ স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে আপনারা বক্তৃতা দেবেন না, গোটা টাউন আপনাকে চেনে। এখনো বলছি ফিরে আসুন। আপনারা যা করছেন তাতে কিন্তু আগুন জ্বলবে।

ঘরে যেন বোমা ফাটল,

—কী, তুমি সেদিনের ছেলে আমায় ভয় দেখাচ্ছ? থ্রেট করছ? বেরোও, বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে।

ব্যাস শুরু হয়ে গেল চ্যাঁচামেচি, হুজ্জুত। হাত তুলে সবাইকে থামাল অপুদাই, তারপর বলল,

—জ্যাঠামশাই, আজ চলে যাচ্ছি। কিন্তু আবার আসব। খুব শিগগিরই আসব। তবে শুধু অনন্তস্যারের কেস নিয়ে নয়। ব্রিজ ভাঙার কেস নিয়েও আসব। আর

শুধু দু একটা কাগজ হাতে আসা বাকি। বড়ো ঘড়ির মোড়ে মিটিং করে গোটা টাউনকে জানাব, নিত্য ঘোষালের আসল চেহারা। কে কার শেষ দেখে, দেখব।

এর মধ্যে চিৎকার, পুলিশ আসছে। অন্যদের মতো নবও ছুট লাগাল পিঠ বাঁচাতে। তারপর বোর্ড অফিসের সামনে থেকে বড়ো ঘড়ির মোড় পর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে পাবলিকের ঝামেলা। লাঠি চলল, টিয়ার গ্যাস চলল। পরের দিন গোটা শহর বন্‌ধ। সাত দশ দিন শুধু এই নিয়ে টাউন গরম।

কিন্তু ঝামেলা হুজ্জত যাই হোক মাস্টারমশাই চাকরি ফেরত পেল না। প্রথম প্রথম ছেলেছোকরার ভিড় লেগে থাকত মাস্টারমশাইয়ের ঘরে। কিন্তু দু মাস পর অপুদা কলকাতায় গিয়ে আর ফিরল না, তারপর আস্তে আস্তে ছেলেদের যাওয়া-আসাও কমে গেল। যে মাস্টারমশাইকে টাউনের লোকেরা এত শ্রদ্ধাভক্তি করত, তারাও যেন এড়িয়ে চলা শুরু করল। এ টাউনের জাতই এমন। কিন্তু নব নেমকহারামি করবে না, সে যাতায়াত রাখত। কত লোক কত কথা বলেছে, কিন্তু নব কোনো কথা শোনেনি।

মাস্টারমশাই তারপর বাড়িতে দু-একটা ছেলে পড়াত। প্রথমে ঠিকে কাজের মেয়েটাকে ছাড়িয়ে দিল, তারপর বন্ধ হল গোয়ালার দুধ দেওয়া, রোজ বাজারে যাওয়া বন্ধ। সবই নবর চোখের সামনে। আর এর জন্যই খুকির এই কলকাতায় পড়তে যাওয়াটা ভালো লাগছে না। থাকতে না পেরে সে জিজ্ঞাসা করল,

—কলকাতায় কোথায় থাকবে খুকি?

—কলকাতায়? বালিগঞ্জে, ওর মাসির বাড়িতে। বিশাল বড়োলোক।

নব মনে মনে ভবল এত দিন এই বাড়ির সাথে আছি, কোনোদিন তো এ রকম বড়োলোক আত্মীয়ের কথা শুনিনি।

—জানো নবকাকু, মাসির বাড়িতে না এত বড়ো দুটো অ্যালসেশিয়ান কুকুর আছে। শুধু কোনো কথা নেই বউদির মুখে।

বউদিদের ট্রেনে তুলে দিয়ে বাড়িতে নামার মুখে মাস্টারমশাই বলল,

—একটু দাঁড়িয়ে যা নব, কথা আছে তোর সাথে।

ফেরার গোটা রাস্তাটা মাস্টারমশাই কোনো কথা বলেনি। নব কিছুটা অবাক, তার সাথে মাস্টারমশাইয়ের আলাদা কথা কী?

মাস্টারমশাই তাকে বসার ঘরে ডেকেছিল। কিন্তু নব বসল চৌকাঠের ওপর যাতে গাড়িটা চোখের ওপর থাকে, রাস্তার বদমাইশ বাচ্চাগুলোকে বিশ্বাস নেই।

—বুঝলি নব, চাকরিটা চলে যাওয়ায় খুব সমস্যায় পড়ে গেছি। এদিক-ওদিক খোঁজখবর করলাম, কোথাও কিছু হচ্ছে না। মনে হয় দাগি হয়ে গেছি, যে-ই নাম শোনে সে-ই কপালে হাত ঠেকায়। গত মাসে কলকাতায় গিয়েছিলাম,

চাকরিবাকরির খোঁজেই। সে সব কিছু হল না, কিন্তু অন্য একটা যোগাযোগ হয়ে গেল। আমার এক ভাই, দূরসম্পর্কের, সব শুনে বলল, চাকরির বাজার খুব খারাপ, তুমি বরং আমার লাইনে চলে এসো। রিস্ক আছে, কিন্তু মাথা ঠান্ডা করে নামতে পারলে দাঁড়িয়ে যাবে। আমি মনে মনে ভাবলাম, ঠিকই, যে ছেলের বিদ্যে স্কুলফাইনাল অব্দি, তার এখন বোলচালই আলাদা। দামি জামাকাপড়, লম্বা লম্বা সিগারেট ওড়াচ্ছে। যাকগে, সে তার ব্যাপার। আমি বললাম, দূর পাগল, ওসব আমায় দিয়ে হবে না। তখন বলল, ঠিক আছে, পার্মানেন্টলি আসতে হবে না। একবার কিছু ইনভেস্ট করো, তারপর টাকা তুলে নিয়ে অন্য ব্যাবসায় লাগাও। আমি বললাম, আমি এ লাইনে কিছুই জানি না। বলল, তোমায় কিছু জানতে হবে না, তোমার হয়ে আমি সেফ ইনভেস্টমেন্ট করে দেব। আর টাইম বুঝে আমিই তোমার টাকা তুলে নেব, প্রফিট দেখে তোমার মাথা ঘুরে যাবে। হয়তো তখন তুমিই বলবে অন্য কাজের দরকার নেই, আমি এই লাইনেই থেকে যাব।

নবর সন্দেহ হচ্ছে এই সব কথা কি মাস্টারমশাই তাকে বলছে?

—বুঝলি, তারপর আমায় গোটাটা ভালো করে বোঝালো। খুব ইন্টারেস্টিং। মানে কপালে থাকলে কয়েক দিনেই টাকা দুগুণ হয়ে যেতে পারে। রিস্ক একটু আছে। কিন্তু টুকাই দেখলাম, এই ব্যবসার একদম আটঘাট জানে। পরে বুঝলাম, অন্যের হয়ে শেয়ার বাজারে টাকা খাটানোটা ওর একটা ব্যাবসা। আর বিনিময়ে প্রফিটের একটা অংশ ও নিজে নেয় সার্ভিস চার্জ হিসাবে। আমাকে বলল, তুমি আমার দাদা, বিপদে পড়েছ, তোমার কাছ থেকে আমি কোনো সার্ভিস চার্জ নেব না। আমি অবশ্য ভেবেছি, ব্যাবসায় দাদা-ভাই নেই, আমিও সার্ভিস চার্জ দিয়ে দেব।

নব ভাবতেই পারছিল না, এত লোক থাকতে মাস্টারমশাই তার সাথে এ সব নিয়ে কথা বলছে! মাস্টারমশাই যা বলছে, তার অর্ধেক কথার মানেই সে বোঝেনি, কিন্তু এটুকু বুঝেছে কথাগুলো অন্যরকম। তার মতো লোককে বলার মতো না। তার মনে হল, এতক্ষণ ধরে মাস্টারমশাই একটানা বলে যাচ্ছে তার কিছুটা একটা বলা উচিত। গলা খাঁকারি দিয়ে নব জিজ্ঞাসা করল,

—মাস্টারমশাই এটা কী বাজার?

—শেয়ার বাজার। এক্ষুনি তোকে বোঝানো মুশকিল। আসলে নানা কোম্পানির শেয়ারের কেনাবেচা হয়। ঠিকমতো সময়ে কোম্পানি বেছে লাগাতে পারলে একদম রাজা। আমার অবশ্য রাজা হবার দরকার নেই। আসলে আমি ভাবছিলাম, কলেজপাড়ায় একটা বইয়ের দোকান দাঁড়িয়ে যাবে। আর

টিউশনের কাজটাও চালাব। আমার প্ল্যান আছে কলকাতার পাবলিশার্সদের সাথে কথা বলে ম্যাট্রিকের সিলেবাসের একটা হিস্ট্রি টেক্সট বই লেখার। দেখাতে হবে অনন্তমাস্টার ফুরিয়ে যায়নি, শুধু এই টাউনের না, গোটা রাজ্যের ছাত্রদের সে গাইড করতে পারে।

বাইরে আঁধার হয়ে এসেছে। সেই আঁধারের দিকে তাকিয়ে কেমন ঘোর লাগা মানুষের মতো মাস্টারমশাই বলে যাচ্ছে।

—একটু নিজের পায়ে দাঁড়াতে দে। আমার অনেক বড়ো পরিকল্পনা আছে। আমিও দেখে নেব।

তারপর যেন হঠাৎ হুঁশ ফিরে এল,

—আমি একটা দোকান ঘর নিয়ে কথা বলে রেখেছি, মালিক বলেছে আমায় দেবে।

—লাগিয়ে দেন তা হলে, বলেন আমায় কী করতে হবে?

—আর লাগাতে গেলে তো টাকা লাগে।

—কেন ওই যে কী বাজার।

—আরে সেখানে তো টাকাটা আগে লাগাতে হবে। তার দু-এক মাসে টাকাটা হয়তো ডবল হয়ে উঠে আসবে। দরকার লাগানোর টাকাটা। আমি হিসেব করে দেখেছি, লাগবে আপাতত হাজার দেড়েক। দু তিনশো এখনই দিয়ে দেব দোকানের অ্যাডভান্স, বাকিটা শেয়ারে লাগিয়ে দেব। কিন্তু এই টাকাটা কোথায় পাব? তোর বউদির যেটুকু সোনাদানা আছে তা বেচে বড়োজোর সাত আটশো। আর আমার পুরোনো বন্ধুবান্ধব কয়েকজন বলেছে কিছু দেবে। বাকিটা ধার করতে হবে। কিন্তু এ শহরে যারা মহাজনি কারবার করে, তারা আমায় কেউ ধার দেবে না। তোকে ডেকেছি, তুই তো শহরের প্রায় সবাইকে চিনিস, তোর জানাশোনা কেউ আছে যে একটু কম সুদে আমাকে টাকা দেবে?

নব মনে মনে ভাবল, টাকা ধার দেবার লোক থাকবে না কেন? খোদ কালুমাস্টার আছে, সুবলামাসি আছে, আছে হরেন মণ্ডল। সুদ? এগুলোর মতো চশমখোর হারামি দুনিয়াতে নেই, মরলে পরের জন্মে এগুলো শকুন হবে। কিন্তু এ ব্যাবসায় ভদ্রলোক কাউকে নব চেনে না। পরের কথাটা নব বলে ফেলেছিল প্রায় কিছু না ভেবেই।

—আমি সে রকম কাউকে জানি না মাস্টারমশাই, তবে আমি আপনাকে কিছু টাকা দিতে পারি।

মাস্টারমশাই তার দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন ভূত দেখছে।

—তুই? তুই টাকা কোথা থেকে দিবি?

সব শুনে মাস্টারমশাই বলল,

—না রে, তোর ওই টাকা আমি নিতে পারব না। তুই এত কষ্ট করে জমিয়েছিস। যদি কিছু এদিক-ওদিক হয়ে যায়। আমার এখন নিজে কিছু করার ক্ষমতা নেই। আর আমার লাগবে আরো অনেক টাকা।

কথাটা নব বলে ফেলেছিল ঝোঁকের মুখে। কিন্তু একবার বলে ফেললে কথা ফেরানো যায় না। নব জোর করে বলল,

—না মাস্টারমশাই, বরং এই সুযোগে আমার টাকাটাও আপনি বাড়িয়ে দিন। আর আমার তো কোনো তাড়া নেই, দু দিন পরে পেলেও হবে।

লোকে যেভাবে বাচ্চাদের ভোলায় সেভাবে মাস্টারমশাই তাকে বলল,

—ঠিক আছে, দরকার হলে আমি নেব। দাঁড়া বাকি টাকাটা আগে জোগাড় করি।

নাছোড়বান্দার মতো নব বলল,

—আপনি না বলবেন না। কতবার বিপদে আপদে আমায় বাঁচিয়েছেন। যতবার অভাবে পড়ে আপনার কাছে হাত পেতেছি কোনোবার তো আমায় খালি হাতে ফেরাননি। মাস্টারমশাই আমরা গরিব, কিন্তু নেমকহারাম না।

সারা সময়ের মধ্যে মাস্টারমশাই এই প্রথম হাসল,

—ঠিক বলেছিস, তোরাই আসল মানুষ, উপকারীকে মনে রেখেছিস। গোটা টাউন মনে রাখেনি। ঠিক আছে যা, আমার লাগলে বলব।

কথাটা বিশ্বাস হল না নবর।

—এই সুযোগে আমার টাকাটাও আপনি বাড়িয়ে দেন, বড়ো উপকার হবে।

চৌকাঠ ছেড়ে একদম মাস্টারমশাইয়ের পায়ের কাছে গিয়ে বসল নব।

—আমায় বারণ করবেন না। এই সুযোগে আমার টাকাও আপনি বাড়িয়ে দেন, আমার খুব দরকার। আপনি আমার টাকাটাও ডবল করে দিন।

নিজের কাছে মিথ্যা বলা যায় না। হয়েছিল, তারও লোভ হয়েছিল।

হপ্তা খানেক পরে মাস্টারমশাই ডেকে বলল, টাকাটা নিয়ে আসতে, বাকি টাকা জোগাড় হয়ে গেছে।

মাঝখানের ক-টা দিন নব বারবার ভেবেছে কাজটা বোধহয় সে ঠিক করেনি। কিন্তু মাস্টারমশাইকে বলে ফেলার পর আর পিছিয়ে আসা যায় না। অন্য কেউ হলে ঘুরিয়ে দেওয়া যেত। যাক, যা হবার হবে, আর মাস্টারমশাই তো আছে। এত বিদ্যে বুদ্ধি যার তার সাথে থাকলে আর কী ভয়? আর যাই হোক

মাস্টারমশাই তাকে পথে বসাবে না। মনটা খচখচ করছিল, কিন্তু আবার মনে হচ্ছিল, টাকাটা ডবল হয়ে গেলে এ জিন্দেগির জন্য তার একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

সকাল থেকে সে দিন ছিল বৃষ্টি। সারা দিন ধরে জলে ভিজে গাড়ি টেনে গা ম্যাজম্যাজ করছিল। ভাবছিল, সেদিনের মতো গাড়ি তুলে দেবে। কেষ্ট এসে খবর দিল, মাস্টারমশাই তাকে এক্ষুনি ডাকছে। গত চার-পাঁচ মাস ধরে এই রকম একটা ডাকের অপেক্ষাতেই তো নব ছিল। মাস্টারমশাই বউদিকে নিয়ে কলকাতায় গিয়েছে এটা নব জানত, ফিরেছে এই খবরটা জানত না।

বাইরের ঘরে বসেছিল মাস্টারমশাই। ঘরে ঢুকেই নব বুঝছিল, সে যে খবরের আশায় ছুটে এসেছে, সেই খবর আজ মাস্টারমশাইয়ের কাছে নেই। গোটা বাড়িতে একমাত্র আলো জ্বলছে বাইরের ঘরে, তার মানে বউদি ফেরেনি, মাস্টারমশাই একাই ফিরেছে কলকাতা থেকে। পশ্চিমের দিকে জানালাটা খোলা, হাওয়া আসছে হু হু করে, বোধহয় তার সঙ্গে বৃষ্টির ছাটও। বৃষ্টির জন্য চৌকাঠে না বসে নব বসল ঘরের ভেতরেই। কিন্তু যার ডাকে আসা তার কোনো হুঁশ নেই। নব যে ঘরে ঢুকে বসল, সেটাও মনে হয় খেয়াল নেই মাস্টারমশাইয়ের। নব চুপ করে বসে, মাস্টারমশাইও চুপ। নবর অস্বস্তিই হচ্ছে, এভাবে বসে থাকা যায়? কতক্ষণ বসে ছিল নবর খেয়াল নেই। হঠাৎই মাস্টারমশাই শুরু করল—

—বুঝলি আমাদের দেশের বাড়িতে তো অনেক লোক। ঠাকুরদা বেঁচে, বাবা কাকারা সবাই, তাদের পরিবার। এক বিধবা পিসি, তার এক ছেলে আর ছোটো মেয়ে। আরও এক গাদা আত্মীয়স্বজন, কে যে কার কি সেটাও সব সময় ভালো করে জানতাম না।

এ কী! কিছু বুঝতে পারছে না নব। লোকটা যেন গল্প বলতে বলতে থেমে গিয়েছিল। যেখানটায় ছেড়েছিল আবার গল্পটা ধরেছে সেখান থেকে।

—টুকাই আসলে আমাদের দূর সম্পর্কের কাকার ছেলে। কাকা মারা গিয়েছিল অনেক দিন, আমি তাকে দেখিওনি। টুকাইয়ের মাকে আমরা ডাকতাম ননাকাকি বলে। কেন কে জানে, ননা মানে কী?

—আমাদের মাস্টারের বংশ। ঠাকুরদা ছিলেন হেডমাস্টার, দুই কাকা মাস্টার।

আর বড়ো জ্যাঠা তো দিল্লি ইউনিভার্সিটির প্রফেসার ছিলেন।

হঠাৎ মাস্টারমশাই হাসতে শুরু করল। নবর কেমন যেন ভয় করছে। তারপর হাসি থামিয়ে বলল—

—বোঝ, জ্যাঠামশাইয়ের তখন দেশ জোড়া নামডাক। কোনো একটা কাগজে জ্যাঠামশাইয়ের একটা আর্টিকল বেরিয়েছে। কীভাবে যেন সেটা ঠাকুরদার হাতে এসেছিল। আর পড়েই ফায়ার, এত বড়ো পোলা, তার প্রিপোজিশনের সেন্স ঠিক নাই। আর সেবার পুজোর সময় জ্যাঠামশাই বাড়ি আসা মাত্র ঠাকুরদা পড়ল সেই নিয়ে। বাঘের মতো রাশভারি জ্যাঠামশাই বাচ্চা ছেলের মতো মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। ঘরের বাইরে এসে জ্যাঠামশাই গজগজ করছে, কে বোঝাবে শেকসপিয়রের পরেও ইংরেজি ভাষাটা এগিয়েছে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে মাস্টারমশাই আপন মনে হাসছে, বৃষ্টিটা আরো ঝেঁপে এল।

—আমাদের বাড়ির ছেলেদের লেখাপড়ার সুনাম ছিল। একমাত্র অলাদা ছিল টুকাইটা, ফেলও করেছে কয়েকবার। কিন্তু কে তাকে শাসন করবে? কিছু বললেই ননাকাকি একদম 'আমার বাপ মরা পোলাডারে', বলে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। আর বদমাশও ছিল, এর বাগানে গিয়ে এই চুরি করছে, এর সঙ্গে গিয়ে মারপিট করে আসছে। একবার এমন মারপিট করে এল, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা লাগে আর কী। ঠাকুরদাকে সবাই খুব মান্য করত গ্রামের। বয়স্ক সব মুসলমানরা দল বেঁধে নালিশ করতে এল আমাদের বাড়িতে। দাদাঠাকুরের নাতি না হলে না কি ওকে 'কাইট্যাই ফেলাইত'। ওই একবারই মেজোকাকা উঠোনে ফেলে চ্যালাকাঠ দিয়ে মেরেছিলেন টুকাইকে, ননাকাকিও বাঁচাতে পারেননি। মার খেয়ে রাগ করে সে ছেলে আবার নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। ননাকাকি তো কেঁদেকেটে বিছানা নিলেন। শেষে সেই মেজোকাকা খুঁজে নিয়ে এলেন। সে ছেলে নাকি নারায়ণগঞ্জের ঘাটে কুলির কাজ করছিল। ঠাকুরদা বললেন, —অরে ওই কাজই করতে হইব সারা জীবন।

—তোদের এই দেশ তো খোট্টার দেশ। নদী তোরা দেখিসনি। ঢাকা থেকে ফিরতে নারায়ণগঞ্জে নদী পার হতে হত। বর্ষাকালে নদীর জল একদম সাদা, মা বলত, শ্বেতচন্দনের মতো রং। যখন পার হতে এ পাড়ে স্টিমারে উঠতাম, ও পাড়টা স্পষ্ট দেখা যেত না। স্টিমার যত এগোত তত পরিষ্কার হত। প্রথম একটা সবুজ রেখা। তারপর আস্তে আস্তে স্পষ্ট হত সবটা। জানিস, অনেক কলাগাছ ছিল। তুই খেয়েছিস রামপালের কলা?

নব অসহায়ভাবে মাথা নাড়ল।

—দুর দুর, বাজারে যে-সব কলা আসে সেগুলো কোনো কলা না কি? বুঝলি রামপালের কলা। যেমন স্বাদ, তেমন গন্ধ, আর দেখতে কি সুন্দর! কোনো কিছুতে আর আগের মতো স্বাদ পাই না। যখন খুব ছোটো ছিলাম, রাত্রিবেলায়

পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়তাম। মা জোর করে তুলে খাইয়ে দিত গরম ভাত, ঘি আর সঙ্গে কী সব থাকত। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই খেতাম, কিন্তু মনে হত অমৃত। এখন কই তেমন তো আর লাগে না। জানিস, তারপর গলাটা অনেক নামিয়ে বলল—

—কবে মরে গেছে, কিন্তু আজ বারবার মাকে মনে পড়ছে। কতবার বলছি, মা তুমি যাও, আমাকে আমার কাজ করতে দাও, কিন্তু শুনছে না। এই অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে যে দিকে তাকাচ্ছি, দেখি মা দাঁড়িয়ে আছে। আমি কী করি বল তো নব?

পাথরের মতো বসে থেকে নব দেখল মাস্টারমশাই কাঁদছে। সে কি সান্ত্বনা দেবে? কিন্তু কেন কাঁদছে, তাই তো নব জানে না। নব বসে রইল চুপচাপ। সে যেন একা বসে একটা নাটক দেখছে। তবে এ কান্না বাইরের একটানা বৃষ্টির মতো নয়, শুরুর মতো হঠাৎই শেষ। কথার বিষয়ের মতো মানুষটাও যেন পালটে গেল।

—টুকাইটার একটা গুণ ছিল, ফুটবলটা ভালো খেলত। আসলে লম্বা ছিল তো। আমাদের বাড়ির কেউই খুব একটা লম্বা না, সবাই আমার মতো, মাঝারি গড়নের। কিন্তু টুকাই বাড়ি কি, গোটা গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে ঢ্যাঙা ছিল। রং কালো, কিন্তু মুখ চোখ খুব তীক্ষ্ণ। মনে হয়, কালো পাথরে কুঁদে তৈরি। একবার যে দেখেছে সে-ই মনে রাখবে। পাল্টায়নি একটুও। তুইও চিনতে পারবি।

শেষ কথাটা নবর চোখের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে বলল যে, নবর মনে হতে লাগল, লোকটা আসলে পাগল হয়ে গেছে। নবর এখন ভয় লাগছে।

—নিশ্চিত থাক, ও আসবে। ও আসবেই।

গোটা মুখে একটা তেতো হাসি ছড়িয়ে বলল,

—হত্যাকারী খুনের জায়গায় ফিরে একবার আসবেই। আর ওকে আসতেই হবে, ও এখনো জানে না, আসল কাগজ আমি নিয়ে চলে এসেছি।

নব যখন ছুটে এসেছিল আজ, তখন তার আশা ছিল মাস্টারমশাই তাকে ভালো খবর দেবে। তবে এ ঘরে ঢুকেই বুঝেছিল, কোনো ভালো খবর নেই। কিন্তু এটা সে সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক করে নিয়েছিল, যে কাজ সে কোনো দিন করেনি সেই কাজ সে আজ করবে। মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞাসা করবে—তার টাকার কী হল? সে কথা জিজ্ঞাসা করা দূরে থাক, পারলে সে এক্ষুনি পালায়। কিন্তু মাস্টারমশাই এখনো বলেনি, কেন তাকে ডেকেছে। মরিয়া হয়ে নব বলল,

—মাস্টারমশাই আমায় ডেকেছেন?

তার কথায় মাস্টারমশাই থেমে গেল। কেমন করে তাকিয়ে রইল তার দিকে। মাস্টারমশাইয়ের মুখ চোখে দেখে এখন মনে হচ্ছে, লোকটা ভীষণ ক্লান্ত। তারপর পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা টাকা আর পড়ার টেবিল রাখা একটা কাঁসার গ্লাস তার হাতে দিয়ে বলল,

—নব একটু দুধ এনে দিবি রে ভাই। শরীরটা খারাপ লাগছে, অন্য কিছু আর খাব না।

নবর আনা দুধেই মাস্টারমশাই বিষ মিশিয়েছিল।

সকালবেলায় খবরটা পেয়েছিল। নব যায়নি। চুপ করে সারাদিন ঘরে বসেছিল। সকালে চম্পা কিছু বলেনি। সন্ধেয় ফিরে বলছিল, এত নাকি ভিড় হয়েছিল যে, চেষ্টা করেও চম্পা ঘরের ভেতরটায় উঁকি মারতে পারেনি।

রাতে চম্পাকে সব কথা বলেছিল নব। চম্পা প্রথমে গুম মেরে রইল, তারপর নব যে রকম ভেবেছিল সেভাবেই নবকে গালাগাল আর মাস্টারমশাইয়ের বাপ চোদ্দোগুষ্টিকে শাপশাপান্ত করতে শুরু করল। নবর একবার মনে হল, একটা থাপ্পড় মেরে চম্পার কথা বলা চিরকালের মতো বন্ধ করে দেয়। কিন্তু সেও বড়ো ক্লান্ত, উঠে গিয়ে কিছু করার ক্ষমতা তার নেই। চম্পা কী করে বুঝবে তার ভেতরটায় কী হচ্ছে! তার যদি শুধু টাকা যেত, সে ঠিক সামলে নিত। কিন্তু তার যে অনেক কিছু গেছে। সে তার আগের মতো কোনো দিনও হতে পারবে না। তার ভেতরটা এখন শুধু আঁধার আর কালি। কাউকে বোঝাতে পারবে না, তার কেমন লাগছে। রাগ? দুঃখ? লজ্জা? না ভয়? নাকি এই সব মিলিয়ে, সব কিছু ছাড়িয়ে অন্য কিছু? নব বসে রইল পাথরের মতো। চম্পার গালাগাল এক সময় ধীরে ধীরে বিলাপ, তারপর কখন যেন নীচু গলার কান্না হয়ে গেল। তারপর চম্পাও চুপ। মনে হল, এই ঝুপড়ির ঘরে আর কেউ কোনোদিন কথা বলবে না।

কতক্ষণ মনে নেই, হঠাৎ চম্পা উঠে এল তার কাছে। এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল,

—তুই ওই টাকার কথা ভুলে যা। যে গেছে সে ওই টাকা নিয়ে গেছে। ও কথা আর ভাবিস না। টাকার কথা ভাবলে তার আত্মা কষ্ট পাবে, ফাটকে আটকে থাকবে, মুক্তি পাবে না। কথা দে, তুই ওই টাকার কথা আর ভাববি না।

চম্পার ভয় পাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে নব তার মুখ নামাল, আর সারা দিনের কান্না বানের জলের মতো নেমে আসল। চম্পার বুকে মুখ রেখে সে কেঁদে গেল, আর তার সাথে সাথে কাঁদল চম্পাও।

## ॥ তিন ॥

চুপচাপ বসে থেকে বোধহয় নবর একটু ঝিম ধরে এসেছিল। ঘণ্টার আওয়াজে চমকে উঠে বসল। যাক, অন্তত ট্রেনটা আসছে। আর ঘণ্টার আওয়াজ মানে ঠান্ডায় বাসি মড়ার মতো পড়ে থাকা স্টেশনটায় একটু নড়াচড়া হবে। সিগনালের লণ্ঠন নিয়ে উপরে উঠবে রেলের লোকেরা, স্টেশনের বারান্দায় গুটিসুটি মেরে বসে থাকা দু একটা প্যাসেঞ্জারও তাদের পেছন যাবে। তাদের লাইনের লোকেরাও ফিরে আসবে। আজ এ টুকুতেই নব খুশি, একা একা বসে তার কেমন হাঁপ ধরে গেছে।

আজ কোনো প্যাসেঞ্জার নেই। সিগনালবাবু আর তার সঙ্গে একজন রেলেরই কেউ, প্ল্যাটফর্মে লোক বলতে এই দু জনই।

ইঞ্জিনের আলো আর ধোঁয়ায় মিলেমিশে ট্রেনটা ঢুকলে প্ল্যাটফর্মটা কেমন যেন একটু সাড় ফিরে পেল। কিন্তু গড়াতে গড়াতে ইঞ্জিনটা সামনে চোখের আড়ালে চলে যেতেই আবার সেই আঁধার। গোটা ট্রেনটাকে গিলে ফেলল প্ল্যাটফর্মটা। চোখের আড়ালে চলে যাওয়া ইঞ্জিনটা থেকে ভেসে আসা হিস হিস আওয়াজ ছাড়া আর কোনো ফারাক নেই। ট্রেনটার সব কামরায় আলোও নেই, আর দরজা জানালা এমন করে বন্ধ করা যে, কোথাও আলো দেখা যাচ্ছে না। নব লাইনে তিন নম্বর, অন্তত দুটোর বেশি লোক না নামলে এই কষ্ট করে বসে থাকাটা বেকার।

সিঁড়ি দিয়ে নামছে একটাই লোক। সনাতন নেমে দাঁড়িয়েছে, এই শীতের রাতে, তার কপালই ভালো। পেছন থেকে আব্বু বলল,

—চ বে, আমাদের নসিব খারাপ। সনাতনের বউ শনিপুজো দিয়েছিল, এখন ফল পাচ্ছে।

এই ঠান্ডায় এতক্ষণ বসে থেকে খালি হাতে ফিরে যেতে কারই বা ভালো লাগে, নবরও লাগছে না। কিন্তু এই অন্ধকারে ঠান্ডা কবরের মতো স্টেশনটা

ছেড়ে এবার অন্তত ঘরে ফিরতে পারব, এটা ভেবে খারাপও লাগছে না। এই ঠান্ডায় কুঁকড়ে মুকড়ে বসে ছিল, হাত-পা কেমন জমে গেছে, ট্রেনটাও চলতে শুরু করেছে। আর তার কপাল খারাপ, প্রথম প্যাডলটা মারা মাত্র চেনটা পড়ে গেল। নবর মুখ দিয়ে খারাপ গালাগাল বেরিয়ে এল। একে এই ঠান্ডা, তার মধ্যে অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে চেন ঠিক করা, মনে মনে নব ভাবছিল, কার মুখ দেখে আজ উঠেছিল।

উঠে দাঁড়িয়ে হাতের কালিটা লুঙ্গিতে মুছতে মুছতে প্রথম যে কথাটা নবর মনে হল, গোটা চত্বরটায় সে একা, আর কেউ নেই। আর এটা ভাবা মাত্র বরফের মতো ঠান্ডা একটা হাওয়া কোত্থেকে এসে একদম কাঁপিয়ে দিয়ে গেল তাকে। কাঁপা হাতে হ্যান্ডেলটা ঠেলে রিকশটাকে সোজা করতে করতে নব সিটে উঠতে যাবে, কথাটা ভেসে এল একদম ঘাড়ের কাছ থেকে।

—নতুনপল্লি যাবে?

নবর প্রথম মনে হল গাড়ি ছেড়ে দৌড় লাগাবে। সে ভালো করে দেখেছিল একটার বেশি লোক নামেনি। কিন্তু কে যেন তাকে আঠা দিয়ে আটকে রেখেছে। নব নিশ্চিত, যে কথাটা জিজ্ঞাসা করেছে সে মানুষ না। কে, পেছন ফিরে দেখবার সাহস তার নেই। আর তার উত্তরের অপেক্ষায় না থেকেই সওয়ারি গাড়িতে উঠে বসেছে। মন্ত্রে বশ হওয়া মানুষের মতো নব গাড়ি ঠেলতে শুরু করল। ভারী, সওয়ারি ভীষণ ভারী। স্টেশন রোডে গাড়িটা পড়া মাত্র তাড়া করে এল রাস্তার কুকুরগুলো। আচমকা এতগুলো কুকুরের ডাক শুনে মনে হল, অন্তত এই চত্বরের সব কিছু মরে যায়নি। কিন্তু কুকুরগুলো যে রকম আচমকা ছুটে এসেছিল, সে রকমই আচমকা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। আর যে কুকুরটা নবর একদম পাশে চলে এসেছিল সেটা আকাশের দিকে তাকিয়ে ডেকে উঠল, ঠিক কেউ মরলে কুকুরেরা যে রকম ডাকে সে ভাবে। কুকুরগুলো তার পেছনে বসে থাকা যমরাজকে দেখতে পেয়েছে। নবর মনে হল, আজ রাতই তার শেষ রাত। চম্পাকে সে আর কোনোদিন দেখতে পাবে না।

রাস্তার সব আলো খারাপ না, কয়েকটা টিমটিম করে জ্বলছে। একবার মনে হল কোনো একটা আলোর নীচে চেনটা ইচ্ছে করে ফেলে নেমে দাঁড়িয়ে দেখবে সওয়ারিটা কে। কিন্তু যদি ভয়ংকর কিছু দেখে, তারপর সে কী করবে? কিন্তু শুরুতে যতটা ভারী লাগছিল এখন আর ততটা ভারী লাগছে না। যতটা জোরে সে গাড়িটা চালাতে চাইছে ততটা জোরে সে চালাতে পারছে, যেটা শুরুতে পারছিল না।

ছাতুবাজারের পর কয়েকটা লরি সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকে, খালাসিগুলো কাজ করে। যদি একটা লোকও থাকে ওখানেই হেস্তনেস্ত করে নেবে। গোটা ছাতুবাজার সুনসান, সারিসারি দোকানের ঝাঁপ নামানো। তিনটে লরি অন্ধকারে নিঝঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে, বাইরে একটাও মানুষ নেই। শেষ ভরসা বড়ো ঘড়ির মোড়, ওটাই টাউনের সবচেয়ে বড়ো মোড়। রাস্তার পাশে, দোকানের নীচে একটা ভিখিরিও কি কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে থাকবে না? নব কেবল একটা বেঁচে থাকা মানুষ দেখতে চায়। গোটা পথে বড়ো ঘড়ির মোড়েই সবচেয়ে বেশি আলো। চক্করের মাঝখানে বন্ধ হয়ে থাকা ঘড়িটা সেই সোয়া আটটায় দাঁড়িয়ে আছে। নব যবে থেকে দেখছে, ঘড়িটা ওই একইভাবে দাঁড়িয়ে। কয়েকটা প্যাডলেই গোলচক্করটা পার হয়ে গেল, গাড়ি যেন উড়ছে—না, কেউ নেই।

বটতলার মোড়টা ঘুরলেই নতুনপল্লি শুরু। গোটা পথের অন্ধকারের মধ্যে বটতলার মোড়টা যেন আরো বেশি অন্ধকার, বোধহয় মাথার ওপর ঝুপসি গাছটা থাকার জন্য। মোড়টা পার হতেই আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল ঠান্ডা হাওয়া। এই সোজা রাস্তাটার পরেই টাউন শেষ। আর এটাই উত্তর দিক। নতুনপল্লির পরে একদিকে টাউনের শ্মশান, আর এক দিকে ভাঙা ব্রিজের নীচ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী। আর তার ওপারে মাঠ, বহু দূরে ন্যাড়া দুটো পাহাড়। নব জানে না তার ওপারে কী? ঠান্ডাটা বেড়ে যাওয়া মাত্র রিকশটা যেন আবার ভারী হয়ে উঠেছে।

লাইটপোস্টের আলোগুলো ছাড়া গোটা রাস্তায় আলো বলতে কালীবাড়ির বন্ধ দরজার বাইরের আলোটা। নিত্যবাবুর বিশাল তিনতলা বাড়ির ভেতর থেকে আলোর ছিটেফোঁটাও আসছে না। আর একদম শেষের দিকে মাস্টারমশাইয়ের একতলা বাসাটা অন্ধকারে মিশে দাঁড়িয়ে আছে। মাস্টারমশাই মারা যাবাব পর বহু দিন সে নতুনপল্লিতে ঢুকত না। নতুনপল্লির প্যাসেঞ্জার পেলে নিত না। কিন্তু রিকশর লাইনে এ সব বাছবিচার রাখা যায় না। কিন্তু এত রাতে এ পাড়ায় বহু দিন পর। পা এখন আর তার চলছে না, এবার কী? সে তো নতুনপল্লিতে চলে এসেছে। এ বার কিছু একটা হবে। গাড়ি ছেড়ে সোজা গিয়ে আছড়ে পড়বে কালীবাড়ির বন্ধ দরজায়, মা রক্ষা করো বলে? এ সব ভাবতে ভাবতেই কালীবাড়ি পার হয়ে গেল। এই ঠান্ডাতেও নব এখন দরদর করে ঘামছে। এগিয়ে আসছে বাসাটা। ও বাড়িতে এখন কেউ থাকে না। যে বাড়িতে অপঘাতে ওভাবে লোক মরেছে সেখানে চট করে ভাড়া আসে না। বাড়িটা যেন হাঁ করে গিলতে আসছে। হে ভগবান, সে কখনো মাস্টারমশাইয়ের

কোনো ক্ষতি করেনি, তবে তার কেন আজ এই দশা? নব এখন চোখ বুজে গাড়ি চালাচ্ছে।

—দাঁড়াও।

গাড়িটা দাঁড়াল মাস্টারমশাইয়ের বাসার একটু আগে, নব পাথরের মতো সিটে বসে, নামার ক্ষমতা তার নেই। সওয়ারি সিট থেকে নেমে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওই অন্ধকারের মধ্যে যেটুকু দেখা যায়, তাতেই নব দেখেছে, কোনো মানুষ এত ঢ্যাঙা হয় না। পকেট থেকে হাতটা বার করে বাড়িয়ে দিয়েছে তার দিকে। ভাড়া দিতে? ওঠবার সময়ও ভাড়া কত জিজ্ঞাসা করেনি, এখনো করল না। নব হাত বাড়াল, হাতে লাগল টাকার খসখসে কাগজ। লোকটা তার দিকে পিঠ দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, টান টান হয়ে তাকিয়ে রইল নদী অথবা অন্ধকারের দিকে। তারপর ঠিক দু পা এগিয়ে নবর চোখের সামনে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

সে গাড়ি ছেড়ে দৌড় লাগিয়েছে এইটুকুই মনে আছে, আর কিছু নবর মনে নেই।

## ॥ চার ॥

আজকাল এ রকমই হয়, হঠাৎ মাঝরাতে ঘুমটা ভেঙে গেলে আর ঘুম আসতে চায় না। এখন ঘুমের জন্য অনন্ত অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু করার নেই। বড়ো কষ্ট হয়, বড়ো অসহায় লাগে এ সময়। ঘুম ভাঙা মানে তো কিছু ভাবা, কিছু চিন্তা করা। কিন্তু কী ভাববে? তার চারপাশে এ রকম কিছুই থাকে না, যে কথা তার ভাবতে ভালো লাগে। যদিও বা দু একটা সে রকম বিষয় থাকেও কীভাবে যেন সেই ভাবনাকে সরিয়ে চলে আসে চিন্তার এক আলোহীন অন্ধকার রাত। গরমকালে কখনো-কখনো এ রকম ঘুম না আসা রাতে বাইরের উঠোনটায় গিয়ে বসে থাকা যায়, একটু হাওয়া আসে, আকাশ জুড়ে থাকে কোটি কোটি তারা। কোনো চিন্তা ছাড়াই সেদিকে তাকিয়ে থাকা যায়। এই ঠান্ডায় সে উপায়ও নেই। কাজেই কতগুলো ভাবতে না চাওয়া চিন্তার হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে ভোরের অপেক্ষায় থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই। তবে ঘুমের শরীরেও দয়ামায়া আছে, কখন যেন সে হাজির হয়। তবে সে ঘুমও গভীর নয়, সারাক্ষণ একটা যাই যাই ভাব তাতে। কিন্তু এই মুহূর্তে কিছু করার নেই, শুধু অপেক্ষা।

এই সময় একটা কথাই মনে হয়, কখন ভোর হবে। আজ হঠাৎ মনে হচ্ছে, ভোর হলেই বা কী লাভ, দিনের আলো ছাড়া বাড়তি কিছুই সেখানে নেই। তার কাছে এখন দিন বা রাতের কোনো ফারাক নেই। তার কাছে দুটোই ভাগ, ঘুম অথবা জেগে থাকা। ভোর মানে একটা মেশিন চালু হওয়া। মেশিনের প্রাণ থাকে না, কোনো আশা থাকে না। ভোর মানে বিষ্ণুর মা এসে কড়া নাড়বে, আর তার পর থেকে যা যা হবে হাজার বছর ধরে হয়ে আসছে। বাথরুমে যাওয়া, বেরিয়ে চা, কী কী রান্না হবে বিষ্ণুর মাকে বলতে হয়, সেগুলোও এক। একইভাবে ভোর গড়িয়ে বেলা হলে বাইরে রিকশ এসে দাঁড়াবে। সে রিকশয় এসে বসবে, একই রাস্তা, একই লোকজন, একইভাবে নমস্কার, একইভাবে প্রতিনমস্কার, একই হাসি, বিনিময়ে পাল্টা হাসি। এই শহরের রাস্তা, রাস্তার দু

ধারের বাড়িঘর শুধু আরো বিবর্ণ হয়, পাল্টায় না। শহরের গাছপালাগুলোও এক রকম, দুচারটে কৃষ্ণচূড়া গাছে ঠিক গরমের মুখেই ফুল আসে, আগেও আসে না, পরেও না। এই শহরের কোনো কিছুর বয়স বাড়ে না, অথবা এতটাই বয়স যে কোনো পরিবর্তনের ছাপ পড়ে না। শহরের মোড়টায় বড়ো ঘড়িটা কবে থেকে আটটা বেজে দশ হয়ে থেমে আছে, কেউ জানে না। ঘড়িটার ওপর বড়ো বড়ো করে লেখা—এডওয়ার্ড অ্যান্ড ইয়াং, মেড ইন ইংল্যান্ড, নাইন্টিন হান্ড্রেড টুয়েলভ। একটা প্রশ্নের উত্তরই ঘড়িটা দেয় না—যখন বন্ধ হল, তখন রাত ছিল, না দিন ছিল?

সেই স্কুলের একই লোহার গেট, স্কুলের দোতলার কার্নিশের ওপরে বড়ো করে লেখা, নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়, স্থাপিত-১৯৩৮। বহুদিন রং হয় না। আধওঠা হলুদ এলা রং আর কালো শ্যাওলার ছোপ, একই রকম। স্কুলের গেটের বাইরে আচারওলার সামনে মেয়েদের ভিড়, আর তাকে দেখে ভিড়টার লুকিয়ে পড়ার ব্যর্থ চেস্টা, প্রতি বছর একই রকম। টিচার্সরুমে মুখগুলো এক। শুধু পাল্টায় ক্লাসের মুখগুলো। এক সময় ওইটাই ছিল উৎসাহ পাবার একমাত্র জায়গা। আজকাল কেমন যেন মনে হয়, সেগুলোও এক। ঠিক এক না, মুখগুলো আলাদা কিন্তু সব মিলিয়ে মনে হয় এক। আলাদা করে মুখগুলো আর মনে পড়ে না। সেটা অবশ্যই ওদের দোষ না, তারই কষ্ট করে মনে রাখতে ইচ্ছে করে না। অথচ আগে পরীক্ষার খাতা দেখার সময় নামটা দেখলেই এক-একটা মেয়ে যেন সামনে এসে হাজির হত। তাদের ভালোমন্দ, দুষ্টুমি, সারল্য, সব কিছু নিয়ে। এখন আর সে রকম হয় না। এই সেদিন হঠাৎ একটা মেয়ের নাম কিছুতেই মনে করতে পারল না। মনে করতে পারছিল ক্লাস নাইনে পড়ে, ফার্স্ট বেঞ্চের কোণের দিকে বসে। এত দূর মনে পড়ল, আগের অ্যানুয়ালে ভাবসম্প্রসারণটা চমৎকার লিখেছিল, কিন্তু নামটা কিছুতেই মনে করতে পারল না। বয়স হওয়াটা বোধ হয় একটা কারণ। কিন্তু বয়সের দোষ দিয়ে কী লাভ, এ কথা কী করে অস্বীকার করবে এগুলো মনে রাখতে তার এখন ইচ্ছেই করে না। কেন মনে রাখবে, সেটাই তার কাছে আর স্পষ্ট নয়। সে কেন বেঁচে আছে তাই তো দুর্বোধ্য!

কলকাতার গড়পারের বাড়িতে প্রতি বুধবার বুড়ো মতো একটা ভিখিরি আসত। এমনিতে ভিখিরি দেখলেই মা খুব চ্যাঁচামেচি করত। কিন্তু কেন জানি একে মা কিছু বলত না। বরং ভিক্ষে দিত। সে-ই বাড়ির সবচেয়ে ছোটো। তাই তাকেই যেতে হত দরজা খুলে ভিক্ষে দিতে। লোকটার তিনকুলে কেউ ছিল না, থাকত খালপাড়ের ঝুপড়িতে। ভিক্ষে দেবার ফাঁকে নানা কথায় এটুকুই সে

জানতে পেরেছিল। পরে সে একা ভাবত, লোকটা কিসের জন্য বেঁচে আছে? স্রেফ বেঁচে থাকার জন্য কি কেউ বেঁচে তাকে? একটা কিছু লক্ষ্য তো থাকে? আজ সেই প্রশ্ন নিজেকেই করতে হচ্ছে।

আর পাঁচটা মেয়ে যেভাবে বেঁচে থাকে তার তো সেভাবে বাঁচা হল না, কিন্তু বাহান্নটা বছর সে তো উদ্দেশ্যহীনভাবে বেঁচে ছিল না। কখনো অনেক দূরের কখনো বা একদম কাছের—এরকম কিছু লক্ষ্য নিয়েই আর পাঁচজনের মতো সে বেঁচেছিল। যে লক্ষ্যগুলো নিয়ে বাঁচা, তার অধিকাংশ শেষমেশ হয়নি। কিন্তু তাতে তার এই বেঁচে থাকার পায়ে চলাটা বন্ধ হয়নি। সে তার ভাগ্যকে দোষ দিয়েছে। একটা অন্ধকার মোড় পার হয়েছে, আর মনে হয়েছে পরের বাঁকটার শেষে আলো আছে। সে জানে এরও কোনো বাড়তি বৈশিষ্ট্য নেই, প্রতিটি মানুষই এভাবে বেঁচে থাকে। অনেক বেশি কিছু চাইবার সাহস কোনো বাঙালি মেয়েরই হয় না, তারও নেই। আর জীবনের সবচেয়ে বড়ো ধাক্কাগুলো খেয়ে সে জেনেছে, কিছু জিনিস সে চাইতে পারে না। কতগুলো ছোটো ছোটো ইচ্ছে—কখনো নিজেকে নিয়ে, কখনো বুলবুলি, কখনো দাদাবউদি, কখনো স্কুলের মেয়েগুলোকে নিয়ে—এই তো তার চাওয়ার দৌড় ছিল। কিন্তু এখন আর এগুলোও নেই। আজ এই শীতের ঘুম না আসা রাতে কেউ যদি তাকে জিজ্ঞাসা করে জীবনের কাছে তার কী চাইবার আছে—তার কোনো উত্তর নেই।

কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মনে হল, সে কি নিজেকে ঠকাচ্ছে? সত্যি কি কিছু চাইবার নেই? না কি যা সে চায়, দুনিয়ার সামনে বলবার সাহস তার নেই? সে নিজেই জানে না, কি এর উত্তর। এ প্রায় এক ধরনের পাপ। কিন্তু এই সব কিছু জেনেও তার কিছু করার নেই, এটাই তার জীবনের শেষ অবলম্বন। যদি সত্যি কথা বলতে হয়, তবে সে একটাই জিনিস চায়, দরজার কড়া নড়ুক, সে দরজা খুলে দেখবে সমর দাঁড়িয়ে আছে।

ক্যালেন্ডার দেখলে একটা বছর আঠাশেকের হিসেব পাওয়া যাবে, কিন্তু তার মনে হয় সমরের সঙ্গে তার শেষ দেখা গত জীবনে। এই জীবনে সমরের সঙ্গে তার কোনোদিন দেখাই হয়নি। মাঝে মাঝে মনে হয়, সমরের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে সমরকে কি চিনতে পারবে? সমর কি আগের মতোই আছে। এক সময় বেশ অহংকারই ছিল, চেনাপরিচিতদের মধ্যে তার বরই সবচেয়ে লম্বা। প্রথম যেদিন সমর জ্যাঠতুতো দাদার সঙ্গে দেখতে এসেছিল তাকে, কেমন যেন ভয়ই হয়েছিল, বাবা এত লম্বা! মুখের দিকে দিকে ভালো করে তাকানো হয়ে ওঠেনি। শুভদৃষ্টির সময় তাকাবে কী, সবাই এমন হাসাহাসি করছিল, জোর করে মাথা

নীচু করে রেখেছিল। বিয়ের দিন রাত্রিতে ভালো করে দেখেছিল প্রথম। বড়ো হবার সময় থেকেই একটা মেয়ে ভাবতে থাকে, যার সঙ্গে সংসার করবে সে মানুষটা দেখতে কেমন হবে। কেমন ভেবেছিল, সে-সব সবাই ভুলে যায়, তারও সে-কথা মনে নেই।

দাদার স্কুল বা পাড়ার বন্ধুরা তাকে অনেক ছোটো দেখেছে, তারা তাকে খুকু বলেই ডাকত, তুইতোকারি করেই কথা বলত, কিন্তু দাদার অফিসের বন্ধুরা অন্য রকম। দেবলদা দাদার অফিসের বন্ধু ছিল। ভারি ভালো লেগেছিল। ফরসা, অল্প অল্প দাড়ি, চোখ দুটো বড়ো মায়ামায়া, মনে হত ভীষণ দুঃখী। একদিন বিকেলে দাদা বোধহয় পাড়ারই কোথাও গিয়েছিল, দেবলদা এসে হাজির। বাইরের ঘরে বসতে বলে ভদ্রতার খাতিরেই জিজ্ঞাসা করেছিল, চা খাবে কিনা। কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিল, 'না না, একটু আগে চা খেয়েছি।' তারপর একটু থেমে থেকে বলল, 'আচ্ছা তুমি যখন বলছ তখন খাব'। এই একটা কথা কতদিন যে মনের মধ্যে কতবার পাক খেয়েছিল, ভাবলে এখন হাসি পায়। তখন তার বয়স কত, আঠারো? উনিশ? চা করে যখন দিতে গিয়েছিল, তখন দাদা চলে এসেছে। কিন্তু এই ভালো লাগাটা বহুদিন সঙ্গে ছিল। বাড়িতে কেউ কড়া নাড়লে সে-ই ছুটে যেত দরজা খুলতে একটা আশা নিয়ে। কিন্তু সেই ভালো লাগাটা যাকে ভালো লেগেছিল, তাকে বলা দূরে থাক, বলার কথা ভাবেইনি কোনোদিন। তারপর এক রোববারের সকালে বিয়ের কার্ড নিয়ে এসে বাড়ির সবাইকে নেমন্তন্ন করে গেল দেবলদা। আর সে একা সারা দুপুর ছাদে চিলেকোঠার ছায়ায় বসে কাটিয়ে দিল। দাদা বাড়িতে এসে বলেছিল বউটি নাকি দেখতে খুব সুন্দর। তারপরও বহুদিন, সারা জীবন যার সঙ্গে কাটাব, এ রকম মানুষটির কথা ভাবলে দেবলদার মতোই কেউ একজন হাজির হত।

কিন্তু বিয়ের রাতে সমরকে দেখে মনে হয়েছিল, এ রকম একজনের জন্যই সে অপেক্ষা করছিল। কোনো পুরুষ মানুষের এর চেয়ে সুন্দর চোখ এর আগে সে কখনো দেখেনি। আর ভারি পছন্দ হয়েছিল সরু গোঁফটা। তার চোখের দিকে চোখ রেখে সমর জিজ্ঞাসা করেছিল, লীলা, আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে? সে আর কী উত্তর দেবে, বোকার মতো কেঁদে ভাসিয়েছিল। ভাবলে এখন হাসি পায়।

বারবার ভগবানকে বলত, আমি যা চেয়েছি তুমি আমাকে তাই দিয়েছ, তোমায় ধন্যবাদ। প্রথম প্রথম একটাই শুধু খুঁতখুঁত করত, থাকতে হয় কলকাতার বাইরে। কিন্তু পরে মনে হত, এই ভালো। তাদের রাজত্বে শুধু তারা দুজন। সমরের বাড়ির সবাই পূর্ব বাংলার. বিয়ের সময় বাবা-মা-ভাই-বোনেরা এসেছিল,

আর আসেনি। আসলে বহুদিন থেকে সমর এখানে একা, নিজের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগটাও কেমন আলগা হয়ে এসেছে ওর। একদিক থেকে কষ্টও হত আবার ভালোও লাগত, সে ছাড়া সমরের কেউ নেই। এক দিদি থাকত জামশেদপুরে, এক-আধবার এসেছিল, তারাও গিয়েছিল একবার, ওই পর্যন্তই। আর তার বলতে তো মা, দাদা আর বউদি। দাদার বিয়ে হল তার বিয়ের মাস ছয়েক আগে। বউদির সঙ্গে ভালো করে ভাব হবার আগেই শুরু হয়ে গেল তার বিয়ের তোড়জোড়। তার বিয়ের এক বছর ঘুরতে না ঘুরতে মা চলে গেল। দুপুর বেলায় হঠাৎ বুকে ব্যথা, দাদাকে অফিস থেকে খবর দিয়ে আনানোর আগেই সব শেষ। মায়ের কাজ শেষ করে ফিরতে ফিরতে তার একই কথা মনে হচ্ছিল, সমরের মতো তারও আর কেউ রইল না। গোটা রাস্তাটা সে সমরের কাঁধে মাথা রেখে কেঁদেছিল। আর যে-দিন সে ও বাড়ি ছেড়ে চলে এল—গোটা রাস্তায় একটা কথাই ভাবছিল, কেউ না থাকা মানে কী আজ বুঝেছে। তার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের দিনে এ রকম কেউ নেই, যার কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে পারে। গোটা পথটা অসম্ভব জ্বালা করা জল না আসা দুটো চোখ দিয়ে বাইরের দিকে কেবল তাকিয়ে ছিল।

কলকাতা থেকে তিন ঘণ্টা ট্রেন। ছোটো যে শহরটায় সে এ জীবনের প্রথম সংসার পেতেছিল সেই শহরটায় সব কিছুই ছোটো। ছোটো তাদের বাসা, ছোটো পরিচিতের গণ্ডি, জীবনে প্রথম নিয়মিত যেতে হত যে বাজারটায় সেটা ছোটো, শহরের একমাত্র সিনেমা হলটা ছোটো—একমাত্র বড়ো মনে হত একা দুপুরগুলো, কিছুতেই যেন শেষ হতে চাইত না। শহরের দুটো ব্যাংকের একটায় সমরের চাকরি। দাদার চাকরি পাবার আগে তাদের সংসার চলত কষ্টেসৃষ্টে বাবার পেনশনের টাকায়। তার কাছে সংসার চালানো মানে অভাবের সঙ্গে কষ্ট করে লুকোচুরি খেলা। কাজেই প্রথম যেদিন সমর মাইনের টাকাটা তার হাতে তুলে দিয়েছিল, মনে হল, এত টাকা দিয়ে কী করব। সখ করে শুধু একটা গ্রামোফোন কিনেছিল। কলকাতায় গেলে কখনো-কখনো দু একটা রেকর্ড কেনা, সমরের পছন্দ ছিল কে. এল. সায়গল, আর তার ভালো লাগত পঙ্কজ মল্লিক।

সমর বারবার করে বলত কলেজে ভরতি হয়ে যেতে। আই এ পাশ করে সবে বি এ-তে ঢুকেছিল, হুট করে বিয়েটা ঠিক হয়ে গেল। আই এ পাশ করে এক গাদা সিঁদুর লাগিয়ে কলেজে যাবার কথা ভাবলেই এমন লজ্জা লাগত, তার পর কিছু একটা হলে বিচ্ছিরি চেহারা নিয়ে কলেজে ঢোকার কথা ভাবতেই পারত না। তাদের কলেজের বন্ধু ছিল প্রণতি, তার হয়েছিল এরকম। প্রণতির অবশ্য ভীষণ সাহস। বলত, এতে লজ্জার কী আছে? মা হওয়া তো গর্বের কথা।

সে যে যাই বলুক, সে নিজে পারবে না। প্রথম প্রথম সমর অফিসে চলে গেলে যখন ঘড়ির কাঁটা আর নড়ত না, তখন তারও মনে হত, যাই কলেজে ভরতি হয়ে যাই, সময়টা তো কাটবে। মাঝে মাঝে তাদের বাড়িতে আসতেন সমরের বন্ধু অব্যয়বাবু, মেয়েদের কলেজে ইংরেজি পড়াতেন, খুব উৎসাহ দিতেন। কিন্তু ক-দিন পরে কথাটা চাপা পড়ে গেল, আর তারও তাগিদটা চলে গেল। দু দিন পরে তারই মনে হত কলেজে যাবার সময় কই? মা বলত, সংসার চালানো শেখবার দরকার হয় না, ঘাড়ে পড়লে আপনিই শিখে যায়। মেসবাড়ি কাকে বলে তা তো কোনোদিন দেখা হয়নি, ও বাড়ি গিয়ে তার প্রথম মনে হয়েছিল একেই বোধহয় মেসবাড়ি বলে। মা গো, বাথরুমটার কী অবস্থা ছিল! সেই বাড়ি ঘর-দোর ঠিক করা, যে জিনিসগুলো করাব সাহস কোনোদিন বিয়ের আগে হয়নি, সমরের ভালো লাগবে ভেবে সেগুলো করা। আস্তে আস্তে বাজারহাট, কাজের লোকদের শাসন করা, বিকেলে সমরের বন্ধুরা এলে তাদের জন্য খাবারদাবার বানানো, প্রশংসা শুনতে ভালোই লাগত, আশেপাশের বাড়ির মাসিমা বউদিদের সঙ্গে গল্পগুজব করা, এমনকী এক-আধ দিন ম্যাটিনি শোতে তাদের সাথে সিনেমা দেখতে যাওয়া—তার আর সময় কই। শুধু ছ মাসের মধ্যে বিয়ের সময় বানানো ব্লাউজগুলোও ছোটো হয়ে গেল। বউদি বলেছিল, বিয়ের জল গায়ে পড়লে মেয়েরা মোটা হয় এতদিন শুনেছি, এ বার তোকে দেখে তা চাক্ষুষ করলাম।

কবিতা পাড়ার মেয়েগুলোর মতো ছিল না। প্রথম যে দিন অব্যয়বাবু কবিতাকে নিয়ে এসেছিলেন, বলেছিলেন, 'কবিতা আমাদের কলেজে পলিটিকাল সায়েন্সে জয়েন করেছে। সারাদিন বেচারি একা একা থাকে, তাই আপনার সঙ্গে আলাপ করাতে নিয়ে এলাম।

কবিতা মিনিট পাঁচেক ছিল তার সঙ্গে, নতুন আলাপের মামুলি কিছু কথা। অব্যয়বাবুই তাকে ডেকে নিয়ে গেল বাইরের ঘরে। আর মিনিট পনেরো পরেই বাইরের ঘরের থেকে ভেসে এল কবিতার গান, 'বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা, আষাঢ় তোমার মালা'। যদিও সেদিন কোনো ঝড়বৃষ্টি ছিল না। তবে গানের গলাটা ছিল চমৎকার।

জীবনের কাছে তার আর কিছু চাইবার ছিল না। কোনো মেয়েই বা মা হতে চায় না, সেটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। কেমন অবাকই লাগত তার, যে মানুষটাকে সে চিনতই না দুদিন আগে, সেই মানুষটাকেই মনে হত জন্মজন্মান্তরের চেনা। তার চাওয়া, তার পছন্দ, তার স্পর্শ, তার গন্ধ, যেন কত দিনের চেনা। না, সমরের বিরুদ্ধে তার কোনো অভিযোগ ছিল না। বরং মনে হত, সে-ই সমরের মানানসই না। চাইলে তার থেকে অনেক ভালো কাউকে সমর পেতেই পারত।

কবিতার বাসা তাদের পাড়ার পেছনেই। সকাল বেলা রিকশ করে কবিতা কলেজে যেত, ফিরত বিকেলে তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে, চোখাচোখি হয়ে গেলে একটু হাসি, কখনো দু-একটি কথা এই পর্যন্ত। কখনো কবিতা তার সঙ্গে কথা বলার জন্য তাদের বাড়িতে এসেছে, না, তার মনে পড়ে না। প্রথম প্রথম তার রাগ হত, মনে হত নাকউঁচু। কিন্তু কোনো দিন তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার কবিতা করেনি, বরং উল্টোটাই সত্যি। আসলে কবিতা আর তার জগৎটাই আলাদা ছিল। একা থাকা, কলেজে পড়ানো, ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে তর্কে মেতে ওঠা, এ সব, না, সে কখনো পারত না। পাড়ার বউদি মাসিমারা মোটেই কবিতার ওপর সদয় ছিল না। ওই ব্যাটাছেলে ঘেঁষা ধিঙ্গি মেয়েটিকে বাড়িতে ঢুকতে দিয়ে সে কাজটা ভালো করছে না, এ কথা তাকে প্রায়ই শুনতে হচ্ছিল। সমরদের বন্ধুদের আড্ডা তাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে বসত, সেখানে কখনো-কখনো কবিতা আসত। বড়োদিনের সময় বাড়ির সবাইকে নিয়ে বন্ধুরা পিকনিকে যেত, সেখানেও কবিতা গেছে। কিন্তু সেখানেও সবার মধ্যে থেকেও কবিতা আলাদা। ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশাতেও কবিতা কখনও সীমা ছাড়িয়েছে, তার চোখে অন্তত পড়েনি। তাই কবিতার ওপর রাগতে গিয়েও রেগে থাকতে পারেনি।

সে চলে আসার মাস ছয়েক পরে কবিতা কলকাতায় হঠাৎ তার কাছে এসেছিল একদিন। দুপুরে সে ঘুমোচ্ছিল, বউদি তাকে ডেকে দিয়েছিল।

তাদের কলকাতার বাড়ির দরজায় কবিতা, তার সঙ্গে কথা বলবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, এতটাই অবাক হয়েছিল সে, 'ভেতরে এসো'—এটা বলতেও ভুলে গিয়েছিল।

ভেতরে এসে বসার পর সে বউদির সঙ্গে কবিতার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। কবিতা বউদিকে বলেছিল,

—আপনি নিশ্চয়ই আমার কথা শুনেছেন, আমিই কবিতা। আমি লীলার সঙ্গে একটু আলাদা করে কথা বলতে এসেছি। পাথরের মতো মুখ করে বউদি বলল,

—যা বলবার তা এখানেই বলুন।

কবিতা একটু চুপ করে রইল, যেন মনে মনে কথাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে। তারপর হঠাৎ শুরু করল।

—আমি জানি তুমি আমার ওপর রেগে আছ। তোমার জায়গায় আমি থাকলেও হয়তো এ রকম রেগে থাকতাম। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি তোমার রাগ ভাঙাতে আসিনি। আসলে আমি দিল্লি ফিরে যাচ্ছি, হয়তো এদিকে আর

আসব না। তোমাকে কয়েকটা কথা বলে যাওয়া দরকার মনে করে এখানে এসেছি।

সে খাটে বসে, বউদি খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে, সামনের চেয়ারে কবিতা। কবিতাই বলছিল,

—তুমি জানো আমি ঠিক আর পাঁচটা বাঙালি মেয়ের মতো বড়ো হইনি। আমার লেখাপড়া বড়ো হওয়া সবটাই দিল্লিতে, তারপর বাবা প্রায় জোর করেই শান্তিনিকেতনে পড়তে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আর শান্তিনিকেতনও ঠিক বাংলাদেশের আর পাঁচটা জায়গার মতো না। আমি সমবয়সি পুরুষমানুষকে বন্ধু হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম। কিন্তু সেই পুরুষমানুষটি আমাকে বন্ধু না ভেবে অন্য কিছু ভাবছে, এটা আমি যখন বুঝলাম তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, তোমার অনেক বড়ো ক্ষতিহয়ে গেছে। একজন মেয়ে হিসেবে এটা আমার অনেক আগে বোঝা উচিত ছিল। আসলে কী জানো, আমি অনেক শিক্ষিত, আমি অনেক প্রোগ্রেসিভ; তোমরা বাঙালি গৃহবধূ, তোমরা দুনিয়ার কী জানো—এই উন্নাসিকতাই আমাকে অন্ধ করে রেখেছিল। যে দিন আমি শুনলাম তুমি চলে গেছ, সে দিনই জানলাম, আমি যা বুঝেছি তা কতটা ভুল। আমার ধারণা ছিল না, তুমি এতটা সাহসী।

হঠাৎ বউদির দিকে তাকিয়ে বলল,

—আমি জানি বউদি, আপনি ভাবছেন মেয়েটার সর্বনাশ করে, এখন এসব ন্যাকামো করছি কেন। আমি হেল্পলেস, আমি কাউকে বোঝাতে পারব না। হ্যাঁ, আমি সন্ন্যাসিনী নই, আমিও আর পাঁচটা মেয়ের মতো সুখ, সংসার সব চাই। কিন্তু লীলা, আমি এত বড়ো অমানুষ নই যে, অন্যের সংসার ভেঙে নিজের সুখ চাইব।

বলতে বলতে কবিতা উঠে দাঁড়িয়েছিল,

—চলি, আর হয়তো কোনোদিন দেখা হবে না। তবে তোমাকে একটা চিঠি দেব আমার নতুন ঠিকানা জানিয়ে। যদি মনে করো ডেকে পাঠিয়ো, যেখানে থাকি তোমার পাশে এসে হাজির হব। আসলে ওখানে থাকার সময় মনে হত এখানে আমার কোনো বন্ধু নেই। তোমাকে আমি চিনতেই পারিনি গো। কী আর বলব, চেষ্টা কোরো ভালো থাকতে। মাথা উঁচু করে ভালো থেকো।

কবিতা চলে যাওয়ার পর সে চুপচাপ বসেছিল খাটে। বউদি শুধু বলেছিল, আর যাই হোক, মেয়েটা মিথ্যেবাদী না। আর তার মনে হল, কবিতাকে অন্তত এক কাপ চা খেতে বলা উচিত ছিল।

## ॥ পাঁচ ॥

দাদা কেমন যেন অসহায়ের মতো বসেছিল, অফিসের জামাকাপড়টাও ছাড়া হয়নি। সমর অফিসে চলে যাবার পর সে চলে এসেছিল। যে চিঠিটা লিখে রেখে এসেছিল তাতে একটা লাইনই ছিল, 'আমি চললাম, আর আসব না'। আগের গোটা রাতটা জেগে থাকতে থাকতে ভেবেছিল সমরকে এই শেষ চিঠিতে কি লিখবে। কিন্তু অনেক ভেবে দেখল, সত্যিই তার কিছু আর বলার নেই। অশান্তির শুরুর দিকটায় মনে হত, তার একটা বাচ্চাকাচ্চা থাকলে বোধহয় ভালো হত, সমরের দিকে না তাকিয়ে বাচ্চাটাকে নিয়েই বেঁচে থাকা যেত, পরে তার মনে হয়েছে—বাচ্চা না হয়েই ভালো হয়েছে। যে বাচ্চার মা-বাবা একে অন্যকে বিশ্বাস করে না, তার এ পৃথিবীতে না আসাই ভালো। বরং একটা অসহায় বাচ্চার জীবনকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে না দিয়ে সবটাই সে নিজে বহন করুক।

বিকেলবেলায় যখন সে এ বাড়িতে ঢুকেছিল তখনো দাদা অফিস থেকে ফেরেনি। বউদি কিছুটা অবাক হয়েছিল তাকে দেখে, কিন্তু কিছু বলেনি। ভেবেই এসেছিল, দাদা আসলে একবারে বলবে। বুলবুলিটা তখন বছর খানেকের, বউদি তাকে নিয়েই ব্যস্ত। একটা কথারই কোনো উত্তর তার জানা ছিল না, দাদা বা বউদি যদি বলে এ বাড়িতে তার কোনো জায়গা হবে না, তবে সে কী করবে? বাসে হাওড়া ব্রিজ পার হতে হতে ভাবছিল, সে রকম হলে আজ রাতেই ফিরে আসবে এখানে। সমরের একটু অস্বস্তি হবে, হয়তো মনে মনে খুশিই হবে, দাদা একটু কান্নাকাটি করবে, ব্যাস, এই পর্যন্ত। তার মতো কত মেয়ে এভাবে হারিয়ে যায় কে-ই বা খোঁজ রাখে। একটাই বাঁচোয়া, তার নিজের স্বপ্ন, নিজের দুঃখ, এ সবই তার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যাবে গঙ্গার জলে।

সব শুনে দাদা শুধু বলেছিল, এতদিন কিছু বলিসনি কেন, এখন কী হবে? এ কথার উত্তর দেবার মতো অবস্থা তার ছিল না, কান্নায় ভেঙে পড়ার আগে

সে শুধু বলতে পেরেছিল, 'আমাকে কয়েকটা দিন তোমাদের এখানে থাকতে দাও। আমি কথা দিচ্ছি, কিছু একটা ব্যবস্থা করে আমি চলে যাব'।

বালিশে মাথা গুঁজে কতক্ষণ সে কেঁদেছিল তা তার মনে নেই। পিঠে হাতের ছোঁয়া পেয়ে বুঝেছিল দাদা না, ছোঁয়াটা বউদির! আর সত্যি তো এটাই, দাদাকে বললেও আসলে তার সবগুলো কথাই তো সে বলেছে বউদিকে, শেষ আশ্রয় চেয়ে তার সবটুকু আকুতিই বউদির কাছে। দাদাকে সে চেনে, তাকে এ অবস্থাতে আশ্রয় দেবার সাহস দাদার নেই, আবার তাকে রাস্তায় বার করে দিতেও দাদা পারবে না, যা বলার তা বউদিই বলবে।

—ওঠ, কাঁদছিস কেন। আমরা তো আছি। এ বাড়িতে ভাতের হাঁড়ি যত দিন চড়বে তোর কোনো চিন্তা নেই। খুকু, শুধু একটা কথা বল, তুই সব বুঝে এসেছিস তো?

সে শুধু চুপ করে মাথা নেড়েছিল।

—কথাটা ভেবে বলছিস তো, না কি ঠাকুরজামাইয়ের সঙ্গে রাগারাগি করে চলে এসেছিস, দু দিন পরে রাগ কমে যাবে?

বালিশ থেকে মাথা না তুলে সে কেবল মাথা নেড়েছিল।

—তা হলে উঠে বোস। কপাল পুড়িয়ে এসেছিস, পরে পরে কাঁদবার সময় তোর নেই। আজ থেকে তোকে অন্যভাবে বাঁচতে হবে।

—কী বলছ তুমি চপলা?

দাদা যেন আর্তনাদ করে উঠল।

—বিয়ে কি একটা ছেলেখেলা না কি, চাইলেই একদিন হুট করে চলে আসা যায়! আমি কালই যাব সমরের কাছে, ইয়ার্কি না কি।

—যাও। কিন্তু গিয়ে কী বলবে, সমর দয়া করে আমার অসহায় বোনটাকে ঘরে ডেকে নাও। বিয়ে করা বউয়ের সামনে অন্য মেয়েছেলে নিয়ে যা খুশি করো। শুধু দু বেলা দু মুঠো ভাতের জন্য বাড়িতে ঝি-গিরিটুকু করতে দাও?

—না, তা কেন বলব।

—তা বলবে না তো কী বলবে? হুট করে চলে এসেছে? পুরুষ মানুষ, তুমি বুঝবে কী করে,কত দূর গেলে একটা মেয়েকে নিজের স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসতে হয়। ঝি-গিরি যদি করতে হয়, তবে নিজেদের বাড়িতেই করুক। অন্যের বাড়িতে গিয়ে করবে কেন? বোন তোমার, তোমরাই ঠিক করবে। তবে ও যদি চায় এখানে থাকবে, এখানেই থাকবে। খুকু, তোকে শুধু একটা কথা বলতে হবে।

সে উঠে বসেছিল আগেই।

—বল, দু দিন পর ফিরে গিয়ে পায়ে ধরে সাধবি না তো? আর যদি তাই করিস, তবে কাল সকালেই তোর দাদা গিয়ে তোকে ফেরত দিয়ে আসবে।

—না, বউদি আমি সব ছেড়ে এসেছি।

বউদি তার দিকে তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টিতে, যেন তার মনের জোর কতটা দেখছে। তারপর আস্তে আস্তে তার কাছে এসে প্রায় ফিসফিস করে বলল,

—কোনো ভয় নেই তোর, আমি আছি।

বউদির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে কেঁদেছিল, তবে এই কান্না আগের কান্নাগুলোর মতো নয়। দাদা বসে রইল মাথায় হাত দিয়ে।

সেদিন থেকেই তার অন্যভাবে বাঁচা শুরু। আর সে বাঁচায় সে যেন এক মাটির ঢ্যালা, আর বউদি তাকে নিজের মতো করেই তৈরি করে নিচ্ছে। কতই-বা বড়ো তার থেকে, বড়ো জোর বছর দুয়েকের। বউদিকে না পেলে তার কী হত? চলে আসবার দিন তার সারাক্ষণ মনে পড়ছিল মার কথা। কী হত মা থাকলে, মা তাকে জড়িয়ে ধরে তার মতোই কাঁদত। না বউদি কাঁদেনি, শুধু মরে যাওয়া একটা মেয়েকে মারতে মারতে বাঁচতে শিখিয়েছে। তার পোড়াকপালেরও ভাগ্য, এমন একটা মানুষকে পাশে পেয়েছিল। টানাটানির সংসারে তার শুধু ভাতকাপড়ের ব্যবস্থাই করেনি, বউদি তাকে আবার কলেজে পাঠিয়েছে, তাকে এম এ পাশ করিয়েছে। বেশি টিউশনও করতে দেয়নি, পাছে তার লেখাপড়ার ক্ষতি হয়। অথচ বউদি নিজে ম্যাট্রিকও পাশ করেনি। বউদি, সে আর বুলবুলি এই তিনজনকে নিয়ে তার নতুন জগৎ।

বউদি বলত, দ্যাখ খুকু, জীবনটা তোর শেষ হয়ে যায়নি, কতই-বা তোর বয়স। বাইরে তো শুনি মেয়েদের এই বয়সে আকছার বিয়েটিয়ে হয়।

হাসতে হাসতেই সে জবাব দিয়েছে, এক বারেই আমার অনেক শিক্ষা হয়েছে, আর ও পাঠশালায় আমায় পাঠিয়ো না। তোমরা আছ, আমার আর কিছু লাগবে না।

—দূর পাগলি, আমি আর তোর দাদা কি চিরকাল বেঁচে থাকব নাকি, কে দেখবে তখন তোকে?

—কেন গো, বুলবুলি আমাকে দেখবে না?

—ও বাবা, তোকে দেখবে না, পিতি বলতে তো সে অজ্ঞান। কিন্তু মেয়েমানুষ আর নিজের কাজ ক-জন করতে পারে।

—না, আমাদের বুলবুলি সে রকম হবে না। সে-রকম করে আমরা ওকে মানুষই করব না। শোনো বউদি, ও ভালো করে লেখাপড়া শিখবে, বড়ো চাকরি করবে, মাথা উঁচু করে রাজরানির মতো শ্বশুরবাড়িতে ঢুকবে ও।

—ঠিক বলেছিস খুকু, আমাদের বুলবুলিকে আমাদের মতো করে তৈরি করব না। দ্যাখ, আমি তো গোমুক্‌খু। লেখাপড়ার ব্যাপারটা তুই দেখবি। আমার মেয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচবে। তোকে সত্যি কথা বলি, তুই যেদিন ফিরে এলি আমার প্রথম মনে হয়েছিল, এ কোন উটকো ঝামেলা ঘাড়ে এসে পড়ল। পরে মনে হল আমার বুলবুলির যদি এরকম হয়, আর সেদিন যদি আমি না থাকি, তবে কি ওকে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে?

তার জীবনে আজও যদি আনন্দের লেশমাত্র থেকে থাকে তবে তা বুলবুলি। বুলিবুলি তার এই পাথর চাপা জীবনে এক মাত্র খোলা আকাশ। বি সি এস অফিসার। বর গৌতমও তাই—প্রেম করে বিয়ে করেছে। বড়ো ভালো ছেলে। প্রথম শুনে বউদি আপত্তি করেছিল, সে-ই বুঝিয়ে রাজি করিয়েছে।

বাসি বিয়ের দিনে চলে যাবার সময় বুলবুলি কাঁদেনি। শুধু তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, কেঁদো না পিতি, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না, সারা জীবন আমি তোমার সঙ্গে থাকব।

হে ভগবান, জগতের যা দুঃখ সবই তো আমাকে দিয়েছ, আমি তোমাকে কিছু বলব না, তুমি শুধু মেয়েটাকে সুখী রেখো।

কলেজের দুটো বছর ছিল সবচেয়ে কষ্টের। এক তো এত দিন ছেড়ে থাকবার পর আবার লেখাপড়া শুরু করা। প্রথম প্রথম নিজেই অবাক হত, সে নিজে আই এ পাশ করেছিল কী করে। বউদির গালাগালের ভয় না থাকলে নির্ঘাত পালাত। ক্লাসের বাকি মেয়েগুলো বয়সে তার থেকে ছোটো। আর কী করে যেন সবাই, সে যে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসা একটা মেয়ে, সেই কথাটা জেনে গিয়েছিল। কাজেই তাকে নিয়ে অনেক উৎসাহ, কিন্তু তার কাছে আসার সাহস কারোর নেই। তার প্রতিদিনকার কলেজ মানে মাথা নীচু করে ক্লাসের শেষ বেঞ্চে গিয়ে বসা, আর ক্লাস শেষ হলে বাড়ি ফিরে আসা। তুলনায় বরং ইউনিভার্সিটির জীবনটা একটু অন্য রকম ছিল। বয়সের ফারাকটা এখানে খুব বড়ো ব্যাপার ছিল না। আর নিজের কথা সে নিজের থেকেই বলেছিল। ক্লাসে মেয়ে অল্প কয়েক জনই ছিল, কিন্তু মোটামুটি বন্ধুত্ব হয়েছিল অনেকের সঙ্গেই। বরং ছেলেগুলোকে নিয়েই সমস্যা হত। স্বামী পরিত্যক্তা একটা মেয়ের দিকে ছেলেরা তাকায়ই অন্যভাবে। সেই দিন থেকে বহু দিন পর্যন্ত, এই তাকানো তাকে রেহাই দেয়নি। পাড়াপড়শি থেকে আত্মীয়স্বজন, বউদি মা দুর্গার মতো তাকে আগলে রাখত। কিন্তু বাইরে, বউদিকে কোথা থেকে পাবে। দাদার বাড়িতে আসবার পরের দিন থেকেই সে সিঁদুর দেওয়া ছেড়েছিল, বউদির আপত্তিও শোনেনি। শাড়ির রং থেকে ব্লাউজের হাতা সবই তাকে হিসেব করে

করতে হত। চেহারা ছবিতে বৈধব্যের ছাপ ফুটিয়ে তোলা ছাড়া বাঁচবার কোনো উপায় নেই। প্রতি মুহূর্তে তাকে প্রমাণ করতে হত, সে কোনো মেয়ে না, ইট-কাঠ পাথরের মতো নির্জীব কিছু। ময়লার গাদার পাশে থাকতে থাকতে মানুষ যেমন দুর্গন্ধে অভ্যস্ত হয়ে যায়, সেও এ সব কিছুতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তবে সবাই এ রকম ছিল না। যেমন অরুণ, বনগাঁর ওদিকে থাকত। অরুণই তার কাছে আসত। ক্যানটিনে, বাসস্ট্যান্ডে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকার সময় অনেক দিনই অরুণ তার সঙ্গে এসেছে, গল্প করেছে। জীবনে একবারই সে কফিহাউসে গিয়েছে, অরুণ নিয়ে গিয়েছিল। ভালোই লাগত অরুণকে, অরুণের হাবভাবে তাকে ভালো লাগার ব্যাপারটাও বোঝা যেত। কিন্তু ব্যাস ওই পর্যন্ত, এর বেশি সে কিছু ভাবেওনি, এর বেশি কিছু হয়ওনি। কাজেই ফাইনাল ইয়ারের শেষদিকে একদিন যখন অরুণ এসে লাজুকভাবে বলল, বাড়ি থেকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে, সে অবাক হয়নি। শুধু জিজ্ঞাসা করেছিল, পরীক্ষা দেবেন না? অরুণ বলেছিল, দেখি। কেমন আছে অরুণ? তাকে কি মনে পড়ে অরুণের? কে জানে?

এতদিন পর এই রাতে হঠাৎ অরুণকে মনে পড়ে গেল। মনে করার ব্যাপারে, মনে হয়, সে ক্রীতদাস, সমর ছাড়া কারোর কথা ভাববার অধিকার তার নেই। তিন যুগ আগে যে মানুষটাকে ছেড়ে এসেছিল, আজও তার ভাবনাচিন্তার জগৎ জুড়ে কেবল সেই। প্রথম প্রথম যখন অসহ্য লাগত তখন মনে হত সময় নিশ্চয়ই দয়ালু, এক সময় এই যন্ত্রণা কমিয়ে দেবে। আজ সে বোঝে, কমানো বাড়ানো ব্যাপার না, দরকার একদম ভুলে যাওয়া, যা অসম্ভব। যতদিন যাচ্ছে সমর যেন আরো তাকে ঘিরে ধরছে। অথচ এ রকম হবার কথা ছিল না।

বউদি যখন বলত, শেষ বয়সটা কী করে কাটাবি। তখন মনে হত, এর থেকে বেশি আর কী হবে বয়স বাড়লে? আজ সে বোঝে, গল্প-উপন্যাসে লেখা নিঃসঙ্গতা কথাটার আসল মানে কী? মাঝে মাঝে মনে হয়, কোনো রাতে সে যদি মরে পড়ে থাকে কেউ খোঁজও করবে না। শরীরটা পচে গলে উঠলে দুর্গন্ধ ছড়ালে লোকেরা এসে দরজা ভেঙে তাকে বার করবে। এইসব ভেবে রাতে ঘুম ভেঙে গেলে ভয়ে আর ঘুম আসে না। কোথায় যাবে সে? দাদা-বউদি দুজনেই চলে গেছে, বুলবুলিরা জলপাইগুড়িতে। সত্যি সমর এত নিষ্ঠুর, একবারও এল না।

দাদার বাড়িতে চলে আসার পর প্রথম প্রথম দরজায় কেউ কড়া নাড়লেই মনে হত সমর এসেছে। চোখ বুজলেই সে দেখতে পেত, ক্লান্ত বিধ্বস্ত সমর এসে দাঁড়িয়েছে তাদের দরজায়। তাকে দেখে অস্ফুট গলায় বলবে, সরি লীলা, আমার ভুল হয়ে গেছে। চলো, বাড়ি চলো।

সে ভেবে রেখেছিল, একটা কথাও বলবে না। দিক না বউদি দু-চারটে কড়া কথা শুনিয়ে। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনুক সমর। সে শুধু জলে ঝাপসা হয়ে আসা চোখ নিয়ে সুটকেসটা গোছাবে। গালাগাল থামিয়ে গলায় মিথ্যে রাগ ঝরিয়ে বউদি বলবে, বা রে খুকু, যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর! তুই যে সুটকেস গোছাতে বসলি! রাখ ও সব, তোর দাদা ফিরুন, ভাত খেয়ে তারপর বেরোবি দুজন। হাঁপ ছেড়ে সমর বলবে, গালাগাল অনেক খেলাম বউদি। এ বার একটু চা খাওয়ান।

না এরকম কিছু হয়নি। সবাই এসেছে, শুধু সমর আসেনি। কবিতা চলে যাবার পর সে আস্তে আস্তে বুঝতে পারে, সমর আর আসবে না। তার বেঁচে থাকার সব কিছুতেই বউদি তার সঙ্গী, কেবল এই একটা ব্যাপার ছাড়া। সমরের জন্য অপেক্ষায় সে একা। এই নিয়ে তার অস্থিরতা, তার যন্ত্রণার কোনো আভাস সে কখনোই বউদিকে দেয়নি। বউদি তো প্রায় শর্ত করে নিয়েছিল, সমরের কথা সে কখনো ভাববে না। যে মানুষটার এত মায়াদয়া তার ওপর, এই একটা ব্যাপারে সে কেন এত নির্দয় ছিল? না কি বউদি অন্তর্যামী, প্রথম দিন থেকেই জানত, সমর কোনো দিন আসবে না। সে যাতে আর কষ্ট না পায় সেই চেষ্টাই করত।

সে কোন ভাষায় তার যন্ত্রণার বর্ণনা দেবে। একটা মানুষ আর একটা মানুষকে এভাবে চাইতে পারে! তাকে ছেড়ে আসার আঠাশ বছর পরে আজ এই শীতের যন্ত্রণার রাতে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, কাজটা সে ঠিক করেছিল কি না, সে উত্তর দিতে পারবে না। আর যত দিন যাচ্ছে, 'ঠিক করেছি'—এই কথা বলার জোর যেন কমে আসছে। আর সত্যি কথাটা বলতে না পারার অক্ষমতা তার জীবনটাকে অন্য রকম করে দিল, আর মানকুণ্ডুর পাগলা গারদে আটকে থাকা মানুষটার জীবনটাকে বোধহয় তছনছ করে দিল।

বড়ো জানতে ইচ্ছে করে সমর কেমন আছে, সমর কোথায় আছে। সমরের খোঁজ দু বারই পেয়েছিল, দু বারই দিয়েছিল অমূল্যবাবু—সমরের সঙ্গে একই ব্যাংকে কাজ করত, আর অমূল্যবাবুর শ্বশুরবাড়িও তাদের পাড়ায়। প্রথম খবরটা সে চলে আসার বেশ কয়েক মাস পরের, সমর বদলি নিয়ে চলে গেছে পাটনায়। আর দ্বিতীয় খবরটা বছর দু-এক পরের, সমর ব্যাংকের চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। ব্যাস, সমর তারপর হারিয়ে গেল।

বড়ো দেখতে ইচ্ছে হয়। বয়স বেড়েছে, চুলে নিশ্চয়ই পাক ধরেছে। আগের মতোই ছিপছিপে আছে, না কি শরীরটা একটু ভারী হয়েছে? চোখ দুটো,

আগের মতোই সুন্দর? কার দিকে তাকায় সেই চোখ নিয়ে? বিয়ের কয়েক দিন পরে সমর বলল—লীলা তুমি কিছু বলবে না, তুমি চুপ করে শুয়ে থাকো, আজ সারা রাত আমি তোমাকে দেখব। মাঝখানের সময়টা ঝাপসা হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও স্মৃতিতে জীবন্ত হয়ে আছে এই রাতগুলোই।

দাদার বাড়িতে আসবার পর মাঝেমাঝে রাতে ঘুম ভেঙে যেত, ভেতরে ভেতরে আগ্নেয়গিরির মতো এক ভয়ংকর ইচ্ছা নিয়ে, সমরকে পাবার ইচ্ছা। ভেতরটা যেন ছিঁড়েখুড়ে ফেলত। নিজেকেই সে নিজে গালাগাল করত মনে মনে, আধপেটা খেয়ে বড়ো হওয়া বাঙালি মেয়ের এত কী খিদে! সমরের শরীরের ভেতর তার দম বন্ধ হয়ে আসছে—সেই অনুভূতি যেন এখনো টাটকা। এই বাহান্ন বছরের জীবনেও সে সেই অনুভূতি ফিরে পেতে চায়, পারলে আজ রাতে, এখুনি। অথচ নিখিলবাবুর সঙ্গে তার সংক্ষিপ্ত জীবনযাপন, না কোনো আকর্ষণ সে অনুভব করে না।

একদিকে বোধ হয় ভালোই হয়েছে, সমর কোথায় আছে সে জানে না। জানলে বোধহয় নিজেকে আটকাতে পারত না। ঠিক গিয়ে হাজির হত সমরের সামনে। কিছু কথা সমরকে তার জিজ্ঞাসা করার আছে।

আসলে সমরও তো পুরুষ মানুষ, তার মর্যাদায় লেগেছিল। একটা মেয়ে, তার বিয়ে-করা বউ, সবার চোখের সামনে তাকে ছেড়ে চলে গেল, তার মাথা হেঁট হয়ে গেল। সমর শুধু নিজের সম্মানের কথা ভাবল। একটা মেয়ে নিজের ইচ্ছায় স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে এসেছে, কেউ ভাবেও না, কেউ বিশ্বাসই করে না। সবাই ধরে নেয় বর তাড়িয়ে দিয়েছে। সমর একবারও ভাবল না কত দূর অসহ্য হলে একটা মেয়ে এই দাগ গায়ে নিয়ে বেরিয়ে আসে। ওখানে ঘোষ মাসিমা বলেছিলেন, 'দ্যাখো মেয়ে, মাথা গরম করে কিছু কোরো না। ফোঁস করো, কিন্তু ছোবল মারার কথা ভেবো না। পুরুষ জাতটাই এ রকম। কোথায় যাবে? মাথা ঠান্ডা রাখো। দেখবে শেষমেশ তোমার পায়েই এসে পড়বে।'

কী বলবে সে! বাইরের লোকজন উপযাচক হয়ে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে এ বিষয়ে, এর থেকে বড়ো অপমান আর কী হতে পারে। কী বলবে এই বৃদ্ধাকে। সে তো স্বামীর পেছন পেছন চোখের জল ফেলা অনুগত স্ত্রী হয়ে কেবল বাঁচতে চায়নি। সে সমরকে ভালোবেসে বিশ্বাস করে মাথা উঁচু করে সমর চক্রবর্তীর স্ত্রী হিসাবে বাঁচতে চেয়েছিল। সমরই তাকে এভাবে বাঁচতে শিখিয়েছে। সেই সমর যখন বলছিল, লীলা তুমি ভুল ভাবছ, একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ককে তুমি শুধু শুধু অবিশ্বাস করছ। সমরের শরীরে, জামাকাপড়ে ছড়িয়ে থাকা ওই বন্ধুত্বের

চিহ্নগুলির কথা তুলে ঝগড়া করতে তার রুচিতে বেঁধেছিল। সে শুধু বলেছিল, তুমি আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

সমর যদি বুক চিতিয়ে বলত, হ্যাঁ আমি করেছি। তা হলে এতটা কষ্ট বোধহয় সে পেত না। সমর মিথ্যে কথা বলছে, একটা জলজ্যান্ত সম্পর্ককে আড়াল করার জন্য। যত খারাপই লাগুক, সেও জানে ভালোবাসা তো দাসত্ব না। আজ তার বদলে অন্য কারুর প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়েছে সমরের। সে কী করতে পারে, সরে আসতে পারে কিংবা নিজের ভালোবাসার জন্য আর একবার লড়াই করতে পারে। কিন্তু এটা তো কোনো ভালোবাসা নয়—ভালোবাসার জন্য কেউ বাচ্চাদের মতো মিথ্যে কথা বলে না। এটা একধরনের হ্যাংলামো, লোভ—এ ছাড়া কী বলবে? এই লড়াইয়ে তো সে নামতে পারবে না। সমর ছোটো হয়ে গেছে, নীচু হয়ে গেছে। এই মানুষের সঙ্গে থাকা যায় না। কিন্তু তার ভরসা ছিল, সমর ভুল বুঝতে পারবে। সমর তার কাছে ফিরে আসবে। তার মরবার আগের মুহূর্তে হলেও সমর আসবে, সে যে সমরকে ভালোবাসে। সব কিছুর ওপর আছেন সেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী, তিনিই সমরকে পাঠাবেন তার কাছে।

কে বলল, আজকের রাত সেই রাত নয়? এ রকম অন্ধকার ভয়ংকর শীতের রাত—এসো সমর, আমি আঠাশ বছর ধরে অপেক্ষায় আছি। দরজাটা খুললে নদীর ওপারের তেপান্তরের মাঠ আর পাহাড় থেকে ছুটে আসবে বরফের মতো ঠান্ডা, আর সব উত্তাপ নিয়ে সমর। সেই সমর, সকালে দাড়ি কাটলেও সন্ধ্যার মধ্যেই গালটা কর্কশ হয়ে ওঠে, ক্যাপস্ট্যান সিগারেটের গন্ধ। সে আজ সব ক্ষমা করে দেবে।

কিন্তু সব জানলে কি সমর তার কাছে আসবে? ক্ষমা করবে তাকে? কী করে সমরকে বোঝাবে, নিখিলবাবুর সঙ্গে তার গোটা বিষয়টা নিছক প্রয়োজনের তাগিদে। এই দীর্ঘ সময়টায় সমর কি একা ছিল? সে তো জানতে চায় না সে কথা। সমর কি একবারও ভাববে না, একটা মেয়ের একটা আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়, একজন পুরুষের আশ্রয়।

বউদি যখন প্রথমে কথাটা বলে, সে উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বউদি কথাটা উড়িয়ে দেয়নি। নিখিলবাবু বউদির ছোটোবোনের দেওর, বিপত্নীক, দু-একবার দূর থেকে দেখেছিল। বউদি তাকে বারবার এই আশ্রয়ের ব্যাপারটাই বুঝিয়েছিল। বয়স হলে কে তাকে দেখবে? বউদিই তাকে একা বাঁচার মতো করে তৈরি করেছিল। সেই বউদিই তার ভবিষ্যৎ নিয়ে নিশ্চিন্ত নয়, সেও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বউদি বলেছিল, 'আমিও তোর মতো আশা করেছিলাম ঠাকুরজামাই ভুল বুঝতে পারবে একদিন। ভগবান তো তা করলেন না, আসলে

এতদিনে চলে আসত। তুই একটু ভাব, আমি আর তোর দাদা তো চিরকাল থাকব না। যা হয়েছে ভুলে যা, নতুন করে সংসার পাত। তুই তো নিখিলের কাছে কিছু লুকোচ্ছিস না। তারও জীবনে কাউকে চাই, তোরও চাই।'

না, কোনো অনুষ্ঠান হয়নি সেভাবে। দু বাড়ির লোকজন। বুলবুলিটা কেন জানি, মুখ ভার করে রইল সারাদিন। কী করে সে বোঝাবে কত কষ্ট করে তাকে দিনটা কাটাতে হয়েছিল। সমরের জন্য দুঃখে, না কি অভিমানে, সে জানে না। বউদি শুধু বলেছিল, 'যে গেছে তার কথা ভেবে মন খারাপ করিস না খুকু। যে আসছে, তাকে কাছে টেনে নে'।

বড়ো যৌথ পরিবারের ভিড়ে দিনটা কেটে যেত, মানিয়ে নিতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি। কিন্তু সে যে আর পাঁচজনের মতো না, সেটা অন্যদের ব্যবহারে বোঝা যেত। সে বাড়ির মেজো ছেলের দ্বিতীয় পক্ষে বউ অসুবিধাটা তার জন্য না, প্রথম বউ মারা গেছে, ছেলে আবার বিয়ে করবে, সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু এটা তারও দ্বিতীয় বিয়ে বোধহয় অস্বস্তিটা সেখানেই। এটা যে হবে, সেটা সে ভেবেই এসেছিল, মেনেও নিয়েছিল। কিন্তু রাতটা অসহ্য। বড়োবাজারে মাড়োয়ারির গদির হিসেবের কাজ শেষ করে তিনি ফিরতেন রাত আটটা নাগাদ। এক জানালার ছোটো একটা ঘরে প্রায় অপরিচিত একটা মানুষ আর সে, যারা একসঙ্গে আছে কেবল প্রয়োজনের তাগিদে। ভালোবাসা, আকর্ষণ—সে সব যেন বহু দূরের কথা। তার প্রয়োজন যাই হোক না কেন, অন্য মানুষটার প্রয়োজন কেবল একটা শরীরের, এটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল কয়েক দিনেই। বেশি বয়সেও কাউকে ভালোবাসা যায়, এই বিশ্বাস নিয়েই সে এসেছিল। কিন্তু নিজের কাছে লুকোনোর কোনো অর্থ হয় না, বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি তার হয়নি। এমনকী মানুষটা তার কাছে 'নিখিলবাবু'ই-হয়ে রয়ে গেল, বিন্দুমাত্র কাছে এল না। তার শরীর ছাড়া আর কিছু মানুষটা চায়নি, ওপর থেকে নির্দেশ দেওয়া ছাড়া মানুষটা তার সঙ্গে কোনো কথা বলেনি। একটি মানুষকে ভালো না-লাগার পক্ষে কারণগুলো যথেষ্ট, অন্তত বাইরের কাউকে বোঝানোর পক্ষে।

একটা অসুস্থ অসহায় মানুষকে এতটা নির্দয়ভাবে বিচার করে কি সে ঠিক করছে? প্রশ্নটা তার নিজের ভেতরেই তৈরি হচ্ছে। অনেক পুরুষ মানুষ তো এ রকমই হয়। তাদের ভাব ভালোবাসার প্রকাশ এভাবেই হয়। তার এই ভালো না লাগা বিষয়গুলোর ভেতরে নিখিলবাবুর অন্য কোনো কথা আছে কিনা, তা তো সে কখনও বোঝবার চেষ্টাও করেনি। নিজের কাছে কী করে অস্বীকার করবে, তার আর নিখিলবাবুর মধ্যে প্রতি মুহূর্তে হাজির হয়েছে সমর। আর

সে এতটাই অসৎ তাকে সরিয়ে দেবার বদলে সে আরো কাছে টেনে নিত। রাতে যখন তার শরীরটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলত, সে দাঁতে দাঁত চেপে নির্জীবের মতো চোখ বুজে পড়ে থাকত, আর ভেতরে ভেতরে লোভীর মতো কল্পনা করত সমরকে, খুঁজত সমরের স্বাদ গন্ধ স্পর্শ, এমনকী ক্যাপস্ট্যান সিগারেটের গন্ধটাও।

সমর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় কিছুটা ঝাপসা হয়ে এসেছিল। নিখিলবাবুর পেছন পেছন সেই সমর আবার ফিরে এল ভয়ংকরভাবে। আর সে কোনো চেষ্টা না করে তার কাছেই আত্মসমর্পণ করল। আচ্ছা, নিখিলবাবু কি বুঝতে পেরেছিল? এই প্রশ্নটার কোনো সমাধান সে করতে পারেনি।

বিয়ের মাস তিনেক পরে, দিনটা ছিল শনিবার, সেদিন হাফ ছুটি। নিখিলবাবু বাড়ি ফিরেছিল বিকেল চারটা নাগাদ। ঘরে ঢুকে মানুষটা কেমন অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইল তার দিকে, তারপর জিজ্ঞাসা করল, সে কেন লাল শাড়ি পরে আছে। বিয়ের সময় কে একটা লাল সুতির শাড়ি দিয়েছিল, কিছু না ভেবেই সকালে চানের পর সেই শাড়িটা পরেছিল।

পরের প্রশ্নটা আরো ভয়ংকর, 'বাইরের বারান্দায় কার জন্য দাঁড়িয়েছিলে?'

সে এতটাই অবাক যে কোনো জবাবও দিতে পারেনি। কিন্তু সে কোনো উত্তর না দিলেও প্রশ্ন থেমে ছিল না। প্রথমে দূর থেকে, তারপর হাত দুটো ধরে ঝাঁকুনি। শেষে সহ্য করতে না পেরে সে চেঁচিয়ে উঠেছিল যন্ত্রণায়।

সেই শুরু তার নরক যন্ত্রণার। সন্দেহবাতিক কথাটা জানা ছিল, কিন্তু সেটা যে এতটা ভয়ংকর, তার ধারণায় ছিল না। একটা সময় সে সত্যিই ভেবেছিল সুইসাইড করবে। বাইরের দরজা-জানালা বন্ধ করেও রেহাই নেই, নিজের বাড়ির লোকজনকেও সন্দেহ। তখনই প্রথম জানতে পারে, এবারই প্রথম না, আগেও হয়েছে। তার সেজো জা বউদির ছোটো বোন, তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আগের বউয়ের কী হয়েছিল। 'আমি কিছু জানি না' বলে সে চলে গিয়েছিল।

প্রথম প্রথম লোকটা হঠাৎ হঠাৎ বাড়ি চলে আসত, বোধহয় তার ওপর নজর রাখতে, আর শেষে কাজে যেতই না। চাকরিটা গেল। বিষয়টা আর সন্দেহবাতিকে আটকে রইল না। আর তার সঙ্গে কোনো আলোচনা ছাড়াই বাড়ির লোকেরা একদিন জোর করে লোকটাকে ভরতি করে দিয়ে আসল মানকুণ্ডুতে। নামে মানসিক হাসপাতাল বললেও, আসলে পাগলাগারদ। চরম অসহায় অবস্থার মধ্যে সে বুঝেছিল, আগের বারের মতো দাদার বাড়িতেও ফিরে যাওয়া যাবে না। তার জীবনের এই দুর্ভোগের জন্য নিজেকে দায়ী করল বউদি। যে বউদি

তার এতদিনের সব কিছুর আশ্রয়, মনে হত সেই বউদিই তার সামনে আসতে চায় না।

নিখিলবাবুর সঙ্গে মাঝেমাঝে দেখা করতে যেত। একাই, বাড়ির বাকিরা তো নানা কাজে ব্যস্ত। তাকে দেখলেই লোকটা খেপে উঠত, খারাপ খারাপ কথা বলত। রোজই ভাবত, আর আসব না। কিন্তু যে ডাক্তারবাবু দেখাশোনা করতেন, তিনি একটা কথা বলেছিলেন, উনি আপনাকে খারাপ কথা বলছেন এটা গায়ে মাখবেন না। আসলে ওনার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, এই সব কিছু তারই বহিঃপ্রকাশ। আসবেন ওনার কাছে, আপনারা না এলে উনি আরো কষ্ট পাবেন।

একান্নবর্তী পরিবার হলেও তার শ্বশুরবাড়ি খুব স্বচ্ছল ছিল না। নিখিলবাবুর আয়টাও একটা ব্যাপার ছিল। বিনা আয়ের নিখিলবাবুর চিকিৎসার খরচ বাকিরা বেশিদিন চালাতে পারবে না, এটা তাকে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর তার বোঝাও কতদিন টানবে তা-নিয়ে তার নিজেরও সন্দেহ হচ্ছিল। ভগবান তার ওপর আগাগোড়া নির্দয় হতে পারবেন না বলেই বোধহয় এই চাকরিটা জুটিয়ে দিয়েছিলেন।

চলে আসার দুদিন আগে সে দেখা করতে গিয়েছিল নিখিলবাবুর সঙ্গে। সে দিন অদ্ভুতভাবে লোকটা শান্ত ছিল। সে যখন বলল তার চাকরি পাবার কথা, দূরের একটা শহরে চলে যাবার কথা, লোকটা করুণ মুখ করে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি আর কোনোদিন আসবে না?'

সে বুঝিয়েছিল, স্কুলের ছুটির সময় সে আসবে। লোকটা সব শুনে বলেছিল, 'আমি জানি তুমি আর আসবে না। আর কেউ কোনোদিন আমার কাছে আসবে না'।

ফেরবার সময় ট্রেনে বসে সে অনেকক্ষণ কেঁদেছিল। নিজের জন্য না, কেঁদেছিল নিখিলবাবুর জন্য। এই শীতের রাত্রে মনে মনে হিসেব করে দেখল, বোধহয় বছর চারেক হল সে কলকাতার দিকে যায় না। প্রথম প্রথম যেত নিয়ম করে, গরমের ছুটি আর পুজোর ছুটিতে। তারপর একবার গিয়ে দেখল, তাদের ছোটো ঘরটায় বড়ো ভাশুরের দুই ছেলে থাকছে। ও বাড়িতে তার থাকারও কোনো জায়গা নেই। তাও শ্বাশুড়ি যতদিন বেঁচে ছিল, পুজোর সময় একটা নতুন শাড়ি দিয়ে নমস্কার করতে যেত। তিনি মারা যেতে সে পাটও চুকেছে। কলকাতায় শেষ গেছে দাদা মারা যাবার পর। ব্যাস, কলকাতার সঙ্গে তার সব সম্পর্ক শেষ। তবে এখনো মাইনে পেলে নিখিলবাবুর হাসপাতালে মানিঅর্ডার করে টাকা পাঠিয়ে দেওয়াটা তার প্রথম কাজ।

কেমন আছে মানুষটা? বেঁচে আছে, না মরে গেছে? বেঁচেই বোধহয় আছে, তা না হলে মানিঅর্ডারটা ফেরত আসত। তার কিছু হলে কী হবে? হাসপাতাল থেকে কি পাগল লোকটাকে রাস্তায় বার করে দেবে? সে জানে না, তা নিয়ে ভাবতেও চায় না। তার কথা ভাববার জন্য পৃথিবীতে কেউ নেই, সে কেন অন্যের কথা ভাবতে যাবে?

সে জানে, এই শহরের এই একটা ছোটো ঘরে সে যাবজ্জীবন বন্দি, এক মরা ছাড়া তার মুক্তি নেই। তবে সে মৃত্যুও কুৎসিত। কোনো একদিন এই ঘরে সে মরে পড়ে থাকবে। কেউ জানবেও না। শরীরটা পচে গলে গন্ধ বেরোলে আশেপাশের লোকজন নাকে কাপড় দিয়ে দরজা ভেঙে ঢুকবে। গত জন্মে কত পাপ করেছিল, তাকে এভাবে মরতে হবে?

যার ফাঁসির আদেশ হয়ে গেছে, সেও তো বাঁচতে চায়, অন্তত বাঁচবার কথা কল্পনা করে। সমাজের কাছে তার পরিচয় সে জনৈক নিখিলানন্দ ভট্টাচার্যের বিবাহিত স্ত্রী। আর এটাই তার মৃত্যুর সিলমোহর। কিসের সমাজ, কিসের পরিচয়? সে সমর ছাড়া কাউকে চেনে না। সমরই তাকে একমাত্র মুক্তি দিতে পারে। ভগবানের কাছে, শত কোটি দেবতার কাছে, তার একটাই আবেদন, সে সমরকে ফিরে চায়, পারলে আজ রাতেই।

কানখাড়া করে শুনতে পেল, একটা রিকশ এসে দাঁড়িয়েছে তার ঘরের সামনের রাস্তায়, তারপর সব চুপ। আওয়াজটা ভয়ংকর, এত চমকে বোধহয় কোনোদিন ওঠেনি। কেউ পাগলের মতো দরজাটা ধাক্কা দিচ্ছে, আর তার সঙ্গো প্রাণপণ চ্যাঁচাচ্ছে। কে, কে এভাবে চ্যাঁচায়? কী হয়েছে—ভয়ে দরজার দিকে তাকাতেও পারছে না, ভয়ঙ্কর কিছু একটা হয়েছে বাইরে। কে চ্যাঁচাচ্ছে—দিদিমণি, ও দিদিমণি, দরজা খুলুন। এ যে তাকেই ডাকছে। কে, এত রাতে?

লাইট জ্বালিয়ে দরজাটা খোলা মাত্র কে একটা হুড়মুড় করে পড়ল খোলা দরজার ওপর। মুখটা চেনা চেনা, বোধহয় রিকশ চালায়। মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে। যেভাবে পড়ল, মনে হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে গেছে। গোটা রাস্তাটায় একটা খালি রিকশ ছাড়া কিছু নেই। একটা ঠান্ডা হাওয়া ভেতর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে গেল, তাড়াহুড়োয় চাদরটাও গায়ে দেওয়া হয়নি।

## ॥ ছয় ॥

ব্রাহ্ম মুহূর্তে ওঠার অভ্যাস নিত্যগোপালের আজন্ম। যত রাতেই ঘুমোতে যাওয়া হোক, ভোর পাঁচটার মধ্যে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়বেনই। প্রাতঃকৃত্য, তারপর স্নান এই দুটি প্রথম কাজ। শীত গ্রীষ্ম সারা বছরই এক রুটিন। স্বদেশ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী বছর দুয়েক হল আধঘণ্টার জন্য হাঁটতে বেরোন। শ্মশানটা এড়িয়ে নদীর পাড় বরাবর। ফিরে বড়ো এক গ্লাস চা, বিনা চিনিতে। ডাক্তারের নির্দেশে মিষ্টি খাওয়া ছেড়েছেন দু বছর হল। স্বদেশডাক্তারের বাবা ছিলেন তাঁর প্রতিবেশী এবং বন্ধুস্থানীয়, কাজেই ডাক্তার হলেও তাঁকে তিনি তুমি বলেই সম্বোধন করেন। বলেছিলেন, 'বাবা, নিকুঞ্জ ময়রার গরম জিলিপি আর রসুলপুরের কাঁচাগোল্লা না খেলে বেঁচে থেকে লাভ কি।'

আগে যখন সুধাময়ীর শরীরের অবস্থা এতটা খারাপ হয়নি, তখন সকালের এই চা-টা সে নিজের হাতেই করত। এখন চা করে হারানের মা। নিখিল চলে আসে এর মধ্যেই। অফিস খুলে কাগজপত্র ঠিকঠাক করে রাখে, বাইরের ঘরে লোকজনও আসতে শুরু করে। সমস্যা হল নিখিল আজকাল চোখে কম দেখে। বকাঝকা করে কোনো লাভ হয় না, আবার এতদিনের পুরোনো লোক, তাড়িয়েও দেওয়া যায় না। সরকারি অফিসে কাজ করলে তো এতদিনে রিটায়ার্ড হয়ে যেত। একদিন ভাবছিলেন, তাঁর বিশ্বস্ত সবারই বয়স হয়েছে। কিন্তু নতুন যারা, তাদের বিশ্বাস করতে পারছেন না। এটা তাঁর দোষ, নাকি যুগের দোষ, কে জানে? কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে পুরোনোদের তো চলে যেতে হবেই। কিছু দিন আগেও আভাসে ইঙ্গিতেও এই কথা বললে রাগ হত, এখন আর ততটা হয় না। ভবিতব্য মেনে নিয়েছেন। এই যে রকম ঘুমটা ভেঙে গেল, তারপর থেকে মনে করবার চেষ্টা করেছেন, কাল সকালে নির্দিষ্ট কাউকে আসতে বলেছেন কিনা, কিছুতেই মনে পড়ছে না। এই রকম বিস্মৃতি আজকাল মাঝে মাঝেই হয়।

পিতামহের আমলের বিরাট পালঙ্কের আর-এক প্রান্তে ঘুমোচ্ছে সুধাময়ী। আলো নিভিয়ে ঘুমোতে পারেন না আজকাল। একটা আলো সারারাত জ্বলে। সেই আলোতে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর এখন তিয়াত্তর, আগামী আশ্বিনে চুয়াত্তরে পা দেবেন। মানে সুধাময়ী এখন একষট্টি, দেখে কে বলবে তাঁর থেকে বারো বছরের ছোটো! ছ-ছটি সন্তানের জন্ম আর হাজারটা রোগভোগে কেমন চলচ্ছক্তিহীন জরদ্গবের মতো হয়ে গেছে। কবে সেই তেরো বছরের কিশোরী হয়ে ঢুকেছিল এই বাড়িতে। ডানাকাটা পরি না হোক একটা শ্রী ছিল। দেখবার মতো ছিল চুল আর গায়ের রং। চুল আর নেই কিন্তু গায়ের রংটা এখনো সুধাময়ীর চমৎকার। সন্তানেরা কেউই সুধাময়ীর মতো রং পায়নি। ছোটো পুত্র ছাড়া সবাই পিতৃকুলের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ পেয়েছে। গায়ের রং নিয়ে তাঁর নিজের কোনো ছুতমার্গ নেই, কিন্তু চাপা রঙের চার মেয়েকে পাত্রস্থ করতে গিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন বিয়ের বাজারে গায়ের রঙের অর্থমূল্য কত। তাতেও সামলাতে পারলেন না, সেজো মেয়ে দুই সন্তান নিয়ে ফিরে এসেছে গত বছর। বাপ হয়ে বিধবা কন্যার মুখ দেখাটা বড়ো কষ্টের। অথচ সেজো জামাইটিই ছিল সবচেয়ে করিতকর্মা। বর্ধমানে বিরাট কনট্রাক্টরির ব্যাবসা, এমনকী নিজের বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারেও মাঝেমাঝে জামাইয়ের কাছ থেকে পরামর্শও নিতেন। কিন্তু কপালের লিখন কে খণ্ডাবে। এই মেয়েটাকে নিয়েই বড়ো দুশ্চিন্তা হয়। জামাইয়ের ভাইগুলো পাষণ্ড, শ্বশুরবাড়িতে পাঠানোর কথাই ওঠে না। অবশ্য সম্পত্তির ভাগ চেয়ে মেয়ের নামে মামলা করে দিয়েছেন, কিন্তু সে মামলার ফয়সালা কবে হবে কে জানে। চিরকাল তো তিনি থাকবেন না, চোখ বুজলে কী হবে? কাউকে ভরসা করা যায় না। সে দিক থেকে দেখতে গেলে তো তাঁর বড়ো পুত্র প্রতিষ্ঠিত। হাইকোর্টে তার পসার মন্দ না। কিন্তু জীবনে বোধহয় টাকাপয়সা ছাড়া আর কিছু চেনেনি। বাড়ি এলে দেখা হলে প্রথমে একবার, 'বাবা আপনি কেমন আছেন', ব্যাস। আর বাবার কোনো খোঁজ নেই, শুধু বাবার সম্পত্তির খোঁজ। জমিজমা থেকে কী রকম আসছে, কাঠগোলার আয় হঠাৎ কেন কমে গেল, বাসের থেকে আমদানি বাড়ছে না কি, এই। এমনকী তাঁর অনুপস্থিতিতেও কর্মচারীদের কাছ থেকে নানা কথা জানার চেষ্টা। ছেলে খোঁজ নিচ্ছে এতে তো খারাপ কিছু নেই। কিন্তু বুড়ো বাপ মাথার ঘাম ফেলে কী ভাবে কাজ করছে তার খোঁজ নেই, শুধু কত টাকা জমল তার খোঁজ। গত বছর বৈশাখে হঠাৎ শরীরটা খারাপ হবার পর উইলটা করেছেন। ছেলেমেয়েদের ডেকে বলেও দিয়েছে ভাগবাঁটোয়ারা কী করেছেন। তারপর থেকে বড়ো পুত্রের

গোঁসা, আর এমুখো হয়নি। পারিবারিক কালীপুজোর সময় বড়ো নাতির সঙ্গে বউমাকে পাঠিয়ে দায়িত্ব সেরেছে। যা শালা, কাউকে আসতে হবে না। বেঁচে থাকতে নিত্যগোপাল ঘোষাল কারুর পরোয়া করে না। এক মরার পর মুখাগ্নিটা না করলে পরপারে গিয়ে কষ্ট পাবেন।

আর ছোটোপুত্রের কথা কী বলবেন? মাঝেমাঝে মনে হয় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটার বুদ্ধিশুদ্ধি বাড়েনি। প্রথমে বসালেন পেট্রল পাম্পে, সে ব্যাবসার হাল দেখে ছ মাস পরে তুলে নিতে হল। তারপর আলাদা একটা প্রেস করে দিলেন, এক বছর পর সে ব্যাবসাও লাটে উঠল। এখনো ব্যাংকের ধার শোধ করতে হচ্ছে। এখন ব্যাবসা-ট্যাবসা ছেড়ে পাড়ার ছেলেগুলোকে জড়ো করে ক্লাব করে, আর বছর বছর তাঁর নাতি-নাতনির সংখ্যা বৃদ্ধি করে। তাও লোকজনের বিপদে আপদে ছেলেটা সাহায্য করার চেষ্টা করে দেখি, বাপের এই একটা গুণ ছেলেটা পেয়েছে। না সুধাময়ী, তুমি যাই হও, অন্তত রত্নগর্ভা নও।

এই নিয়ে সুধাময়ীর ওপর কোনো অভিযোগ নেই, সে বেচারা আর কী করবে। তার প্রতি কি সুধাময়ীর কোনো অভিযোগ আছে? দৈনন্দিন জীবনের অভিযোগ নয়, সে তো প্রতি স্ত্রীরই স্বামীর প্রতি হাজারটা থাকে, সুধাময়ীরও আছে। স্ত্রীকে নিয়ে আদেখলাপনা, সেটা তাঁর কোনোদিনই ছিল না। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব পালনে তিনি কখনো অবহেলা করেননি। মেয়েছেলে আসক্তির ব্যাপারে তাঁদের বংশের খুব একটা সুনাম কোনোদিনই ছিল না। এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি তাঁর ভালো লাগে না। এ কথা ঠিক, বিয়ের সময় তিনি কুমার ছিলেন, তা নয়। বিবাহিত জীবনেও স্ত্রী ছাড়া অন্য কাউকে স্পর্শ করেন না, তাও নয়। কিন্তু সে রকম আসক্তি তাঁর কোনোদিনই ছিল না। আর একজন স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে এর বেশি কী প্রত্যাশা করতে পারে?

কিন্তু এই মানসিক অস্থিরতা কোনো কারণে তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। নিজের কাছে সত্যকে আড়াল করে তো কোনো লাভ নেই। গত বৈশাখ মাসে রাতের দিকেই, এ রকম অবস্থা তাঁর কোনো দিন হয়নি। সে এক অদ্ভুত অস্থিরতা, সারা শরীর থেকে দরদর করে ঘাম। স্বদেশডাক্তার এসে কী সব ইনজেকশন আর একগাদা ওষুধ দিয়েছিল, আর বলে গিয়েছিল, কোনো অবস্থাতেই যেন বিছানা ছেড়ে না ওঠেন। পরের দিন সকালে যখন তিনি কিছুটা সুস্থ বোধ করছেন, তখন আসল কথাটা বলেছিল স্বদেশ, কাকাবাবু কাল বড়ো ফাঁড়া গেছে আপনার। কাল আপনার একটা হালকা হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। এক্ষুনি বিপদ কিছু নেই, কিন্তু আপনাকে কলকাতায় গিয়ে একটু ভালো

করে চেক-আপ করাতে হবে। তিনি সে সব চেক-আপ করে এসেছিলেন। কলকাতায় তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা ক্যাম্বেল হাসপাতালে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, কোনো অসুবিধা হয়নি। কিন্তু সেখানেও ডাক্তাররা বারবার বলেছিল, এখন থেকে সাবধানে থাকবেন। পরে তিনি স্বদেশডাক্তারকে ডেকে বললেন,

—এই যে তোমরা সবাই মিলে বলছ, সাবধানে থাকবেন, সাবধানে থাকবেন, এর মানে কী?

—মানে কাকাবাবু পরিষ্কার, কোনো ব্যাপারে বাড়তি চাপ নেবেন না। বেশি উত্তেজিত হবেন না।

—আচ্ছা স্বদেশ, তুমি তো আমায় চেনো। রাজনীতি করব, দেশের কাজ করব, আর উত্তেজিত হব না, এ কখনও হয়? তুমি তো নিজে জানো, গোটা টাউনের সব ঝামেলা এই বৃদ্ধের ওপর। এখানকার সব তো আছেই, কলকাতায় গিয়ে ছুটোছুটি সে-সবও আমার। এ কথা ঠিক, আমার সঙ্গে মন্ত্রীদের আলাপ পরিচয় আছে, টাউনের জন্য কাজকর্ম করে আনতে সুবিধা হয়। কোনো মুরুব্বির ক্ষমতা হত, এই টাউনের জন্য এত বড়ো একটা ব্রিজের টাকা বার করে আনা!

—কাকাবাবু, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন? আসলে এত বড়ো ডাক্তার উনি, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

—ওনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়নি, তবে আমার ধারণা, উনি আমায় নামে চিনবেন। দুঃখ এটাই, ভেবেছিলাম ব্রিজটার উদ্বোধন ওনাকে নিয়ে এসে করাব। ওনার সেক্রেটারির সঙ্গে আবার আমার খুব ভালো আলাপ। কিন্তু লোকে ভাবে এক, আর হয় আর-এক।

—সে যাই হোক কাকাবাবু, একটু সাবধানে থাকবেন।

ডাক্তারকে আর কি বলবেন। এই সব কিছু ছাড়ার কথা যে ভাবেন না, তা তো নয়। এবারের বিধানসভা ইলেকশনের পর ঠিক করে ফেলেছিলেন, সব ছেড়ে দেবেন। অনেক হয়েছে। এই বয়সে এই অপমান অসহ্য। তিনি সত্যি ভেবেছিলেন, অনাদিবাবুর মৃত্যুর পর তিনিই তো এ এলাকার সবচেয়ে বয়স্ক আর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। সব দিক থেকে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন, টাকাপয়সা থেকে লোকজন সব কিছু। মনে হচ্ছিল, ভগবান বোধহয় শেষ বয়সে এসে জীবনের শেষ ইচ্ছাটা পূরণ করে দেবেন। তাঁর দীর্ঘ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার বিষয়টি প্রাদেশিক নেতৃত্বের সবাই জানেন। মনে মনে ভেবে রেখেছিলেন, বসার ঘরে বড়ো করে ছবিটা বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখবেন। রাজ্যপালের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিচ্ছেন।

তিনি ভাবতে পারেননি। শেষে কি না মণ্ডল! দুনিয়াসুদ্ধ সবাই জানে, একটা থার্ড ক্লাশ সুদখোর। সত্য মিথ্যা জানেন না, অনেকে বলছিল, জেলার সভাপতির ছেলের ব্যাবসায় টাকা ঢেলে টিকিটটা জোগাড় করেছে মণ্ডল। এ অপমান তিনি কোনোদিন ভুলবেন না। সভাপতি তাঁকে বলল, প্রাচীন ভারতে বানপ্রস্থের ব্যবস্থা ছিল সমাজের ভালোর জন্যই, যাতে নতুনরা দায়িত্ব নিতে পারে। আমরা বুড়োরাই যদি সব কিছু দখল করে রাখি, তবে দেশের ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকবে না।

ভাবতে ভাবতে ফিরেছিলেন—কলকাতার কাউকে ধরে একবার অতুল্যবাবুর কাছে গিয়ে বিষয়টা নিয়ে আবেদন করবেন কি না। পরে ভাবলেন, না থাক, অনেক হয়েছে, আর দেশের কাজ করার দরকার নেই। যথেষ্ট প্রতিদান পেয়েছেন।

কিন্তু ছাড়তে পারলেন কই। মাঝে মাঝে মনে হয় এ সবই করছেন অভ্যাসবশত, আর কিছু করার নেই তাই করছেন। এই সকাল হলে মেশিনের মতো গত পঞ্চাশ বছর ধরে যা করছেন, তাই করতে শুরু করবেন। কোনো তাগিদ নেই, কোনো আবেগ নেই, করে যেতে হয় বলে করে যাওয়া। নাকি দুর্জনেরা যা বলে তাই ঠিক, আসলে এ সবই লোভ, ক্ষমতা ছাড়ায় অনীহা। এখনও রাস্তায় বেরোলে হাজারটা লোক কথা বলে, নমস্কার করে, কেউ কেউ পায়ের ধুলো নেয়। অনুগ্রহপ্রার্থীরা মোসাহেবি করে, প্রতিপক্ষ ভয় পায়। এই বয়সে এ সব ছাড়লে আর কীই-বা থাকে জীবনে। সবার চোখে গুরুত্বহীন হয়ে, অন্যের দয়াপ্রার্থী হয়ে চলচ্ছক্তিহীন অবস্থায় বার্ধক্যের জীবন, এর থেকে মৃত্যু ভালো।

## ৷ সাত ৷

আলমারিটা বাবার আমলের। কোনো ফেল পড়া ব্যাংকের থেকে নিলামে কেনা হয়েছিল। প্রায় আধ ইঞ্চি পুরু স্টিলের তৈরি। পুরোনো বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে আটটা জোয়ান লেগেছিল। আলমারিটা নিয়ে নিজের একটু অহঙ্কারই আছে। শুধু একটাই দোষ, খুলতে গেলে একটা বিকট আওয়াজ হয়। মনে হয় আচমকা কোনো জন্তুর গলা টিপে ধরা হল। সুধাময়ীর ঘুমটা পাতলা, আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেলে কী বলবেন, মাঝরাতে হঠাৎ আলমারি খুলে কী করছেন? ঘরে সারারাত আলো জ্বলে, এটাও তাঁর জীবনে বেশি বয়সের অবদান। কয়েক বছর হল, অন্ধকার হয়ে গেলে কেমন জানি দম বন্ধ হয়ে আসে। সুধাময়ী খুব বাধ্য না হলে তাঁর ইচ্ছায় বাধা দেয় না, এ ক্ষেত্রেও দেয়নি।

বালিশের তলা থেকে চাবিটা বার করে একটু ইতস্তত করে আলমারিটা খুলেই ফেললেন। এই নিস্তব্ধ রাতে আওয়াজটা হল আরো ভয়াবহ। সুধাময়ী একটা অস্পষ্ট আওয়াজ করে পাশ ফিরে শুল। কপাল ভালো তাঁর, ঘুমটা ভাঙেনি। এই আলমারির কোথায় কোন কাগজ আছে সেটা তাঁর নখদর্পণে, চোখ বুজে তিনি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাগজের টুকরোটিও সঠিকভাবে বার করে আনতে পারেন। হলুদ হয়ে আসা পাকানো তুলোট কাগজটিকে বার করে আনলেন। সত্যি বিস্ময় হয়, সত্তর বছরে বারবার ব্যবহৃত কাগজটির কেবল রংটাই একটু পুরোনো হয়েছে, কিন্তু কাগজের কিছু হয়নি। খাটের পাশে রাখা ছোটো কালো মেহগনির টেবিলের ওপরের টেবিলল্যাম্পটা জ্বালিয়ে নিলেন। কাগজটা টেবিলে ছড়িয়ে নিতেই অপর প্রান্তটি গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। টেবিলের ওপরেই তাঁর চশমা, ম্যাগনিফাইং গ্লাস। আবার গোড়া থেকে তন্নতন্ন করে দেখতে শুরু করলেন। বিচারে কি কোনো ভুল হয়নি পণ্ডিতমশাইয়ের?

পণ্ডিতমশাই শতায়ু, তাঁর বাবার কোষ্ঠীও বিচার করতেন। এই বয়সেও চশমার প্রয়োজন পড়ে না। তাঁকে নাম ধরেই সম্বোধন করেন পণ্ডিতমশাই।

এই টাউনে বোধহয় এ রকম দু-চারজনই বেঁচে আছেন যাঁরা তাঁকে নাম ধরে ডাকেন। পণ্ডিতমশাইয়ের কথা তার পরিষ্কার কানে বাজছে, 'দ্যাখো নিত্যগোপাল, অপ্রিয় সত্য বলার ব্যাপারে অনঙ্গ পণ্ডিতের দুর্নামের কথা সবাই জানে। কোষ্ঠীবিচার করে জাতকের মন জুগিয়ে কথা বলার অসততা আমি করি না। বাবা, সামনের সময়টা তোমার খারাপ যাবে। শুক্রের মহাদশা আর মঙ্গালের অন্তর্দশা শুরু হয়েছে। শুক্রের মহাদশা এই লগ্নের জন্য মারক এবং অন্তর্দশা মঙ্গাল দ্বিদ্বাদশ সম্পর্কে আবদ্ধ, এই সময়ে জাতকের বিপদের সম্ভাবনা। মন্ত্রেশ্বরের কথা যদি মানতে হয়, তবে সতর্ক হও। বিপদ আসবে অকস্মাৎ, বজ্রপাতের মতো।'

সারা জীবনে পণ্ডিতমশাইয়ের বিচারকে অবিশ্বাস করার মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি। তাও বারবার দেখতে হয়। মানুষের জীবনের ওপর গ্রহনক্ষত্রের প্রভাব আসলে তো ঈশ্বরের লীলা। কোনো নশ্বর মানুষ কি তা সব অনুমান করতে পারে? তা হলে তো মানুষ আর ঈশ্বরের কোনো পার্থক্য থাকে না। যতই পণ্ডিত হোক, কেউই অক্ষরে অক্ষরে ঠিক ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পারে না। কোষ্ঠীবিচার, হস্তরেখা বিচার এ সবই আসলে অনুমানশাস্ত্র। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে পণ্ডিতমশাইয়ের অনুমান মিলে গেছে। বৃশ্চিক লগ্ন কুম্ভ রাশি তাঁর, রবি একাদশে, নিশ্চিত প্রমাণ রাজবংশেই তাঁর জন্ম। আজকাল তো আর পুরোনো আমলের মতো রাজবংশ হয় না। ভূসম্পত্তির পরিমাণ যদি বিচার্য হয়, তবে তো তাঁর বংশ রাজবংশই। রবি একাদশে থাকায় এবং বৃহস্পতির দশমে দৃষ্টি পড়ায় তিনি নিজেও রাজধর্মে রত থাকবেন, এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। নবাংশ চক্রেও বৃহস্পতি অত্যন্ত শুভ। অষ্টমপতি এবং একাদশপতি বুধের দশায় রাজনীতিতে সাফল্য ও ব্যর্থতা উভয়েরই সমাবেশ ঘটিয়েছে। এ স্বাভাবিক, রাজনীতিতে উত্থান ও পতন দুটোই থাকবে। কিন্তু নিজে যেটুকু কোষ্ঠী বোঝেন তাতে তাঁর কাছে পরিষ্কার, ঈশ্বর তাঁকে একজন শক্তিশালী পুরুষ হিসাবেই তৈরি করতে চেয়েছেন। কিন্তু সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষের জীবনেও চরম এক দুর্বল মুহূর্ত তো আসবেই, সে ভবিতব্য কে খণ্ডাবে! তাঁর জীবনেও কি সেই মুহূর্ত সমাগত?

পণ্ডিতমশাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,

—এর কোনো বিপন্ন নেই?

—গ্রহরত্নে আমার খুব গভীর আস্থা নেই, তবে অভিজ্ঞতায় দেখেছি কখনো কখনো কাজ করে। এ ক্ষেত্রে আমার বিধান হল, তুমি একটি রক্তমুখী প্রবাল ধারণ করো। তবে আজকাল তো নানারকম ভেজাল বেরিয়েছে, খেয়াল রেখো, রত্নটি যেন খাঁটি হয়।

কলকাতায় বাল্যবন্ধু অম্বুজ আছে। তাঁকে বলে দিয়েছেন, দাম যতই লাগুক, একটি খাঁটি পলা যেন পাঠিয়ে দেয়। আশা করছেন, যে কোনো দিনই চলে আসবে। এই সত্তর বছরের জীবনে খারাপ সময় ঘুরে ফিরেই এসেছে। কখনো-কখনো এও মনে হয়েছে, আর বোধহয় সামাল দেওয়া গেল না। কিন্তু এ রকম কখনো হয়নি। এক অদ্ভুত অস্বস্তি, এক অদ্ভুত অস্থিরতা। যেমন আজ, চিরকালই জরুরি কোনো কাজ না থাকলে তিনি রাত ন-টার মধ্যেই শুয়ে পড়েন, আজও তাই শুয়েছিলেন। কিন্তু বারোটা নাগাদ ঘুমটা যে ভেঙে গেল, আর ঘুম আসার কোনো লক্ষণই নেই। আর এ রকম সময় গোটা চিন্তায় ভিড় করে আসে যত সব আজেবাজে অশুভ জিনিস। কেমন একটা লাগে। পরিচিত অনেকের কাছে শুনেছেন, এরকম হলে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে মনে প্রশান্তি আসে। প্রথম প্রথম চেষ্টাও করেছিলেন, ভগবদ্‌গীতা খুলে বসেছিলেন। মাথায় অশুভ চিন্তা থাকায় ফল হল বিপরীত, নিজেকে কৌরব মনে হতে লাগল। আর এ বয়সে নতুন করে কিছু হয় না কি। সারা জীবন তো ধর্মকর্ম নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাননি। ঈশ্বরে বিশ্বাস অটুট রেখেই তিনি বুঝেছেন, ওই সব ঠাকুর দেবতা কোনো ব্যাপার না, যা করার মানুষকে তার নিজের ক্ষমতাতেই করতে হয়। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে দু ধরনের লোক ; এক যারা দুর্বল প্রকৃতির, আর যারা ধর্ম নিয়ে পয়সা করার চেষ্টা করে। তিনি নিজেকে এই দুই দলের কোনো দলের মধ্যেই ফেলতে চান না।

অশান্তির একটা কারণ অনন্তমাস্টার। লোকটা এ রকম দুম করে আত্মহত্যা করে বসবে, এটা তিনি ভাবেননি। তিনি জানেন, মুখে কিছু না বললেও গোটা টাউনের লোক তাঁকেই দায়ী করছে। কিন্তু এই নিয়ে মাথা খারাপ করার লোক তিনি নন। অনন্তমাস্টারের ব্যাপারে তিনি অন্যায় করেছেন, এটাও মনে করেন না। ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি সবার জন্য এক হতে পারে না। রাজা আর প্রজা উভয়ের মাপকাঠি যদি এক হয়, তবে দুনিয়াতে সব কিছু অচল হয়ে যাবে। এক ঘর ছাত্রের সামনে অনন্ত মাস্টার তাঁকে অপমান করল। তিনি মুখ বুজে মেনে নেবেন? তারপর দিন থেকে এই টাউনে মুখ দেখাবেন কী করে? রিকশওয়ালা থেকে বাড়ির মেয়ে বউয়েরা বলে বেড়াবে, দিয়েছে অনন্তমাস্টার বুড়োর থোতা মুখ ভোঁতা করে, আর তিনি এই টাউনের দশ বছরের চেয়ারম্যান হাসি মুখে ঘুরে বেড়াবেন? কী অসুবিধা ছিল অনন্তমাস্টারের, একবার ক্ষমা চেয়ে নিতে? তিনি তো প্রতিহিংসাপরায়ণ নন। বরং ভুল হয়ে গেছে বলে কেউ একটু কেঁদে পড়লে চিরকাল তাঁর রাগ গলে জল হয়ে যায়। তিনিও তো জানেন

অনন্তমাস্টারকে, লোকটার কথাবার্তা একটু খারাপ, কিন্তু মানুষটা সৎ। সে-রাস্তায় অনন্তমাস্টার গেল না, উল্টে ছেলে খেপাতে শুরু করল। শিক্ষিত লোক এই সামান্য কথাটা বুঝল না, ওপরে থাকা একটা মানুষ মাথা নীচু করলে তা গোটা পৃথিবীর নজরে পড়ে, কিন্তু নীচে যারা আছে তাদের মাথা উঠল কি নামল, সে দিকে কেউ খেয়াল করে না। আর শত হলেও তিনি তো বয়সে অনন্তমাস্টারের পিতৃতুল্য, একবার ক্ষমা চাইলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত? ঈশ্বর জানেন, তিনি অনন্তমাস্টারকে চাকরি থেকে তাড়াতে চাননি। ভেবেছিলেন, সাসপেনশন নোটিশটা দিলে ক্ষমা চেয়ে চিঠি দেবে। উল্টে এমন এক উত্তর দিল, যা পড়ে যে কোনো মানুষের মাথায় রক্ত উঠে যাবে। আর্থিক অনটনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, এ খবরটা পেয়েছিলেন। কী হত একবার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলতে, স্যার, ভুল হয়ে গেছে। যত রগচটা বাউন্ডুলে ছোঁড়া সব, স্ত্রী-সন্তান সমাজ কারুর পরোয়া নেই। ছি!

সুধাময়ী বিলাপ করছিল, পরিবারের অভিশাপ, আত্মা শান্তি পাবে না—এ সব বলে। ধমক দিয়ে সে-বিলাপ বন্ধ করেছিলেন তিনি। ওই সব আত্মাফাত্মা তাঁর দেখা আছে, আর অন্যের অভিশাপের কথা ভাবলে রাজধর্ম পালন করা যায় না। কিন্তু অনন্তমাস্টার একটা ধাক্কা দিয়ে গেছে। লোকটা কেন বিষ খেতে গেল? প্রায় উল্টোদিকেই বাড়িটা। বাচ্চা মেয়েটা দাদু-দাদু বলে চলেও আসত তাঁর কাছে। খেলত তাঁর নাতি-নাতনিদের সঙ্গে। এখন বাড়িটা ভূতের বাড়ির মতো খাঁ খাঁ করে। বাচ্চা মেয়েটার কথা ভেবে তাঁর কান্না পাচ্ছে। অপার বিস্ময় নিয়ে নিত্যগোপাল দেখলেন, তিনি কাঁদছেন। মনে হল, সুধাময়ীকে ঘুম থেকে তুলে তার কোলে মাথা রেখে একটু কাঁদেন। না তা তিনি পারবেন না, তাই অনভ্যস্ত চোখে জ্বালা ধরানো জল নিয়ে বসে রইলেন চুপচাপ।

এখনো এই দেশ শিশুকাল থেকে শেখানো হয় : পাপ, পুণ্য, কর্মফল। তিনিও শিখেছিলেন। কিন্তু জীবনের পথে চলতে চলতে বুঝেছেন—শিশুকালের এই শিক্ষা অসম্পূর্ণ। পাপপুণ্যের কোনো সাধারণ সংজ্ঞাই নেই। বাঘ হরিণ শিকার করে পেট ভরাতে। হরিণের কাছে যা পাপ, বাঘের কাছে তাই-ই নৈমিত্তিক প্রয়োজন। দুর্বল আর শক্তিমান, দুজনের কাছে পাপপুণ্যের ভিত্তি এক নয়। তিনি নিজে শক্তিমান, কাজেই পাঁচজন কী বলল তা ভেবে তিনি কাজ করেন না। এই যে তার এত জমিজিরেত, অনেকটাই পেয়েছেন পৈত্রিক সূত্রে, কিন্তু যা পেয়েছেন, তার থেকে বেশি তিনি নিজে অর্জন করেছেন। কী করবেন তিনি? হাজার বছর ধরে এ দেশে জমি চলেছে লাঠির কথা শুনে। বসুন্ধরা বীরভোগ্যা, শাস্ত্র এ ঘোষণা করেছে কোনো অনুযোগ ছাড়াই। আজ যদি তাঁকে হিসেব করতে

বলা হয়—তাঁর লোকজনের হাতে ক-টা মেয়েছেলে বিধবা হয়েছে। এর একটাই উত্তর, যা করেছি বেশ করেছি। আর তা না হলে এনামেলের থালা নিয়ে সপরিবারে চামুণ্ডা মন্দিরের বাইরে ভিক্ষে করতে হয়। তবে মানুষ মারা তার কাজ না। এ ব্যাপারে বিবেকের কাছে তিনি পরিষ্কার। যে বড়ো, তার মাথা সবার ওপরে থাকবে। সেখানে কেউ যদি টক্কর মারতে চায়, তবে পাল্টা মারে সে মাথা ভেঙে দেওয়াটা বলবানের ধর্ম। কিন্তু দুর্বল যে সে যদি এসে কেঁদে পড়ে তবে তাকে রক্ষা করাটাও তার কাজ। সে কাজটা সারা জীবন করেছেন বলেই, এই টাউন আর আশপাশের দশটা গ্রামের লোকেরা এখনো তাঁকে মান্য করে। তবে হ্যাঁ, যাদের উপকার করেছেন, তারা সবাই তা মনে রেখে সারা জীবন অনুগত থেকেছে, তাও নয়। তবে এ সব গায়ে মাখলে চলে না। এ সব দুর্বলের হীনম্মন্যতা, তিনি গ্রাহ্য করেন না।

কর্মফলে তাঁর কোনোদিনই আস্থা নেই। এ জন্মে পাপ করলে পরজন্মে শাস্তি হবে। এ সবই দুর্বলকে দেওয়া সবলের স্তোকবাক্য। কে দেখতে আসবে, পাপী পরজন্মে শাস্তি পেল কিনা? সব ছেলেভুলানো কথা। কিন্তু তিনি নিয়তি মানেন। আর যত বয়স হচ্ছে, তত চারিদিকে নিয়তির উপস্থিতি টের পাচ্ছেন। কেন জানি ধারণা হচ্ছে, নিয়তি নিজের হিসেবে ন্যায়-অন্যায়ের একটা বিচার করে। শীতের এই মধ্যরাতে নিজের সাথে মিথ্যাচার অর্থহীন—তিনি পাপ করেছেন।

উমাপতির ছোটো ছেলেটা, নাম বোধহয় অপূর্ব, সবাই ডাকে অপু, বেয়াদপি করেছিল। তাঁর চেয়ারম্যানের চেম্বারে দলবল নিয়ে ঢুকে সে কী হম্বিতম্বি! তিনি ঠিকই করেছিলেন, এমন শিক্ষা দেবেন যে ছোঁড়া সারা জীবন মনে রাখবে। আর মনে রাখবে পালের গোদা অনন্তমাস্টার। কিন্তু ভাঙা ব্রিজের প্রসঙ্গ তোলা মাত্র তিনি চমকে উঠেছিলেন। প্রথমত, ছেলেটা জানল কী করে? নিশ্চয়ই তার হাতে গোনা দু-চারজন নিজের লোকের মধ্যে কেউ বেইমানি করেছে। কিন্তু পর মুহূর্তে তাঁকে আচ্ছন্ন করল ভয়। জীবনে তিনি এত ভয় কখনো পাননি। ভয়ে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া মানে কী, তা তিনি প্রথম বুঝেছিলেন। তিনি যে ভয় পেয়েছেন, আর কেউ না বুঝুক, ছেলেটা বুঝেছিল। সে-যাত্রায় পুলিশ এসে রেহাই দিয়েছিল। তারপর ঘরে অন্য একটা ভিড়, সে ভিড় খালি হচ্ছে না। তাঁর চারিপাশে অনেক মানুষ, কিন্তু তিনি কিছু দেখছেন না, তার ভেতর থেকে কেউ একজন বলে যাচ্ছে, 'ভয়ঙ্কর বিপদ, কিন্তু মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে'। শুধু একটাই প্রশ্ন, ছেলেটা নিজে, নাকি পেছনে অন্য কেউ?

অনেকক্ষণ পরে ভিড়টাকে খালি করে ঠান্ডা মাথায় ব্যাপারটা ভাববার চেষ্টা

করলেন। ছেলেটার কথাগুলো এখনো কানে বাজছে। '....আর শুধু দু-একটা কাগজ আসা বাকি। বড়ো ঘড়ির মোড়ে মিটিং করে গোটা টাউনকে জানাব নিত্য ঘোষালের আসল চেহারা'। এখনো তাহলে সব কিছু পায়নি। নিজেরই হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে, অমূল্য আজকাল কাগজপত্র মনে করে গুছিয়ে রাখতে পারে না বলে ফাইলটা অফিসে বিল্বর হেফাজতে রেখেছিলেন। বিল্ব এই অফিসের হেডক্লার্ক, রিটায়ার করার বয়স হয়ে গেছে অনেক দিন, এক্সটেনশন দিয়ে রেখে দিয়েছেন। এই মিউনিসিপ্যালিটি চালাতে গিয়ে তাঁর যা সমস্যা তার সব কিছুর মুশকিল আসান বিল্ব। বিল্বকে তিনি নিজের ছায়ার থেকে বেশি বিশ্বাস করেন। তিনি নিশ্চিত সব কথাই বিল্বর কানে এতক্ষণে চলে গেছে। ডেকে পাঠানো মাত্র বিল্ব হাজির, যেন এই ডাকের অপেক্ষায় ছিল।

—ভুপেনকে বলে দাও, এখন যেন কাউকে ঘরে আসতে না দেয়।

—বলে দিয়েছি।

এর জন্যই বিল্বর ওপর তাঁর এতটা ভরসা, বিল্বকে সব কথা বলতে হয় না। ঘরে কেউ নেই তাও গলাটা নামিয়ে বললেন,

—টেন্ডারের ফাইলটা বার করে দাও।

কোন টেন্ডার, তা বিল্বকে বলার দরকার নেই।

—বাবু, আপনি চেয়ারটা একটু সরিয়ে বসুন। আপনার পেছনের আলমারিতে সাবধানে রেখে দিয়েছি, বার করে দিচ্ছি।

এই অফিসের সবাই তাঁকে স্যার বলে, একমাত্র বিল্বই তাঁকে 'বাবু' বলে, বারবার বলেও এই ডাক ছাড়াতে পারেননি। যাক, এখন তাঁর একটু ধাতস্থ লাগছে। কিন্তু ছেলেটার চোখের চাউনি ভুলতে পারছেন না। কিন্তু কী হল, এখনো ফাইল বার করতে পারল না?

—কী হল?

—এই বার করছি।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। এবার তিনি উঠে দাঁড়ালেন। পাগলের মতো বিল্ব দু হাত দিয়ে আলমারিটা ঘাঁটছে। তিনি জানেন একটা ছোটো কাগজের টুকরোও বিল্ব হারায় না। বিল্বর চেহারা দেখে তাঁর ভয় করছে। তার এতদিনকার রাজনৈতিক জীবন, শেষ হয়ে যাবে? তাঁর প্রভাব, প্রতিপত্তি, সব শেষ? আর রাজনীতি কেন, ব্যক্তিগত জীবন, তাঁর ছেলে-মেয়েরা, তাদের শ্বশুরবাড়ি, নাতি-নাতনিগুলো বড়ো হয়েছে। সবার চোখে নিত্যগোপাল ঘোষাল চোর হয়ে যাবে। আত্মহত্যা করা ছাড়া কোনো রাস্তা আর খোলা নেই। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে

থাকতেও যেন তাঁর কষ্ট হচ্ছে। শরীরের সব শক্তি জড়ো করে তিনি শুধু জিজ্ঞাসা করতে পারলেন,

—বিল্ব কী হল?

বিল্ব তাঁর দিকে ফিরে তাকাল। বিল্বকে এই চেহারায় কখনো দেখেননি। বিল্ব জানে, এই ফাইল না পাবার মানে কী? বিল্ব সব কিছু জানে। আতঙ্কের স্বরে বলল,

—বাবু, পাচ্ছি না।

—মনে করে দ্যাখো, এখানেই রেখেছিলে?

—এখানেই ছিল, কেউ নিয়ে গেছে।

কথাটা তাঁর মাথার ভেতরে যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটাল। তারপর কী হল খেয়াল নেই। এইটুকু মনে আছে, বিল্বের মুখটা ছিল ঘামে ভেজা।

এক মুহূর্তের মধ্যে সম্বিত ফিরে এসেছিল, কিন্তু ততক্ষণ যা হবার হয়ে গেছে। বিল্বর মুখে কোনো বিকৃতি ছিল না, শুধু ঠোঁটটা থরথর করে কাঁপছিল। তিনি নিজেও বিশ্বাস করতে পারছেন না। অসহায়ের মতো নিজের হাতের দিকে তাকালেন। তিনি ষাটোর্ধ্ব বিল্বকে, যাকে নিজের ছায়ার মতো বিশ্বাস করেন, একটা থাপ্পড় মেরেছেন। কয়েক মুহূর্তের নীরবতার পর শুধু বলেছিলেন,

—বাবা, এই বৃদ্ধকে ক্ষমা কোরো।

বিল্বই তাঁকে ধরে ধরে দোতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়েছিল। চশমার কাচ, বৃদ্ধ চোখ আর জল, মিলেমিশে তিনি কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না।

গোটা টাউন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে প্রেতপুরীর মতো। একটাও দোকান খোলা নেই, রাস্তায় কোনো লোকও নেই, খাঁ খাঁ করছে রিকশস্ট্যান্ড। টাউনে অঘোষিত হরতাল, হরতাল নিত্য ঘোষালের বিরুদ্ধে। তিনি গোটা রাস্তা হেঁটে ফিরেছিলেন, সঙ্গে বিল্ব। বাইরে একটা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। অসহায় বিহ্বল অবস্থাটা তিনি আস্তে আস্তে কাটিয়ে উঠছিলেন, কিন্তু ভেতরে ঝড়টা চলছিল। তিনি সিদ্ধান্ত তখনই নিয়েছিলেন, যেভাবেই হোক আত্মরক্ষা করতে হবে, যেভাবেই হোক।

সেই রাতেই কালুকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কাজটা শুনে কালু বলেছিল, কঠিন কাজ, সময় লাগবে। কিন্তু টাকার যে পরিমাণ বলছিল কালু, তাতে তিনি চমকে উঠেছিলেন। প্রথমে ইচ্ছে হয়েছিল ঘাড় ধরে কালুকে ঘর থেকে বার করে দেবেন। কিন্তু চোট খাওয়া বুড়ো শেয়ালের মতো বুঝেছিলেন, এটা তাঁর রাগ দেখানোর সময় নয়। এই প্রাক্তন হেড কনস্টেবলই তার কাজটা করতে পারবে, এ কাজ করার লোক একমাত্র কালুমাস্টারের হাতেই আছে।

উমাপতি সৎ পরিশ্রমী মানুষ, কষ্ট করে সন্তানদের মানুষ করেছে। কিন্তু চোখে পড়ার মতো হয়েছে এই ছোটো ছেলেটা। টাউনের মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে লম্বা, শুনেছেন চমৎকার ফুটবল খেলে, লেখাপড়ায়ও ভালো। গত বছরই টাউনের টিম নিয়ে মোহনপুরে কী একটা টুর্নামেন্ট জিতে দলবল নিয়ে তাঁর কাছে এসেছিল, কাপ দেখাতে। কী সুন্দর দেখতে ছেলেটা! তাঁর একটা ছেলেও যদি এ রকম হত! বাবা, এ কাজ করার মতিভ্রম কেন হল তোর? ক্ষমতার ন্যায়নীতি আর সাধারণের ন্যায়নীতি এক না। তিনি তো ক্ষমতার অলিন্দে চুনোপুঁটি মাত্র, যাঁদের নাম গোটা দেশের মানুষ জানে, তাঁদের কীর্তি শুনলে কী করবি? এখন তো একটা রাস্তাই খোলা রইল। ক্ষমতাবান মাত্র ক্ষত্রিয়, যুদ্ধে ন্যায়-অন্যায় বলে কিছু নেই।

কিন্তু মনটা এতটাই বিক্ষিপ্ত হয়ে রইল, কিছুই ভালো লাগছিল না। একবার ভাবলেন, বিমলার কাছে যাবেন। কিন্তু কী ভেবে গেলেন না। অশক্ত শরীরে ওসব ভালো লাগে না। আর কেন জানি, আজকাল সন্দেহ হয়, তাঁর অক্ষমতা নিয়ে বিমলা আড়ালে হাসাহাসি করে।

মাস দেড়েক বাদে বহু রাতে কালু এসে টাকা নিয়ে গেল। বলল, ঠিকঠাক হয়ে গেছে। কালু চলে যাবার পর তাঁর শরীরটা কেমন খারাপ লাগতে লাগল। দরদর করে ঘামছেন, বুকে একটা চাপ ধরা ভাব, যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। সুধাময়ীর চ্যাঁচামেচিতে বাড়ির লোকজন জড়ো হয়ে গেল, তারপর স্বদেশ এসে কী একটা ইনজেকশন দেওয়াতে স্বস্তি ফিরল, ঘুমটাও এল। পরের দিন সকালে স্বদেশই বলল, একটা মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। তিনি অবশ্য জানেন, ওসব অ্যাটাকফ্যাটাক না, বহুদূরে পৃথিবী থেকে অনেক উঁচুতে এক নিষ্ঠুর দেবীর ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছেন তিনি। এতটা সহ্য হয়নি তেনারও।

উমাপতি কেঁদে পায়ে পড়েছিল,

—নিত্যদা, ক্ষমা করে দিন। আপনার তো কলকাতায় সব জানাশোনা। পুলিশের কর্তাদের একটু বলে ছেলেটাকে খুঁজে এনে দিন। এই বুড়োটার কথা ছেড়ে দিন, তা না-হলে ওর মাকে আমি বাঁচাতে পারব না।

নিজের অভিনয় ক্ষমতায় তিনি নিজেই বিস্মিত হলেন, উমাপতিকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন,

—ছি ছি উমাপতি, তুমি আমাকে এতটা পাষণ্ড ভাবলে! আরে, আমিও তো সন্তানের পিতা। তুমি বাড়ি যাও, অপুর মার কাছে থাকো—আমি কলকাতার

ব্যাপারটা দেখছি। এক মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো, তিনি যেন ছেলেকে ফিরিয়ে দেন।

উমাপতিকে ফেরাতে পারলেন, কিন্তু ছেলেটাকে? গোটা ভিড় থেকে ছেলেটার মাথা একহাত উঁচুতে, আর সেখান থেকে ছেলেটা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। তাঁর ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছে। তিনি কোথায় পালাবেন? জেগে, ঘুমিয়ে—কখনো তার রেহাই নেই। তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না। তিনি জানেন, ঘুম আর আসবে না। পাথরের মূর্তির মতো বসে রইলেন। এ এক ভয়ঙ্কর রাত। এখানে বসেই বোঝা যাচ্ছে, বাইরেটা কতটা হিমশীতল। বিশ্ব চরাচরে কোনো আওয়াজ নেই, কোনো প্রাণের আভাস নেই। এই কি মৃত্যুর পূর্বাভাস?

কিন্তু না, বাইরে কিসের একটা আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। বাড়ছে আওয়াজটা, একটা গণ্ডগোল হচ্ছে। এত রাতে কী হতে পারে? না, দেখতে হচ্ছে। শালটা জড়িয়ে বাইরে বারান্দায় বেরোতে ঝাঁপিয়ে পড়ল একটা ঠান্ডা হাওয়া। বাড়ির উল্টোদিকে কয়েকটা লোক, আর রাস্তার ওপর একটা রিকশ। উল্টোদিকের দিদিমণির ঘরের দরজাটা খোলা, সেই আলোতে মনে হচ্ছে, কে যেন একটা সিঁড়ির ওপর শুয়ে। ভিড়টার মধ্যে তাঁর দারোয়ানকে চিনতে পারলেন। ওপর থেকেই জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে রে লখন।

কাঁপাকাঁপা গলায় উত্তর এল,

—বাবু, ভূত।

## ॥ আট ॥

আজ বোধহয় রাতটা একটু বেশিই হয়ে গেল। এমনিতেই ঠান্ডায় হাত-পা চলতে চায় না। তার ওপর, বাবা রে বাবা, শীতটাও পড়েছে। গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে রাখা কোনোদিনই ধাতে নেই। সংসারে হাজারটা কাজ : এই কলতলায় যাও, এই উনুনের পাশে দাঁড়াও। কাজ করব, না চাদর সামলাব? তার থেকে গায়ের আঁচলই ভালো। কিন্তু একটা দিন চাদরেও ঠান্ডা বশ মানছে না। এমনিতে রাতের কাজকর্ম বউমাই দেখত। বুড়োমানুষকে এইটুকু রেহাই দিয়েছিল। কিন্তু ন মাসের পোয়াতি বউকে একটু বিশ্রাম তো দিতেই হয়। একটা দিন তাই নিজেকেই টানতে হচ্ছে। বড়ো নাতিটা হবার সময় বউমা মাস ছয়েক বাপের বাড়িতে গিয়ে ছিল। কিন্তু গত বছরে বেয়ান ঠাকরুন গত হয়েছেন, কে আর সেখানে দেখাশোনা করে, তাই এ বাড়িতেই আছে। তবে আগে থেকেই বলে দিয়েছেন, বাড়িতে বাচ্চাকাচ্চা হবার ঝামেলা করা যাবে না। যা হবে হাসপাতালেই হবে। এ তো আর বউমার বাপের বাড়ির মতো পাড়াগাঁ নয়, এটা টাউন, এত বড়ো হাসপাতাল।

আর একটু আগেই হয়ে যেত, শেষবেলায় মনে পড়ল নাতিটা ক-দিন পিঠে খাবে বলে বায়না করছে। সুকুর বাবা দুদিন আগে নতুন গুড় নিয়ে এসেছে। চালটা ভিজিয়ে রেখে এলাম। হারুর মা বলছিল, পাটিসাপটা নাকি সেদ্ধ চালেই ভালো হয়। না বাপু, তিনকাল এসে এককালে ঠেকল, বাপের জন্মে কখনো শুনিনি পিঠেপুলি আতপ চাল ছাড়া হয়। ভালো নতুন চাল ছিল তাই খানকতক ভিজিয়ে রেখে এলাম, নারকোল বাড়িতেই আছে। তাও তো এখন এই সব একটু-আধটু করতে পারছি, ক-টা বছর যা যাচ্ছে। নেহাত দোকানদারের বাড়ি বলে দু বেলার চালটুকু জোগাড় হয়েছে, নিজের দোকান থেকে সুকুর বাবাকে চাল আনতে হয়েছে লুকিয়ে, মাঝে যাতে লুটপাট না হয়ে যায়। ঠিকে কাজের

মেয়েটা বলছিল, মাসের পর মাস ভাতের মুখ পর্যন্ত দেখেনি, ছাইভস্ম, যা পেয়েছে, তাই খেয়ে থেকেছে।

ঘরেরও দু-একটা টুকিটাকি কাজ পড়ে থাকে। বছর দুয়েক হল ইলেকট্রিকের আলো এসেছে, তাও একটু বাঁচোয়া। খাটের এক কোণে লেপে নাক-মুখ মুড়ি দিয়ে সুকুর বাবা ঘুমোচ্ছে। বাবা! যত শীত হোক, নাকেমুখে মুড়ি দিতে পারি না, দম বন্ধ হয়ে আসে। এমনকী কেউ একটা নাকে মুখে মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে দেখলেও কেমন জানি অস্বস্তি হয়। আর এই বুড়োর কাণ্ড দ্যাখো? পইপই করে বলেছি, এ ভাবে শুলে ঘুমের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে যায়। কে কার কথা শোনে, উল্টো-পাল্টা ধমক, এসেছে আমার বড়ো ডাক্তার।

না বাবা, এ সব করতে দেওয়া যাবে না। আস্তে আস্তে গিয়ে লেপটা মুখের থেকে সরিয়ে দিলাম। কপাল ভালো, ঘুমটা ভাঙেনি। তার নিজের ঘুম চিরকালই পাতলা, কিন্তু বয়সের জন্যই বোধহয় বারবার আজকাল ঘুমটা ভাঙে। আর যতবার ঘুমটা ভাঙে, এটা প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, একবার উঠে মানুষটাকে দেখে নেওয়া। কেমন যেন অসহায়ের মতো ঘুমোয়, তবে কেমন ভোঁসভোঁস করে নাক দিয়ে আওয়াজ করে। ওই আওয়াজটা কানে গেলে নিশ্চিন্ত। শত হলেও বয়সটা তো সত্তর হয়ে গেল। তবে মা রক্ষাকালীর কৃপা, মানুষটা খুব একটা অসুখবিসুখে ভোগে না। সব স্ত্রীর মতো সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে ওপারে যাওয়ার জন্যই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। ছেলেময়ে যতই থাক, সংসারে বুড়ি বিধবার দাম কত তা জানা আছে।

আর এই বুড়ো মানুষটাকে ছাড়া কী ভাবে বাঁচা যায়, তা-ই তো জানা নেই। সেই কবে এ বাড়িতে বউ হয়ে ঢুকেছিলাম! তার আগেও একটা জীবন ছিল, একটা বাপের বাড়ি ছিল, ছিল একটা ছোটোবেলা, সে সব যেন ঝাপসা হয়ে গেছে। বাবা ছিলেন শৌখিন মানুষ, সখ করে ছোটো মেয়ের নাম দিয়েছিলেন অমরাবতী। এ বাড়িতে এসে শুনলাম, আমার নামের প্রথম তিন অক্ষর নাকি কোনো দূঃসম্পর্কের খুড়শ্বশুরের নাম। শাশুড়ি তাই নাম দিলেন সরমা। ওই নামেই চলছিল। সুকুর বাবা অবশ্য আড়ালে অন্য নামে ডাকত, সে সব ভাবলে এ বয়সেও লজ্জা করে। তাদের সময় এখানকার মতো আদিখ্যেতা ছিল না। তারপর অবশ্য সুকু হবার পর মুখে মুখে সবার কাছে হয়ে গেলাম সুকুর মা। এমনকী কত্তার কাছেও। তবে এখনো কেউ নাম জানতে চাইলে বলি সরমা।

ছাড়া জামাকাপড় আলনার ওপর ডাঁই করে রাখা, কতক্ষণই-বা লাগবে ওগুলো গুছিয়ে রাখতে। ঘর আগোছালো হয়ে আছে দেখলে সহ্য হয় না।

বাড়ির সবাই বাতিক বলে গালাগাল দেয়, এই গালাগাল গা-সওয়া হয়ে গেছে। টেবিলে সুকুর বাবার কাশির ওষুধের শিশিটার ঢাকনাটা আলগা করে লাগানো, সেটা ঠিক করে রাখতে রাখতে নজর পড়ে গেল ছবিটার দিকে। তার তিন ছেলে আর এক মেয়ের ছবি। সুকু, সুরো, সুবোধ তিন ছেলে আর মেয়ে লতা। কে যেন একবার বাড়িতে এসে ছবিটা তুলে দিয়েছিল। ছবিটা ভালো না, স্পষ্ট করে মুখগুলো বোঝা যায় না। কিন্তু এই ছবিটাই থাকে। সুরোর ভালো একটা ছবি আছে, সেটা আছে তার ট্রাংকে শাড়িগুলোর নীচে। বারবার বলেছিলাম, ছবিটা বাঁধিয়ে এনে বাইরের ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখো। কেউই কিছু বলে না, তারপর জোরাজোরি করতে সুকু বলল, 'না, ওই ছবি টাঙানো যাবে না। পুলিশের নজর পড়ে যাবে, তা-হলে সুবোধের চাকরিবাকরি আর কোনোদিন হবে না।'

কী বলব! হ্যাঁ রে, পুলিশের ভয়ে নিজের ভাইয়ের ছবিটা পর্যন্ত টাঙাবি না? আর যে মানুষটার ওপর সবচেয়ে বেশি ভরসা ছিল, সেই সুকুর বাবা পর্যন্ত চুপ করে বসে রইল, একটা আপত্তি পর্যন্ত করল না! বাড়িতে পুলিশ তো একবারই এসেছিল, আর তো আসেনি। অনেক কান্নাকাটি, অনেক অনুরোধ উপরোধেও কারো মন গলল না। মনে মনে সুকুর বাবাকেই গাল দিয়েছি। দোকানদার তো, পয়সার লাভক্ষতি ছাড়া কিছু বোঝে না, পাষাণ—সব পাষাণ।

পরে অবশ্য ভেবেছি, ঠিকই আছে। কী দরকার মরা লোকের মতো সুরোর ছবি দেওয়ালে টাঙিয়ে? তা হলে তো মেনে নিতে হয়, সুরো নেই। বললেই মানতে হবে? কে দেখেছে? তার জলজ্যান্ত ছেলেটা দু দিন আগে পায়ের ধুলো নিয়ে, মা আসি, বলে চলে গেল। পুলিশ এসে যখন বলল, পুলিশের সাথে ওই কি যেন বলে, এনকাউন্টারে সুরো মারা গেছে। কথাটার মানেই বুঝতে পারিনি। কান্নাকাটির রোল পড়ে গিয়েছিল বাড়িতে, নিজেও কাঁদছিলাম, বুঝছিলাম কিছু একটা সর্বনাশ হয়ে গেছে। কিন্তু নিজের ছেলে—সে নেই, আর কোনো দিন সুরো আসবে না। না, সঙ্গে সঙ্গে কথাটা বিশ্বাস হয়নি। সারা জীবনে যে লোকটাকে জেনেছি বিপদে আপদে সবচেয়ে বড়ো ভরসা, সেই সুরোর বাবা উঠোনের মাঝখানে মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল। ছুটে গিয়ে পাশে বসে বলেছিলাম,

—হ্যাঁ গো, তুমি একবার কলকাতায় গিয়ে দেখে এসো।

তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে অত বড়ো মানুষটা বুক চাপড়ে কেঁদে উঠল,

—বাবা, তুই আমার এ কী সর্বনাশ করলি!

সুকুকে নিয়ে বড়ো নন্দাই কলকাতায় গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে কিছু পায়নি। পুলিশ শুধু কিছু কাগজ দিয়েছিল। সাত দিনে লাশ নাকি পচে ফুলে উঠেছিল, তাই কোর্টের অর্ডার নিয়ে পুলিশ সৎকার করে দিয়েছে। শিয়ালদার কাছে সুরো যে মেসে থাকত, সেখানে গিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিল। মেসের লোকেরা বলেছিল, সুরো নাকি পার্টি-পলিটিক্স করছিল। আজও বুঝে উঠতে পারলাম না, আকাল চলছিল ঠিকই, কিন্তু সুরোর তো কোনো ভাতের অভাব ছিল না—তা হলে সুরো কেন খাবার চেয়ে মিছিল করতে গিয়েছিল?

সুরোটা চিরকালই অন্যদের থেকে আলাদা। এ বাড়িতে লেখাপড়ার চল কোনোদিনই বিশেষ নেই, এ নিয়ে তার নিজেরই দুঃখ। তার বাপের বাড়ি এ রকম ছিল না। বাবা বলত, গোমুক্খু হয়ে থাকাই মানুষের সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ। নিজে কখনো স্কুলে যাইনি, কিন্তু লিখতে পড়তে পারি। নাতিটাকে ছোটোদের রামায়ণ-মহাভারত তো আমিই পড়ে শোনাই। সুকুর বাবাকে অবশ্য দোকানের হিসাবপত্র ছাড়া কিছু পড়তে লিখতে দেখিনি। তার ভাশুরপোরা তো কেউ স্কুলের দরজাই মাড়াল না। নিজের ছেলেমেয়েগুলোকে অন্তত স্কুলে পাঠিয়েছি। তাই নিয়ে বড়ো জা কম কথা শোনায়নি। সুকুটা ম্যাট্রিক ফেল করে পড়াশুনা ছেড়ে দিল, আর লতার তো পড়তে পড়তেই বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু সুরোটার ছোটোবেলা থেকেই লেখাপড়ার মাথাটা পরিষ্কার ছিল। স্কুলের মাস্টারমশাইরাও কত প্রশংসা করত। ম্যাট্রিকে সুরো সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করল। বাড়ির সবাই যখন আনন্দ ফুর্তি করছে, ছেলে তার ঘরে বসে মুখ লুকিয়ে কাঁদছে—ফার্স্ট ডিভিশন পায়নি বলে। ছেলে এরপর গোঁ ধরল কলকাতার কলেজে পড়বে। নিজেও চমকে গিয়েছিলাম, কলেজে পড়ো ঠিক আছে, এখানকার কলেজে পড়ো, কিন্তু কলকাতায় গিয়ে? বাপ তো কিছুতেই রাজি না, এত টাকা কোথা থেকে আসবে। ছেলেও নাছোড়বান্দা। তার এক কথা, প্রথম কয়েক মাসের ব্যবস্থা করে দাও, তারপর ছেলে পড়িয়ে নিজের খরচ জোগাড় করব। কলকাতায় সবাই নাকি তাই করে। নিজে তো মা, কি আর করি, ছেলের হয়ে বাপের কাছে ওকালতি করতে গেলাম। অনেক কষ্টে রাজি করালাম। বোঝালেন—খারাপ কী, যদি কষ্টেসৃষ্টে ছেলেটাকে লেখাপড়া শিখিয়ে একটা ভালো চাকরিতে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। ওই তো ছোটো এক দোকান। তিন ভাই কি এক দোকান নিয়ে লাঠালাঠি করবে। তার থেকে সুকু দোকান দেখুক, সুরো আর সুবোধটা লেখাপড়া শিখে চাকরিবাকরি দেখুক। মুখে কিছু না বললেও, তার কথা ওদের বাবার মনে ধরেছিল।

যাবার আগের দিন রাতে সুরোকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম,

—হ্যাঁ রে, বাপ মা-কে ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে কষ্ট হবে না?

—প্রথম প্রথম কষ্ট হবে, পরে ঠিক হয়ে যাবে।

ছেলেটার এ রকমই কাঠ-কাঠ কথা। রেগে গিয়ে বলেছিলাম,

—তুই কেমন ছেলে রে, বাপ মা-কে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হবে না বলতে তোর মুখেও আটকাল না?

—কেন আটকাবে, বরং এখানে থাকতেই আমার কষ্ট হয়।

—কী বললি, বাপ মা-র সাথে থাকতে তোর কষ্ট হয়?

—ধুত, আমি তা বলিনি। এই জায়গাটা আমার একদম ভালো লাগে না।

—কেন রে, এই জায়গা খারাপ কেন হবে?

—কী বলিস তুই মা। এই টাউনটাকে আমার মনে হয়, একটা কবরখানা। দ্যাখ, সব কেমন ফ্যাকাশে। লোকজন, বাড়িঘর, গাছপালা সব এক রকম। সব কিছু বিচ্ছিরি। তুই না থাকলে অনেক আগে আমি পালিয়ে যেতাম।

—ও, ম্যাট্রিক পাশ করেই তোমার বড়ো বুলি বেড়িয়েছে। বাপ-ঠাকুরদার জায়গা বিচ্ছিরি, আর বাকি সব জায়গা সুন্দর?

—তাই তো, বাকি সব জায়গা সুন্দর। একবার বেরোই আর কোনোদিন এখানে ফিরব না।

কী বলে এ ছেলে! কাঁদো কাঁদো হয়ে জিজ্ঞেস করলাম,

—আর ফিরবি না?

—যা বাবা, আবার কাঁদতে শুবু করলি। ফিরব না কেন, তোর কাছে তো আসবই। তবে একটা কিছু ব্যবস্থা করে তোকেও নিয়ে যাব—তারপর আর ফিরব না।

—আ মোলো,আমার তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, তোমার সাথে সংসার ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে বসত করি।

—তুই কিছু জানিস না মা, দুনিয়া কত সুন্দর। এই মরা টাউনটা ওই ভাঙা ঘড়ি নিয়ে কাদার মধ্যে আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে, আসলে এই জায়গাটা মরে গেছে, চ মা, পালাই।

হঠাৎ চোখ ভেঙে জল আসল। হাতের কাছে ছেলেটাকে একবার ভগবান এনে দিলে জিজ্ঞাসা করতাম, হ্যাঁ রে, আকালের মানুষের পেটে ভাত দিতে না পারলে তোর দুনিয়া সুন্দর হচ্ছিল না?

## ॥ নয় ॥

ট্রাংকটাকে টেনে বার করতে এই শীতের মধ্যে কালঘাম ছুটে গেল। তার বিয়ের সময় বাপের বাড়ি থেকে এসেছিল। পঞ্চাশ বছরের আগের জিনিস, কী ওজন রে বাবা! তার ওপর আওয়াজ না করে বার করতে হবে, কেউ জেগে গেলেই সর্বনাশ। হাজার প্রশ্ন, তার কথা কেউ বুঝবে না।

তার বিয়ের বেনারসি, এই এতখানি জরির পাড়। সুকুর শ্বশুরবাড়ি থেকে বিয়ের সময় নমস্কারি দিয়েছিল, একটা গরদ। ক-টাই-বা তুলে রাখার মতো ভালো শাড়ি আছে? বেশ কয়েক বছর আগে কাবুলিয়ালার কাছ থেকে ঘিয়ে ঘিয়ে একটা ভারী শাল কেনা হয়েছিল। শীতকালে কোনো নেমন্তন্নে যেতে হলে ওটা গায়ে দিই। সবার নীচে ছবিটা, আর তার নীচে কাগজগুলো। পাশ করার পর সুকু ভাইকে নিয়ে গিয়ে ঘড়ির মোড়ের কল্পনা স্টুডিয়ো থেকে তুলে এনেছিল। কী সুন্দর লাগছে তার সুরোকে। যে যাই বলুক, সুরো তার মতো হয়েছিল। মুখ-চোখ নরম সরম। তবে ঢ্যাঙা বাপের বংশের মতো। বাকি দুই ভাইয়ের থেকে ঢ্যাঙা তো বটেই, বাপেরও মাথার ওপর দিয়ে যায়।

কাগজগুলো কোত্থেকে জোগাড় করে এনেছিল সুবোধ। এ বাড়িতে তো খবরের কাগজ আসার চল নেই। বাপ বড়োদাদার চোখ এড়িয়ে মাকে এনে দেখিয়েছিল।

—দ্যাখ, কাগজে সব লিখেছে। কিন্তু মেজদার নাম তো কোথাও নেই?

তারপর থেকে কতবার যে কাগজগুলো তন্নতন্ন করে পড়েছি, প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। না, কোথাও সুরজিৎ সাহার নাম নেই। কোথাও তার সুরোর নাম নেই। কাগজগুলো ভালো ছিল না, ছাপাগুলোও ধ্যাবড়া মতো। আর এখন তো আরো হলদেটে হয়ে গেছে। 'স্বাধীনতা'—আগেও কখনো এই কাগজের নাম শুনিনি। কিন্তু পড়তে পড়তে কেমন দমবন্ধ হয়ে আসে। সুবোধ আবার

কতগুলো জায়গার তলায় পেনসিল দিয়ে দাগ দিয়ে রেখেছে, প্রথমেই চোখ পরে যায় সেখানেই,

**ওই ... রাত্রের গভীর অন্ধকারে মৃতদেহ ও পুলিশ কর্তৃক দাহকার্য**

তার সুরোকেও নাকি তাই করেছে।

*... মুখ্যমন্ত্রী গতকাল সাংবাদিকদের জানান তার মতে সাম্প্রতিক গুলিবর্ষণ ও লাঠিচার্জে পশ্চিমবঙ্গে মোট ৩৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে।*

*... দীপক বলছিল, -না, না, আমার আর কিছু মনে নেই ...... কিছু না ... শুধু চারদিক থেকে গুলি ছোড়ার আওয়াজ ... কালো কালো ভূতের মতো লোকগুলো ... তাগ করে গুলি ছুড়তে ছুড়তে এগোল। দাদু রিকশ থেকে গড়িয়ে পড়ে গেলেন। বলতে বলতে ছেলেটা তার মাকে জড়িয়ে ধরতে চাইল।*

*... কর্তার খোঁজ করতে বেরিয়েছিল তাঁদের কারখানার দুজন কর্মচারী রাম সিং আর বলাই সামন্ত। সেটা সেই পয়লা তারিখ। তারপর এ পর্যন্ত তাঁদের আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। না কোনো হাসপাতালে, না পুলিশে কোথাও। আজও ফেরেনি সেই দুজন। কোথায় গেল!*

*... এই কয়দিনে বুলেট ও লাঠিতে নিহত শহিদদের মধ্যে রয়েছেন সুরেন্দ্রনাথ আইন কলেজের ছাত্র বিভূতিভূষণ রায়চৌধুরি, আছেন হাওড়ার ধীরাজ গুহ, সদ্য বি কম পাশ করা যুবক। আছেন ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিক শ্রী অভিমন্যু সাউ, রয়েছেন সুদুর পুরুলিয়ার শহিদ প্রহ্লাদচন্দ্র ব্যানার্জি, লাঠির নির্মম ঘায়ে জীবন দেন।*

*... আমার ছেলে, আমার ছেলে কোথায়? —থেকে থেকে আধা বেহুঁশ অবস্থায় চিৎকার করে উঠছেন পুষ্প। আপনার বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করলে জবাব আসে একটি, অ আমার ছেলে? ওই যে পুলিশ আমাকে মারল, ছেলেটা বুক থেকে পড়ে গেল রাস্তায়। বাড়িতে এক অক্ষম স্বামী। আর চার বছরের পুত্র। কোন এক অখ্যাত সদরপুর গ্রামে বাড়ি। গোপালপুর ইস্টিশনে নেমে যেতে হয়। পাঁচ জনের পরিবার। শ্রীমতী পুষ্পই সংসারে একমাত্র রোজগেরে সদস্য। দমদমের দিকে শাকসবজি বিক্রি করতেন পুষ্প। কখনও একমুঠো জুটত, কোনোদিন বা জুটত না।*

*লাটসাহেবের বাড়ির পুব পাশে লাঠি চলে পুলিশের। সে লাঠি পুষ্পকে নারী বলে রেহাই দেয়নি। পিঠে লাঠি পড়ল পুষ্পর। টিয়ারগ্যাসের ধোঁয়ায় বাচ্চাটা কেঁদে ককিয়ে উঠল, আরো লেপটে গেল মায়ের বুকে। হিংস্র পুলিশ মায়ের পিঠে লাঠি মেরেও তার জিঘাংসা মিটল না। কংগ্রেস সরকারের নির্দেশ অলঙ্ঘনীয়। তাই এবার পুলিশ আঘাত করল পুষ্পর হাতে। বাচ্চাটা ছিটকে পড়ল*

*রাস্তায় মায়ের কোল থেকে। একদল ঝাঁপিয়ে পড়ল পুষ্পের ওপর। সংজ্ঞা হারাল পুষ্প। পুষ্প বাড়ির রাস্তা পেলেন না খুঁজে। কি করে হাওড়ার এক অখ্যাত বস্তিতে হাজির হন পুষ্প তা নিজেও জানেন না, বলতেও পারলেন না। এরপর সাত দিন কেটে গেছে। এখনও পুষ্পের মুখে সেই এক কথা—অ আমার ছেলে কোথায়?*

মাগো আর পড়তে পারি না। কী করে একটা জলজ্যান্ত মানুষকে ওরা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে? যারা মারে, আর যারা মারতে বলে তারাও তো মানুষ। বহু দিন আগে পা পিছলে একবার কলতলায় পড়ে গিয়েছিলাম, আর পড়তে পড়তে মাথাটা ঠুকে গিয়েছিল টিউকলের হ্যান্ডেলে। মাগো, সে কী ভয়ংকর ব্যথা! এখনও স্পষ্ট মনে আছে— ব্যথায় যেন দমটা বন্ধ হয়ে এল, আর দু-চোখে অন্ধকার। মানুষ মারতে হলে নিশ্চই আরো জোরে মারে, বার বার মারে, সারা শরীরে মারে। একবারে মেরে ফেলে, না কি আধমরা করে ফেলে দিয়ে চলে যায়, আস্তে আস্তে ছটফট করতে করতে মরে যায়?

সুরোকেও কি এভাবে মেরেছে? আর ছেলেটা তো সবার চেয়ে ঢ্যাঙা, ওর মাথাতেই তো সবার আগে লাঠির বাড়িটা এসে পড়বে। কিন্তু সুরো কি জেনেশুনেই মিছিলে গিয়েছিল, না কি এমনি রাস্তায় ছিল, ভুল করে মেরে ফেলেছে?

সুরো নাকি পার্টি-পলিটিক্স শুরু করেছিল। কিন্তু সেটা কী রকম? এই তো নিত্যবাবু পলিটিক্স করে, অভয়বাবু পলিটিক্স করে। পাড়ার বিমল, শিবেন এরাও নাকি পলিটিক্স করে। কই এদের পুলিশ মারতে পারে, এ রকম কোনো কথা তো কোনোদিন শুনিনি? স্বদেশির আমলে পুলিশ মারত, কিন্তু এখন কেন মারবে?

বারবার ভেবেছি সুরো কেন এমন করল? মা হয়েও কিচ্ছু বুঝতে পারলাম না? ভাই বা বন্ধুদের কথা বলতে পারব না—কিন্তু বাড়ির মধ্যে যা কথাবার্তা তা তো সে মায়ের সাথেই বলত। প্রথম প্রথম প্রতি হপ্তাতেই বাড়ি আসত। মনে হত, ছেলের চোখ দিয়ে নতুন করে কলকাতা চিনছি। জীবনে বার দুয়েক কলকাতায় গিয়েছি। দু-বারই বিয়ের অনুষ্ঠানে, একবার সেজো বোনপোর, আর-একবার বড়ো ননদের মেয়ের। বাবা, কলকাতার রাস্তার কথা ভাবলে এখনো বুক কাঁপে—গাড়িঘোড়া, বাস-ট্রাম, লোকজন—এই বুঝি সব এসে ঘাড়ে পড়ল। কিন্তু সুরোর কলকাতা অন্য রকম কলকাতা। গঙ্গাপাড়ের বিকেলের ঠান্ডা হাওয়া, গড়ের মাঠের ফুটবল খেলা, কলেজ স্ট্রিটের বইয়ের দোকান, যেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোটা বই পড়ে ফেললেও দোকানি কিচ্ছু বলে না। আর সব গল্পের শেষেই এক কথা, মা তোকে নিয়ে যাব কলকাতা দেখাতে। পরের দিকে

প্রতি হপ্তায় আর আসত না, আর শেষ দিকে তো দু-তিন মাস পর পর একবার আসত। বলেছিলাম, উত্তরে বলত, অনেক কাজ আমার। কী কাজ তোর?

প্রথম প্রথম যখন আসত, কত গল্প। কলকাতা নিয়ে বাবুর গল্প শেষই হয় না। তাকে খেপাত কলকাতার মেয়েদের কথা বলে—তারা কেউ মাথায় ঘোমটা দেয় না, ট্যাক ট্যাক করে ইংরেজিতে কথা বলে, আর সবাই নাকি মেমসাহেবের মতো ফরসা। পাশ করে সে রকমই একটা মেয়ে বিয়ে করে আনবে। বউমা পর্যন্ত মাঝেমাঝে ঠেস দিয়ে কথা শোনাত, ওই তো মেজো ঠাকুরপো কলকাতা থেকে মেমসাহেব বিয়ে করে আনবে, সে-ই সেবাযত্ন করবে। আমি গাঁয়ের মুক্‌খুসুক্‌খু মেয়ে, আমি কি আর এসব পারি? বড়ো চোপা মেয়েটার, বাপের বাড়িতে গুরুজনের সাথে কীভাবে কথাবার্তা বলতে হয়, সে শিক্ষে পায়নি।

সেই ছেলে কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেল। বাড়িতে আসে কয়েকদিনের জন্য, কিন্তু বাড়িতে এলেও সে ছেলের টিকি দেখা যায় না। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়, জিজ্ঞাসা করলে বলে, পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। কারা সব দেখা করতে আসে, টাউনের কেউ না, চাষাভুষো সব। এ রকম কেউ এলে বাইরে গিয়ে কী সব গুজগুজ ফুসফুস করে। একা থাকলে কী সব গান গায় গলা ছেড়ে, বাপের জন্মে এ রকম গান শুনিনি। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম,

—এ সব কী গান গাস?

বলল,

—যুদ্ধের গান, তুই এ সব বুঝবি না মা।

—যুদ্ধ, সে তো কবে শেষ হয়ে গেছে।

—কে বলল যুদ্ধ শেষ হয়েছে, নতুন যুদ্ধ লাগল বলে।

—কী সব অলক্ষুনে কথা বলিস।

—লাগবে, যুদ্ধ লাগবে, কেউ ঠেকাতে পারবে না। আসলে জানিস, মানুষ বড়ো কষ্টে আছে, কতদিন আর মুখ বুজে থাকবে?

কথাগুলো এখন কানে বাজে। সুরো তাকে যতই মুক্‌খু ভাবুক কথাগুলোর মানে বুঝেছিলাম। সুরোর গানে মজুর-কিষানের কথা থাকত, গরিব মানুষের কথা থাকত। সুরো অন্যায় কিছু তো বলেনি। নিজে অবলা মেয়েছেলে, কষ্টে পড়লে ঠাকুরের পায়ে গিয়ে ড়ি। ছেলে আমার বীরপুরুষ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, এ তো কোনো অপরাধ নয়।

নিজের ভিতরটা ছিঁড়েখুঁড়ে যায়—সে দিন যদি সুরোকে আটকাতে পারতাম। আবার পরক্ষণে মনে হয়, কেন আটকাব, কী বলে আটকাব? কী বা

দিতে পেরেছি, কিসের লোভ দেখিয়ে আটকাব? শুধু বেঁচে থাকবি, এই লোভ দেখিয়ে কাউকে ন্যায়ের পথ থেকে ফিরিয়ে আনা যায়? কিন্তু মনকে বোঝাব কী বলে। যাকে নিজের ভেতরে তিলতিল করে বড়ো করেছি, সেই ভয়ংকর প্রসবযন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে জন্মাল যে, সে এভাবে চলে যাবে—মা হয়ে কী করে তা মেনে নেব। কিন্তু ভগবান কি এত নিষ্ঠুর, একবারও তার কথা ভাববে না? তাই মনের কোণে অন্য কথাটা বারবার ফিরে আসে—কেউ তো সুরোকে মরতে দেখেনি? কোনো চেনাশোনা লোক তো সুরোর লাশও দেখেনি। হতেও তো পারে সুরো আসলে মরেনি, পুলিশ অন্য কাউকে সুরো বলে চালিয়েছে। হয়তো সুরোর মাথায় লাঠি মেরেছিল, আর সিনেমাতে যে রকম হয়, সেই রকম সেই আঘাতে সুরোর স্মৃতিভ্রংশ হয়ে গেছে, মনে করতে পারছে না, কোথায় বাড়ি, কে তার বাপ-মা। যে-দিন মনে করতে পারবে সে-দিন ঠিক ছেলে তার ফিরে আসবে। বুড়ো মানুষটাকে বলে কোনো লাভ নেই, কয়েকবার বলেছিও। প্রথম প্রথম বুঝ দেবার চেষ্টা করত, পরে রেগে উঠত, 'আর জ্বালিয়ো না, যে গেছে সে আর আসবে না। যারা রইল তাদের কথা ভাবো।' কাকে বলব? সুবোধটা খুব ছোটো, তা না হলে ওকে নিয়েই একবার চলে যেতাম। যত বড়ো শহর হোক, একবার নিজে খুঁজে আসতাম।

কোনো উপায় না পেয়ে একদিন চলে গিয়েছিলাম বিশুর কাছে। দুপুরবেলায় পুলিশটা যখন থাকে না। বিশুর সাথে কারোর কথা বলা বারণ। তাকে দেখে ছেলেটা ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিল। তাড়াহুড়ো করে বলল,

—মাসিমা, পবনভাই তো নেই, এখন তো ওনার থানার ডিউটি, বিকেল বেলা ফিরবে।

ছেলেটার চোখটা কেমন কটা কটা। বছর খানেক হল পাশের বাড়িতে এসে আছে, কথা হয়নি কোনোদিন।

—না বাছা, আমি তোমার কাছেই এসেছি।

ঘরের দরজাটা বন্ধ করতে করতে জিজ্ঞাসা করল,

—আপনাকে কেউ আসতে দেখেনি তো?

—না বাবা, কেউ দেখেনি। তুমি শুধু একটা কথা বলো, তোমার বাড়ি তো কলকাতার ওদিকেই। তুমি সুরজিত সাহা বলে কাউকে চিনতে? তোমার থেকে অল্প কয়েক বছরের ছোটো হবে। সুরেন্দ্রনাথ কলেজে পড়ত। খুব ঢ্যাঙা, তোমার মতো রাজনীতি করত।

এবার আঁচলের তলা থেকে সুরোর ছবিটা বার করে দেখালাম,

—দ্যাখো তো বাবা, চেনো কি না?

ছেলেটা ছবিটা ভালো করে দেখল,

—আপনার মেজো ছেলে? না মাসিমা, আমি চিনতাম না।

—তা হলে জানলে কী করে আমার মেজোছেলের কথা বলছি?

—মাসিমা, আপনার আর আমার ঘরের মাঝখানে কেবল দুটো দেওয়াল, এখান থেকে আমি সব শুনতে পাই।

—আচ্ছা, তুমি যখন সবই জানো বলো তো, সত্যি কি পুলিশ আমার সুরোকে মেরে ফেলেছে, নাকি অন্য কাউকে আমার সুরো বলে চালিয়ে দিয়েছে?

ছেলেটা অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে বলল,

—আমি সত্যিই জানি না।

—না, সে তুমি জানবে কী করে, তুমি তো এখানে ছিলে। কিন্তু তুমি বলো, এ রকম তো হতেও পারে, পারে কি না?

একটু ইতস্তত করে বলল,

—তা হতে পারে, বড়োসড়ো গন্ডগোল হলে লোকজন নানা দিকে ছিটকে যায়, কিছুই ঠিক থাকে না। পুলিশও যা খুশি বলে দেয়।

এতদিনে আমার কথাটা একজন মেনে নিয়েছে। আর এই বিশু তো ওদিককারই ছেলে। আর রাজনীতি করে। সুকু বা সুকুর বাবার থেকে তো এসব কথা আরো ভালো করে জানে,

—তা হলে তুমিও মানছ, এ রকম হতে পারে। কিন্তু তা হলে বাবা, আটমাস হয়ে গেল সুরো এল না কেন?

ছেলেটা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর গলাটা নামিয়ে বলল

—মাসিমা সত্যি সত্যি যদি তাই হয়, তা হলে তো তার আসা আরো মুশকিল। পুলিশ যাকে মৃত বলে চালিয়েছে, সে যদি জলজ্যান্ত ফিরে আসে তা হলে তো পুলিশ নিজে বেকায়দায় পড়ে যাবে। আপনার ছেলেকে এখন লুকিয়েই থাকতে হবে। পুলিশ যদি জানতে পারে, আপনার ছেলে বেঁচে আছে, তবে ধরতে পারলে খারাপ কিছু করে দেবে।

—দুর্গা দুর্গা, না বাবা সুরোর আসার দরকার নেই। তুমি শুধু একটু বলো, সুরো কি বেঁচে আছে? তুমি তো কলকাতার লোকজন চেনো—অভাগা মায়ের মুখ চেয়ে এই খবরটুকু শুধু এনে দাও। আমি আর কিচ্ছু চাই না।

—মাসিমা, আমি কোথা থেকে খবর এনে দেব? আমার তো এটাই শাস্তি, দুনিয়ার কারোর সঙ্গো আমার কোনো যোগাযোগ নেই। কাউকে আমার কাছে ওরা আসতে দেয় না, আমাকেও কারোর কাছে যেতে দেয় না।

ছেলেটার সাথে কথা বলে একটু ভরসা হল। সুরো বেঁচে আছে, বুকে হাত দিয়ে সেটা বলা যাবে না, কিন্তু বেঁচে থাকতেও পারে। মা হয়ে ওই আশাটুকু নিয়েই তো বসে আছি। যদি বেঁচে থাকে তবে সুরো একবার আসবেই, ছেলে তার বুঝদার, ঠিক বুঝবে মায়ের মনের কী অবস্থা।

কিন্তু পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে কী করে আসবে? এলে আসবে লুকিয়ে রাত্রিবেলায়। কতবার রাতে ঘুম ভেঙে গেছে—মনে হল কে যেন জানালায় খটখট আওয়াজ করছে। কয়েকবার মনে হয়েছে কে যেন চাপা গলায় 'মা মা' বলে ডাকছে। কিন্তু ঘুম ভাঙলে আর কিছু নেই। আর পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে যে মানুষটা, তার কোনো হুঁশ নেই। হ্যাঁ গো, ছেলে তো তোমারও, তোমার কি কোনো কষ্ট হয় না? কতবার বলেছি একবার কলকাতায় যাও, নিজে একবার খুঁজে এসো। মনে হয় পাথরের সাথে কথা বলছি—কোনো সাড়া নেই। আজ রাতে আর ঘুম আসবে বলে মনে হয় না। দেওয়ালে ঝোলানো পুরোনো ক্যালেন্ডারে বাবা মহাদেবের ছবিটার কাছেই সব আবেদন-নিবেদন। তোমার তো সব ক্ষমতা আছে, ঠাকুর ফিরিয়ে দাও ছেলেটাকে। একবার এসে দাঁড়াক ছেলেটা সামনে, একবার বুকে জড়িয়ে ধরি। এই তো আমার সোনা ছেলে। আজকেই তো সব থেকে ভালো সময়। অমাবস্যার রাত, এই শীতে রাত একদম সুনসান, কেউ কোথাও নেই, কেউ দেখতে পাবে না। আয় বাবা, মার কাছে আয়।

কেউ আসে না, কেউ মা বলে ডাকে না। বরফের মতো ঠান্ডা মেঝেতে বসে থাকতে থাকতে জলের সাথে চোখে বোধহয় ঘুমটাও নেমে এসেছিল। ঘুমটা এক ঝটকায় ভেঙে গেল। কোনো ভুল নেই, স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি, কেউ দরজা ধাক্কা দিচ্ছে। আবার, জোরে জোরে, কিন্তু আমাদের বাড়িতে না, কাছেই কোথাও। একটা চ্যাচামেচি। তাহলে কি ওরা সুরোকে ধরে ফেলেছে? কী সর্বনাশ! ঝাঁপিয়ে পড়লাম বিছানার ওপর—

—ওগো, ওঠো, শিগ্‌গিরি ওঠো, আমাদের সুরো এসেছে।

ধড়মড় করে উঠে বসল মানুষটা,

—কই, সুরো কই, আমার বাবা কই।

উঠোন টপকে ছুট লাগালাম বাইরের দরজার দিকে, এই ঠান্ডায় গায়ে শাড়ির আঁচল ছাড়া গায়ে কিছু নেই। কাউকেও ছুঁতে দেব না আমার ছেলেকে।

## ॥ দশ ॥

কাজটা বোধহয় ঠিক হল না। মনটা খচখচ করছে। তার কথায় বৃদ্ধা বোধহয় একটা মিথ্যা আশা নিয়ে ফিরে গেলেন। ছেলের মৃত্যুসংবাদ পেয়েও যে-মা আশায় আছেন, আসলে তাঁর ছেলে মরেনি, তাঁকে কোনো মিথ্যা স্তোকবাক্য শোনানো তো অপরাধ। বোকার মতো যা বলল তাতে ছেলে বেঁচে আছে এই ধারণাটাই বোধহয় জোরদার হল। ছি ছি ছি ছি—এটা কী করল সে? এরপর একদিন সত্যি সত্যি মহিলা যদি জানতে পারেন, আসলে তাঁর ছেলে বেঁচে নেই, তা হলে তার সম্পর্কে কী ভাববেন? নিজেকে একদম অপরাধী মনে হচ্ছে। আসলে বিষয়টা এত আচমকা ঘটে গেল, কিছু ভাবনাচিন্তা না করেই কথাগুলো বলে দেওয়া হল। কিন্তু কী-ই বা তার করার ছিল? একজন প্রায় অপরিচিত বৃদ্ধাকে যদি এ কথা সে বলত, ও সব ভেবে লাভ নেই, আসলে আপনার ছেলে মারা গেছে, তা হলে সেটাও কি খুব ভালো কাজ হত? ভদ্রমহিলা তো তার কাছ থেকে একথা শুনতে চাননি। চেয়েছিলেন এ কথা শুনতে, না আপনার ছেলে বেঁচে থাকতেও পারে। অপ্রিয় সত্য কথা বলার দায় কেন সে নিতে যাবে?

আসলে ভয়টা অন্য জায়গায়, এই টাউনের সবাই জানে সে একজন 'ডেঞ্জারাস' লোক। এই ভদ্রমহিলাও তাই জানেন, অথচ লুকিয়ে লুকিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। একবার যখন এসেছেন, আবার আসতেই পারেন। আর বারবার তাকে একই কথা বলে যেতে হবে। আর তারপর যখন এই মহিলা একদিন সত্যিসত্যি বুঝবেন, তাঁর ছেলে আর কোনো দিন ফিরবে না, তখন কী হবে তাঁর রিঅ্যাকশন? তারপর কোনো উটকো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে? খুবই বাজে ব্যাপার হয়ে যাবে। তার থেকে বরং ছেলেটা বেঁচেবর্তে থাক। নিজের মার কথাও মনে পড়ছে। সে রকম হলে হয়তো এই বৃদ্ধার মতোই হাল হত। কিন্তু যতবার এই ভদ্রমহিলা আসবেন, ততবার এই একই কাজ করতে হবে, বিষয়টা ভেবে খুব স্বস্তি হচ্ছে না।

এই টাউনের কাউকে তার চেনা বারণ, জানা বারণ, আর কথা বলার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এ সবই আইনের চোখে দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু সে অনেককেই চেনে, জানে। এমনকী সে কথাও বলেছে কারো কারোর সঙ্গো। আর তার এই আইন ভাঙার সবচেয়ে বড়ো সহায়ক তাকে আইনমাফিক পরিচালনা করার দায়িত্বপ্রাপ্ত, তার শাসক, তার গার্জিয়ান—এক কথায় তার বর্তমান মালিক, তার পবন ভাইয়া। নাম জিজ্ঞাসা করলে বুক টানটান করে বলে, 'পওনপুত্তর ইয়াদব', অর্থাৎ পবনপুত্র যাদব। আদিবাস, আজমগঞ্জ, উত্তরপ্রদেশ। গ্রামতুতো চাচা তাকে এনে পুলিশের নোকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছে। একটা জলজ্যান্ত খোট্টা পুলিশ কনস্টেবলের সঙ্গো এক ছাদের নীচে পাঁচ-পাঁচটা বছর কাটাতে হবে দুঃস্বপ্নেও কখনো ভাবেনি। কিন্তু এটাই তাকে করতে হচ্ছে এবং এটা তার শাস্তিরই অংশ। অবশ্য লোকটা খুব খারাপ কিছু না। প্রথম প্রথম খুবই হম্বিতম্বি করত, এমনকী মাঝে মাঝে হাস্যকর ভাবে ঘরের মধ্যে হাতে লাঠি নিয়ে ঘুরে বেড়াত, বাথরুমে গেলে তার জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করত। কিছু করার নেই, মুখ বুজে সহ্য করতে হত। শুধু দু-একবার তাকে দলাইমলাই করতে বলায় আত্মরক্ষার্থেই সে গলা তুলে বলেছিল, আর একদিন এ কথা বললে চিঠি লিখে পুলিশের বড়ো কর্তাদের জানিয়ে দেবে। তারপর আর ওই অনুরোধ করেনি। তবে আস্তে আস্তে সে-সব কমে গেছে। তার মতো এই লোকটাও গোটা বিষয়টাকে মেনে নিয়েছে। তার না হয় মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই, কারণ এটাই তার শাস্তি। লোকটার? স্রেফ ওপরআলার নির্দেশ? ডিউটি? পরে অবশ্য বুঝেছে এর পেছনে একটা অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িয়ে আছে। সরকার বাহাদুর তাকে শুধু শাস্তি দেয়নি, তার খাওয়াপরার জন্য একটা টাকাও বরাদ্দ করেছে। সেটা কত টাকা সে জানেও না, জানার চেষ্টাও করেনি। কিন্তু টাকাটা থানা থেকে পবনের হাতেই দেওয়া হয়। পবনের হেঁশেলে মেনু মোটামুটি ফিক্সড। প্রচণ্ড মোটা রুটি (যার ভেতরটা অনেক সময়ই কাঁচা থাকে), ডাল (বিশেষ কোনো কারণ না থাকলে অড়হর), ন মাসে ছ মাসে সবজি নামক প্রায় বিনা মশলার প্রচণ্ড ঝাল একটা ঘ্যাঁট (ডালের বদলে), কোনো কোনো দিন মুড ভালো থাকলে দেশ থেকে আনা আমের আচার (ভীষণ নুন)। কিন্তু বলতেই হবে, কাঁচালংকা আর পেঁয়াজের ব্যাপারে পবন ভাইয়া যথেষ্ট উদার। তবে খুব গরম পড়লে দিনের বেলায় আর 'চুল্হা' জ্বালানো হয় না, ছাতু-জল-নুন-লংকা-পেঁয়াজ-আচার। থানার ডিউটিতে ছুটি থাকলে কোনোদিন স্পেশাল আইটেম—ছাতুর পুর দেওয়া অ্যাত্ত বড়ো বড়ো লিট্টি।

গত দু বছর তাকে কাজ করতে হয়েছে জুটমিল এরিয়ায়, কাজেই এগুলো তার কাছে খুব অপরিচিত না। কিন্তু মনে হয়, কলকাতার কাছাকাছি গিয়ে এগুলোরই স্বাদ একটু মোলায়েম হয়ে গিয়েছে। পবনের হাতে পরিচিত খাবারগুলোর স্বাদ কেমন আদিম হয়ে ওঠে। প্রথম প্রথম সহ্যই হচ্ছিল না, পেট খারাপ লেগেই থাকত। কিন্তু আস্তে আস্তে তাও সহ্য হয়ে গেছে। পবনের খাওয়া দেখলে অবশ্য মনে হয় কোনো নামি রেস্টুরেন্টের সেরা খাবার খাচ্ছে, বিপুল পরিমাণে এবং মুখে চোখে বিপুল তৃপ্তি সহ। কনস্টেবল সাহেবের খাবারের বিলাসিতা কেবল প্রতি সকালে এক 'লৌটা' দুধ। একজন 'জওয়ান' পুলিশের 'তন্দুরস্তি'র জন্য এটি নাকি একদম 'জরুর'। মাঝেমাঝে দু-একটা কলা আম কোথা থেকে যেন নিয়ে আসে। পয়সা দিয়ে কেনে বলে মনে হয় না। অবশ্য এখান থেকে ওখান থেকে এটা-ওটা তুলে আনা ভারতীয় পুলিশের জন্মগত অধিকার—এতে কেউ কিছু মনে করে না। দুধের ভাগ না দিলেও পবন তাকে এই ফলের ভাগ দেয় এবং বিবেকের কোনো দংশন ছাড়াই সে সেগুলো গলাধঃকরণ করে। সমস্যা হয় দেওয়ালের ওপার থেকে রান্নার গন্ধ ভেসে এলে। একটি ছোটো মুদির দোকানের মালিকের পরিবার, দুই পুত্র, মুখরা বড়ো বউ, পুলিশের লাঠিতে মরে যাওয়া শহিদ মেজো ছেলে আর তার ক্রন্দনশীল মায়ের সংসারের হাজার শব্দ মাঝখানের দেওয়াল টপকে তার কানে আসে। সারাদিন কিছু করার থাকে না যে রাজনৈতিক বন্দির, তার কাছে সময় কাটানোর পক্ষে বিষয়টা ইন্টারেস্টিং। কিন্তু সমস্যা ওই রান্নার গন্ধ। খাবারদাবারের ব্যাপারে নিজেকে সে কখনো বিশেষজ্ঞ বলে মনে করেনি। খুব একটা বাছবিচার তার কোনো দিনই ছিল না। যা পেয়েছে তাই খেয়েছে। কিন্তু সে-ই এখন প্রায় বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছে। ওপারের গন্ধেই সে এখন বোঝে, মুসুরির ডালে ফোড়ন দেওয়া হল। একবার গন্ধ পেলেই সে বোঝে কোনো মাছ সাঁতলানো হচ্ছে। পটল ভাজার গন্ধ এত সুন্দর, এ ধারণাই তার আগে ছিল না। আর এই গন্ধ তাকে পাগল করে দিয়ে বোঝায়, সে বন্দি, সে যা-ইচ্ছে করতে পারে না। তার স্মৃতির গভীরে কোথায় যে এই দৃশ্যগুলো লুকিয়ে ছিল কে জানে। সে সব এখন দল বেঁধে ফিরে আসছে। অফিস থেকে ফিরছে দিদি, ক্লান্ত। স্টেশন থেকে বেরিয়ে বাজার করেছে। তারপর এতটা হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি। চটি খুলতে খুলতে—

—মা, বাজারটা ধরো।

দিদির গলার আওয়াজ পেয়ে সন্তুটা ছুটে বেড়িয়ে আসবে, ঝাপটে ধরবে

দিদিকে। বারান্দার আর এক কোণে থলি থেকে বাজার বার করতে মা সন্তুকে বলবে,

—লক্ষ্মী বাবা, মা রে এখন ধরে না। বাইরের থিকা আইসে, সারা গায়ে নোংরা ধুলা বালি। হাত-মুখ ধুক, কাপড় জামা ছাড়ুক, তারপর মার কাছে যাইও।

এরপর দিদি পড়বে তাকে নিয়ে—তার সারাদিনের খোঁজ। ব্যাস শুরু হবে মার আর একদফা বিলাপ,

—আর গুণধর ভাইয়ের কীর্তি জিগাইস না, আমারই পোড়া কপাল, দুই দিন পরে ম্যাট্রিক পরীক্ষা। বইয়ের লগে পোলার কোনো সম্পর্ক নাই। সারাদিন টই-টই কইরা ঘুইরা বেড়াইতাছে। আজ তগো বাপ বাইচা থাকলে টেরটা পাইত।

এই রে আবার শুরু হল—মনে মনে প্রমাদ গুনছিল, হঠাৎ প্রসঙ্গ বদল,

—ও বুড়ি, এত সুন্দর ট্যাংরা মাছ! ও সোনা, ও সন্তু, দ্যাখ আইয়া-মা কেমন জ্যান্ত মাছ লইয়া আইছে। এই রাইন্ধা দিমু এখন।

বারান্দার আর এক কোণে রান্নার জায়গা, একটু পর সেখান থেকে ভেসে আসা ঠিক এ রকম গন্ধ। এখন যাই হোক সেই মুহূর্তে এ গন্ধের কোনো আকর্ষণ তার নেই। বরং বন্ধুর বাড়ি থেকে সংস্কৃত বই আনতে যাচ্ছি বলে কাঁচা নর্দমা আর দরমার বেড়ার কলোনির ঘরগুলো পেরিয়ে সে সোজা বড়ো রাস্তার মোড়ে। এই গুরুত্বহীন ছোটো ছোটো স্মৃতিগুলো যেন কোন অন্ধকারে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ছিল, আজ সুযোগ পেয়ে দল বেঁধে ফিরে এসেছে প্রতিহিংসা নিতে। অকিঞ্চিৎকর বলে জীবনের যে টুকরোগুলোকে সে মনে রাখেনি, তারাই প্রমাণ করে দিচ্ছে জীবন মানে কী, স্বাধীনতা মানে কী।

তার অপরাধ কি এতটাই মারাত্মক, 'অপরাধী' হিসাবে সে কি এতটাই ভয়ংকর, তাকে জেলখানায় রাখা গেল না! জেলে তো তাও একটা জীবন আছে, আর পাঁচটা মানুষ আছে, তার মধ্যে হয়তো পার্টির লোকও আছে। আর এখানে! প্রতি শনিবার রাতে নিয়ম করে বেশ্যাবাড়ি থেকে ঘুরে আসা এই কনস্টেবলটার সঙ্গে দিনের পর দিন এক ছাদের নীচে থাকতে থাকতে 'একা থাকা' (রায় দেবার সময় জজ বলেছিল 'ইন আইসোলেশন') কথাটার অর্থ আসলে কী তা সে বুঝেছে। পৃথিবীর কেউ বোধহয় তার মতো বোঝেনি। রায় দেবার পর ভিড়ের মধ্যে কে একটা বলছিল, অ্যাপিল করব। মুকুলদি ধমক দিয়ে উঠেছিল, 'কিচ্ছু অ্যাপিল করব না, বরং এটাকে আমরা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেব, একটা নতুন এক্সপেরিমেন্ট, একটা নতুন অ্যাভিনিউ। তুই ঘাবড়াস না বিশু, দেখছি।'

সে আর কী বলবে। জীবনে এই প্রথম আদালতের কাঠগড়ায়, এই প্রথম শাস্তি—তাও কি না এ রকম অদ্ভুত শাস্তি। শুধু মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল জজের

একটা কথা 'ফাইভ ইয়ার্স'—পাঁচ-পাঁচটা বছর, এত লম্বা! দোলা কী করবে? তার কান্না পাচ্ছিল। হঠাৎ চোখে পড়ল দরজার পাশে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে দিদিটা কাঁদছে। সে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। তার আর কী হয়েছে। তার থেকে অনেক বড়ো সর্বনাশ হয়েছে আজ দিদির।

দাঙ্গায় বিধবা দিদি কয়েক মাসের সন্তুকে নিয়ে তাদের আগরপাড়ার কলোনির বাড়িতে এসে উঠল। বাবা তখন সোদপুর বাজারের লক্ষ্মী ভাণ্ডারের খাতা লিখে সারা মাসের শেষে সামান্য আয় করেন, আর বাকি সময়টা বারান্দার এক কোণে বসে আপ্রাণ 'নতুন স্বাদের' পালাগান লেখার চেষ্টা করেন! যে দিন দোকান থেকে বাড়ি ফেরার পথে লোকটা ধুপ করে পড়ে মরে গেল, সে দিন বাবার একমাত্র ছোটো টিনের বাক্সটা ঘেঁটে একতাড়া হাতে লেখা পালাগানের মকশো আর হলুদ হয়ে আসা ছাপানো কয়েকটা হ্যান্ডবিল, নারায়ণগঞ্জের 'বিখ্যাত' কোনো এক 'যমুনা অপেরা'র 'জনপ্রিয় পৌরাণিক পালা 'কর্ণার্জুন'-এর বিজ্ঞাপন, ছাপার অক্ষরে পালাকারের নাম 'কবি কুলপতি শ্রী তারাশঙ্কর বিশ্বাস'। 'কবি কুলপতি', এই বিশেষণটা কে দিয়েছিল—বাবা নিজেই না কি অন্য কেউ? লক্ষ্মী ভাণ্ডারের 'দয়ালু' মালিক আর পাড়া প্রতিবেশীরা সাহায্য না করলে ঘাটকাজের পয়সাটাও ঘরে ছিল না।

এর পর শুরু হল তারাশঙ্কর বিশ্বাসের মেয়ের পালা। গোটা বিষয়টাতে মা-র কোনো ভূমিকা নেই। বহু দিন থেকেই মা থাকে এক কল্পনার জগতে। পার্টিশনের আগে তার বাপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ির সুখ-সমৃদ্ধি-শান্তির বাস্তবতাহীন এক বর্ণনায়। আর কখনো যদি বাস্তবে ফেরে তবে তা কান্না ও বিলাপ সহ। বাবার মৃত্যুতে শুধু এটা বেড়েছে, আর কিছু না।

আজকাল দিদি বলত, 'তুই একটু দাঁড়াইলে আমি একটু বিশ্রাম পাই। সেই কবের থিকা, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর সকাল আটটা তেইশের লোকাল ধরতে ছোটো, আর ফিরতে ফিরতে রাত আটটা-নয়টা, টাইমের কোনো মা বাপ নাই। বয়স হইতাছে, আর টানতে পারি না। তর কিছু একটা হইয়া গেলে, চাকরি ছাড়ুম না, কিন্তু একটু দম নিতে পারুম। আমার এখন কী মনে হয় ক তো? আমারে যেন বাঘে তাড়া করছে, দাঁড়ানোর উপায় নাই—এক দণ্ড জিরানের উপায় নাই। ছোটো, কেবল ছোটো।'

দুটো খাকি উর্দির মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে কাঁদতে কাঁদতে তার মনে হচ্ছে তার জন্যই দিদিটা বিশ্রাম পেল না। পাঁচ বছর দিদিকে আরো ছুটতে হবে। আর পাঁচ বছরেই বা কী, সে তো ফিরে আসবে জেল খেটে আসা কয়েদি হিসাবে, কে তাকে চাকরি দেবে? এই প্রথম মনে হচ্ছে পার্টি করতে আসাটা তার ঠিক

হয়নি। কিন্তু এখন দেরি হয়ে গেছে। অবশ্য একটু আগেও অন্য রকম লাগছিল। টেনশন ছিল। কিন্তু আরো দুজনের সাথে সেও এই কোর্টের প্রধান একটা আকর্ষণ, মন্দ লাগছিল না। পার্টিতে তো সে খুব গুরুত্বপূর্ণ কেউ নয়। কিন্তু আজকে সে সবার নজরে। মুকুলদি বা নীতিশদার মতো নেতারা কোর্টে সকাল থেকে, সে তো তাদের জন্যই। ভিড়ের মধ্যে যারা তার দিকে তাকিয়ে হাসছে, হাত নাড়ছে, এমনকী হাত মুঠো করে লাল সেলাম জানাচ্ছে তাদের সবাইকে সে চেনেও না। কিন্তু সবাই আজ তাকে চেনে। ভিড়টা যেন অপেক্ষা করছিল, রায় দেওয়া শেষ হওয়া মাত্র স্লোগানে স্লোগানে কোর্টরুম তোলপাড়। ভিড়টা তার নামেও স্লোগান দিচ্ছে, কমরেড বিশু তুমি এগিয়ে চলো, আমরা তোমার সাথে আছি। নিজের কানকেই প্রায় বিশ্বাস হচ্ছিল না। কিন্তু এই সব কিছু তার চোখের সামনে থেকে মুছে গেল মুহূর্তের মধ্যে, দিদিকে কাঁদতে দেখে।

দিদি কি তাকে বুঝবে না, তাকে দায়িত্বজ্ঞানহীন, বেইমান ভাববে? দিদিও তো অফিসে ইউনিয়নের মিছিলে যায়। গতবার ভোটের আগে মুকুলদি এসে দিদিকে এক গাদা ভোটার স্লিপ লিখতে দিয়ে গেল, রাত জেগে সেগুলো লিখে দিয়েছিল। গত ভোটে তো দিদি পার্টিকেই ভোট দিয়েছে। দিদি কিচ্ছু বুঝবে না?

এই ভিড়ের মধ্যে দোলাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না। দিদি দোলাকে চেনে না, কিন্তু দোলা তো দিদিকে চেনে, একটু পাশে গিয়ে দাঁড়াত, সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করত।

মুখ চেনে এ রকম একজন বয়স্ক কমরেড ভিড় ঠেলে কাছে এসে বলল, 'এই কমরেড কাঁদছ কেন? আরে, দেখতে দেখতে পাঁচ বছর কেটে যাবে। এই যে আমি, ব্রিটিশ আমলে সাত বছর খেটে এসেছি। আবার কবে ঢুকিয়ে দেবে ঠিক নেই। কিছু হয়েছে তাতে?'

দুর থেকে আঙুল তুলে নীতিশদা বারণ করছে। অশোকদা বা ওসমান তার মতো কাঁদছে না।

এখানে তাকে পাঠানোর দু দিন আগে শম্ভু এসেছিল জেলে তার সঙ্গে দেখা করতে। ফিসফিস করে যা বলে গেল তার মোদ্দা কথা হল, মুকুলদি তার জন্য খবর পাঠিয়েছে, তাকে যেখানে পাঠানো হচ্ছে সেখানকার জেলা কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে, সে কী করবে সে বিষয়ের ইনস্ট্রাকশন ঠিক সময় চলে যাবে। কিন্তু তার আগে যেন সে কিছু না করে, একদম 'গুডবয়' হয়ে থাকে।

সেই ইনস্ট্রাকশনের জন্য সে গুডবয় হয়ে অপেক্ষা করছে গত দশ মাস।

## ॥ এগারো ॥

—তা হলে আপনার নাম বিশ্বেশ্বর বিশ্বাস। তা সাহেবের নামের আদ্যক্ষর বিবি কেন?

নিজের রসিকতায় গোঁফের ফাঁকে রহস্যভরা হাসি। সে মনে মনে বলল, শুয়োরের বাচ্চা।

থানার বড়োবাবুর সঙ্গে এটাই তার প্রথম মোলাকাত। দ্বিতীয় বাক্যে তাকে জানানো হল, নেহাত সে 'পলিটিকাল প্রিজনার', তাই তাকে চেয়ারে বসতে দেওয়া হয়েছে, 'আদারওয়াইজ' কোনো 'ক্রিমিনাল'কে নীরেন্দ্র মাইতি চেয়ারে 'অ্যালাও' করেন না। 'ক্রিমিনাল' শব্দটার ওপর বিশেষ জোরটা কানে লাগবার মতো। তারপর ঝাড়া আধ ঘন্টা সেই বিশেষ লেকচারটি, যে লেকচারের কোনো না কোনো টুকরো তাকে প্রায় প্রতিদিনই বাংলায় অথবা পবনের আধা বাংলা আধা হিন্দুস্থানিতে শুনতেই হয়। মোদ্দা কথা, এখান থেকে পালানোর চেষ্টার ফল ভয়ংকর। বড়োবাবু তার কোমরে ঝোলানো পিস্তল দিয়েই নিজের হাতে ...। আর জেল ভেঙে পালানো প্রিজনারকে মারলে কোনো 'এক্সপ্লানেশন' দিতে হয় না। তাকে ভালো করে বোঝানো হল এই টাউন থেকে পালানোটা অসম্ভব। এই টাউনে সারা দিনে চারটে বাস আসে। শেষ বাসটা ছেড়ে যায় বিকেল চারটে নাগাদ। দিনের আলোয় এতগুলো লোকের চোখের সামনে লুকিয়ে বাসে ওঠাটা 'ইমপসিবল'। ট্রেন সারা দিনে চারটে, সকাল আর রাতে এক জোড়া কলকাতায় যায়, আর এক জোড়া ফেরে। ট্রেনের টাইমে স্টেশনে প্লেন ড্রেসে লোক থাকে, কাজেই 'ইমপসিবল'। পায়ে হেঁটে? টাউন থেকে বেরনোর একটাই রাস্তা, সেখানে চেক-পোস্ট বসানো আছে। পেছনে নদী পার হয়ে চেষ্টা করতে পারে, ভাঙা ব্রিজের তলায় শুখা মরশুমে জল হাঁটুর নীচে থাকে, কিন্তু যাবে কোথায়? পাথুরে মাঠ যত দূর চোখ যায়, তারপর জঙ্গল আর টিলা, যে যায় আর ফিরে আসে না, বুনো কুকুরের ঝাঁক, কেউটে সাপ, কয়েকটা সাদা হাড় কেবল পড়ে থাকবে।

—বুঝলেন বিশ্বেশ্বরবাবু পালানোর কোনো রাস্তা নেই। আরে আমিই চেষ্টা করে এখান থেকে পালাতে পারছি না।

বলে লোকটা কেমন অদ্ভুত করে হাসল।

প্রতিদিন সকালে পবনের সঙ্গে তাকে থানায় আসতে হয় হাজিরা দিতে। তারও কোনো ঘড়ি নেই, পবনেরও নেই। কিন্তু ঘড়ির কাঁটার মতো ন-টা থেকে ন-টা পাঁচের মধ্যে লোকটা তাকে নিয়ে থানায় ঢুকে পড়ে। বড়োবাবুর মাথার ওপরে থাকা থানার একমাত্র দেওয়াল ঘড়ি লোকটার সময়জ্ঞানের সাক্ষী দেয়। বড়োবাবুর সামনে বসে একটা জাবদা খাতায় তাকে সই করতে হয়। বড়োবাবু তখন চা খান। তাঁর মুড ভালো থাকলে কখনও কখনও সেও চায়ের ভাগ পায়। সে হ্যাংলার মতো শেষ ফোঁটা পর্যন্ত চা-টা খায়। প্রতিদিন থানায় হাজিরা দেবার এই ভয়ংকর বিরক্তিকর বিষয়টি সে গায়েই লাগায় না, স্রেফ এক কাপ চায়ের লোভে। আর যে দিন সেই লোভের দ্রব্যটি মেলে না, সারাটা দিন তার মেজাজটা বিগড়ে থাকে। ফেরার গোটা পথটা সে মনে মনে বড়োবাবুর বাপবাপান্ত করতে করতে ফেরে। তার একটাই নেশা ছিল। তার সবচেয়ে বড়ো শাস্তির একটা হল, চা না পাওয়া। পবনকে বলেছিল, তার পরিষ্কার উত্তর, 'সোরকার' তাকে চা খাওয়ানোর জন্য কোনো পয়সা দেয় না। শালা গুল মারছে, সে জানে জেলে চা দেয়। জেলের কয়েদিরা যা পায় তারও তাই পাওয়া উচিত। সাহস করে একদিন একদম বড়োবাবুর কাছেই আবেদন জানিয়েছিল। চোখ বিস্ফারিত করে লোকটা তাকে দেখল, কিছুক্ষণ, যেন তার দুঃসাহসের পরিমাপ করছে। তার কথাটার কোনো উত্তর দেয়নি, শুধু মাসখানেক থানায় আর তাকে চা দেওয়া হয়নি।

থানার কাজ হয়ে গেলে পবন আবার তাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসে এবং বেরিয়ে যাওয়ার সময় বাইরের থেকে তালা লাগিয়ে দিয়ে যায়। ভেতর থেকেই সে টের পায়, তালা লাগানোর পর দু-তিনবার টেনেটুনে ভালো করে পরখ করে দেখে ঠিকঠাক লেগেছে কি না। এই সময়টায় তার পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত উঠে আসে একটা অন্ধ রাগ, ইচ্ছে করে পবনের খাটিয়া, বিছানাপত্র, টিনের ট্রাংক, জামাকাপড় সব উঠোনে ফেলে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। দেখি, তারপর ওরা কি শাস্তি দেয়। কিন্তু এ সব কিছুই সে করে না, বা সত্যি কথা বললে, সে করতে পারে না। নিজের খাটিয়ায় সে চুপ করে বসে থাকে। রাগ সরিয়ে তাকে গ্রাস করে হতাশা আর লজ্জা মেশানো এক দীর্ঘমেয়াদি ভালো না লাগার অনুভূতি।

তাকে এ রকম অদ্ভুত শাস্তি দিল কেন? যদি অপরাধ বলা হয়, তার আর অশোকদার অপরাধ তো একই। বরং ওসমানটার কপাল খারাপ, ঝামেলার সময় বেচারা ছিলই না। বোধহয় বুঝেছিল গোটা দলটার মধ্যে এটাই সবচেয়ে দুর্বল, ভাঙলে এটাই আগে ভাঙবে। নিজেকে শক্ত রাখতে হবে, মকুলদি বলেছে, 'ইনস্ট্রাকশন' না আসা পর্যন্ত 'গুডবয়' হয়ে থাকতে হবে। যে কারণেই হোক, সে গোটাটাই মুখ বুজে মেনে নেয়।

পরে মাথা ঠান্ডা করে সে ভেবে দেখেছে গোটাটাই খুব হাস্যকর। যতই তালা লাগাক, চাইলে সে যে কোনো সময় পালাতে পারে। যা হোক, এটা তো একটা গৃহস্থ বাড়ি, জেলখানা নয়। পাশের ঘর আর তাদের ঘরের মাঝখানের উঠোনটা ভাগ করেছে যে প্রাচীরটা বড়ো জোর সেটা ছ ফুট, ওটা টপকানো আর এমনকী কঠিন? ওপারের ঘরে থাকেন যে ভদ্রমহিলা, গলা শুনে মনে হয় মাঝবয়সি, সবাই দিদিমণি বলে। মনে হয়, স্কুলে টুলে পড়ান। বোঝাই যায়, দুপুর বেলা থাকেন না। কাজেই কেউ দেখতেও পাবে না। কিন্তু প্রশ্ন, তারপর? থানার বড়োবাবুর কথা যদি ঠিক হয়, তারপর আর কোনো রাস্তা নেই।

একদিন হাসতে হাসতে কথাটা বলেই ফেলল, সে যখন চাইলেই 'ভাগতে' পারে অথচ ভাগেনি, কাজেই তাকে বিশ্বাস করে তালাটা খুলে রাখতে কী অসুবিধা? কুস্তি করার ভঙ্গিতে যেভাবে পবন আটা মাখছিল তাতে কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না, কথাটা যেন শুনতেই পায়নি। সরাসরি কথাটা পেড়ে কোনো লাভ হল না দেখে একটু ঘুরিয়ে সে কথাটা আবার তুলল একদম নরম করে। এই যে নিয়ম মেনে তাকে তালা দিয়ে আটকে রেখে যাওয়া হয়, যদি মাঝখানে কোনো একটি বিপদ আপদ হয়, যদি হঠাৎ ঘরে আগুন লাগে, তা হলে তো তালা খুলে দেখবে সে পুড়ে মরে পরে আছে। তখন ওপরআলার কাছে পবন কী জবাবদিহি করবে। তার এই প্রশ্নের উত্তরে পবন পরিষ্কার জানিয়ে দিল, যাই হোক ওপরআলার 'ওর্ডার' না হলে সে তালা খুলতে পারবে না। তার গোটা প্রচেষ্টাই মাঠে মারা গেল।

কেন জানি, প্রতি মাসের শেষে তাকে থানা থেকে পাঁচটা টাকা দেওয়া হয়। বোধহয় হাতখরচ। খুচখাচ নানা জিনিস দরকার হয়। দাঁতের মাজন (নিম ডাল দিয়ে মাজতে চিরকাল তার ভীষণ খারাপ লাগে), কাপড় কাচার সোডা, গায়ে মাখার সাবান, এ রকম সব। টাকাটা লেগে যায়। তার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে পবনই এনে দেয়। কিন্তু পবনের কাছে অপরিচিত কোনো জিনিস আনাতে হলে, সেটা বোঝাতে কালঘাম ছুটে যায়।

এখানের গরমটা অসহ্য, বিশেষত দুপুর বেলায় অ্যাসবেস্টসের চালটা বোধহয় আগুনের মতো তেতে থাকে, গরমে নিশ্বাস নিতেও যেন কষ্ট হয়। তাদের কলোনির বাড়িতেও ইলেকট্রিক ফ্যান নেই। কিন্তু এই অসহ্য গরমটা সেখানে দিনের পর দিন পড়ে না। সারা গায়ে বীভৎস ঘামাচি হয়ে গেল। মনে হল, একটু ট্যালকম পাউডার লাগিয়ে দেখবে কমে কি না। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছিল। দু দিন ধরে চেষ্টা করেও পবনকে ট্যালকম পাউডার বোঝানো গেল না। অবশেষে একটা রফা হল, থানা থেকে ফেরার পথে দোকানে গিয়ে সে জিনিসটা দেখিয়ে দেবে। থানার পুলিশের বাইরে এই শহরের কোনো লোকের সাথে সে মুখোমুখি এই প্রথম। এই প্রথম মোলাকাতকে বর্ণনা করা যায় এক কথায় এভাবে, দোকানদার তাকে দেখল যেন চিড়িয়াখানার কোনো জন্তু দেখছে।

গায়ে মাখার সাবান আনতে বলেছিল পবনকে। ডিউটি থেকে ফেরার পথে নিয়ে এসে শার্টের পকেট থেকে খুচরো বার করছিল পবন তাকে ফেরত দেবার জন্য। মনে মনে হিসাব করা ছিল, খুব বেশি পয়সা ফেরত আসার কথা না। হঠাৎ কি মনে হল সে বলে বসল, 'ঠিক আছে, ওটা তোমার কাছে রেখে দাও। খইনি খেয়ো।'

লোকটা এ রকম একটা কথার জন্য আদপেও তৈরি ছিল না, কেমন একটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে পকেট থেকে হাতটা বার না করেই দাঁড়িয়ে রইল। পরের বার লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখল, সারা মুখ জুড়ে হাসি। সে হাসিতে বিশুদ্ধ খুশি এবং কৃতজ্ঞতা দুটোই আছে। এই হাসি ঘুষ খাওয়া পুলিশের হাসি না।

লোকটার আর্থিক হাল ভালো না। অবশ্য স্বাভাবিক অবস্থায় ভালো হবার কথাও না। ক টাকাই বা মাইনে পায়। আর এই মরা শহরে উপরি আয়েরও খুব একটা সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। 'মুল্লুকে' জমিজিরেত বেশি নেই, গোটা আটেক গোরু আছে, কিন্তু রুটি জোগাতে হয় এ রকম মুখের সংখ্যা অনেক বেশি। মাইনের প্রায় গোটা টাকাটাই পাঠিয়ে দিতে হয়।

নেশা বলতে ওই খইনি। আর, সেটা বোধহয় নেশা নয়, কখনো কখনো খারাপ পাড়ায় যায়। সেটা, কয়েক দিন শরীর খারাপ হয়েছিল সেই দুর্বল মুহূর্তে তার কাছে বলে ফেলেছিল।

লোকটা কেন খারাপ পাড়ায় যায়? একটা জোয়ান মরদের জান্তব চাহিদার জন্য? বোধহয় তাই। তার মতো ক্ষীণজীবী বাঙালি বুঝবে না, তাদের মধ্যবিত্ত কালচারের বিরোধী গোটা ব্যাপারটা। আর তা ছাড়া তার তো দোলা আছে, শারীরিকভাবে না হোক মানসিকভাবে আছে, সারাক্ষণ তাকে ঘিরে আছে।

দেশে পবনের 'জরু' আছে। নামটা ভারি সুন্দর, মৈথিলি। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল বউ এ সব জানে কি না। প্রথম উত্তর, না। তারপর পবনের মধ্যে জেগে উঠল হাজার বছরের ভারতীয় পুরুষ, 'মরদ'রা এ সব করলে তাদের মুলুকের মেয়েরা কিছু মনে করে না। যাক, মেয়েরা এতে খুশি হয় অন্তত সেটা বলেনি।

খইনির পয়সা দেবার দু দিন পর পবনকে অনুরোধ করেছিল, তাকে কিছু কাগজ আর একটা পেনসিল বা কলম জোগাড় করে দিতে পারে কি না। পবন সে দিনই তাকে থানা থেকে এক তাড়া পুরোনো কাগজ আর অর্ধেক হয়ে যাওয়া একটা পেনসিল এনে দিয়েছিল। কাগজগুলোর এক দিকে কী সব ছাপানো, বোধহয় পুলিশের কোনো হিসাবপত্র, উল্টো দিকটা সাদা, তার কাজ চলে যাবে। বোঝা যাচ্ছে খইনি কেনার পয়সা দেবার পর থেকে তার আর পবনের সম্পর্কের একটা 'গুণগত উত্তরণ' হয়েছে, অন্তত পবনের দিক থেকে। পবনকে সে দিন খইনি খাবার জন্য দশ পয়সা দিয়েছিল।

সেই রাত থেকেই তার ডাইরি লেখার চেষ্টা শুরু আর দিন দশেকের মধ্যেই সে বুঝেছিল, তার দ্বারা ডাইরি লেখা হবে না, কোনো 'প্রিজনস নোটবুক' তার ক্ষমতার বাইরে।

পবনকে দিয়ে বাড়তি কিছু সুবিধা আদায়ের দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও বিশেষ সুবিধা হল না। তার প্রথম চাহিদা যদি হয় এক কাপ চা, তবে পরেরটা হল একটা খবরের কাগজ। টাটকা দরকার নেই, এক মাসের পুরোনো হলেও চলবে, একটা খবরের কাগজ হলেই চলবে। বাইরের পৃথিবীতে কী হচ্ছে তা জানার এক মাত্র রাস্তা। জলের মূল্য কী, মাছ তো বোঝে তাকে জল থেকে তুললে, আটকে রেখে সরকারও তাকে স্বাধীনতার মূল্য বুঝিয়ে দিয়েছে। আজ মনে হয় দুরন্ত গতিতে ছুটে চলা একটা পৃথিবী, উত্তেজনায় টগবগ করে ফোটা একটা পৃথিবীর একদম সামনের সারিতে সে ছিল। জি বি মিটিংয়ে নেতাদের কথায়, জনসভার বক্তৃতায়, ইউনিট মিটিংয়ের তর্কে এক নতুন পৃথিবী। সুভাষ মুখুজ্জের কবিতায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে, আই পি টি এর গানে, এক নতুন পৃথিবী। পাশের কাঁচা নর্দমার গন্ধে ভরা সন্ধ্যার পার্টি অফিসের কুপির আলো, কোণে জমে থাকা অন্ধকারের থেকে উজ্জ্বল হয়ে উঠে আসেন কমরেড মাও, জেনারেল গিয়াপ বা মার্শাল টিটো। চাকরির ব্যর্থ চেষ্টার হতাশা, দিদির ক্লান্ত অসহায় মুখ, বহু রাতে ঘরে ফিরে প্রায় বিনা তেলে রাঁধা তরকারি আর শক্ত হয়ে আসা রুটির বিতৃষ্ণা—এই সব কিছুকে মুছে দিয়েছিল এই পৃথিবী। আর এই পৃথিবী তার কাছে

থেকে নিখোঁজ গত দশ মাস। সে কী করে বেঁচে আছে? পুরোনো খবরের কাগজের মলাট দেওয়া লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব'-এ প্রায় দুর্বোধ্য 'রাষ্ট্র'-এর নিপীড়নকারী ভূমিকা এখন তার কাছে জলের মতো পরিষ্কার। কি ভয়ংকর সেই ভূমিকা! প্রতিটি দিনের প্রতিটি মিনিটে প্রতিটি সেকেন্ডে সে অনুভব করে।

প্রথম প্রথম থানায় ঢুকে সে তৃষ্ণার্তের মতো এদিক-ওদিক তাকাত, যদি একটা খবরের কাগজ পাওয়া যায়। না, এই থানায় কোনো খবরের কাগজ আসে না। ঠোঙা ছাড়া কোনো খবরের কাগজ গত দশ মাসে তার চোখে পড়েনি।

অনেক বুঝিয়ে পবনকে দিয়ে এই খবরটা আনতে পেরেছে, এই টাউনে খবরের কাগজ আসে, এমনকী এই পাড়াতেই তিনটে কাগজ আসে। একটা 'চেয়ারম্যান সাব'-এর বাড়িতে, একটা 'উকিল সাব'-এর বাড়িতে আর একটা 'ডাগদার সাব'-এর বাড়িতে। তবে ডাক্তারের বাড়িতে আসে 'আংরেজি' কাগজ। না এসব জায়গায় হবে না—একটা খোট্টা কনস্টেবল কী বলে কাগজ চাইতে যাবে? তবে পবনের কাগজ-সংক্রান্ত গোটা রিপোর্টের একমাত্র আশার জায়গা হল, টাউনে একটা লাইব্রেরি আছে এবং সেখানে খবরের কাগজ আসে। এই একটা জায়গা থেকে চেষ্টা করলে অন্তত পুরোনো কাগজ জোগাড় হতে পারে। কিন্তু পবনকে কিছুতেই রাজি করা গেল না। খইনি বাবদ পয়সা বাড়িয়েও না।

তাকে নিয়ে পবনের কোনো সমস্যা নেই, বরং আর্থিক সুবিধাই। আর পবনও কি ভাবে যেন তার বন্দি জীবনের একটা অংশ হয়ে গেছে। পবনকে নিয়ে তার আর কোনো বাড়তি বিরক্তি বা উত্তেজনা নেই। যেমন এই দেওয়ালের টিকটিকি, উঠোনের কোণে পড়ে থাকা অপ্রয়োজনীয় ভাঙা ড্রাম বা চালের অ্যাসবেস্টসের ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে পড়া বৃষ্টির জল। তবে এটা পরিষ্কার, এক ছাদের নীচে থাকলেও সে আর পবন দুটো আলাদা গ্রহের বাসিন্দা। এর কতটা পবনের পুলিশের চাকরির জন্য আর কতটা তার উত্তরপ্রদেশে জন্মগ্রহণের জন্য সেটা অবশ্য তার কাছে এখনো পরিষ্কার নয়।

মাথায় তার 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব'। সামরিক বাহিনীর মধ্যে 'বিদ্রোহের আগুন' ছড়িয়ে দেওয়া তো কমিউনিস্ট হিসেবে তার কাজ। হ্যাঁ, পবন মিলিটারি নয়, বড়ো জোর পুলিশের কনস্টেবল। কিন্তু সেও তো রাষ্ট্রের বল প্রয়োগকারী অংশের একটি টুকরো। এক ছাদের নীচে থাকতে থাকতে যদি একে সে প্রভাবিত করতে না পারে, তবে সে কেমন 'বিপ্লবী'? ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনা করে সে এ কাজে হাত দিয়েছিল। আর কথায় কথায় পবনের দুঃখের কথা বলতে বসার

অভ্যেস তাকে কিছুটা উৎসাহিতও করেছিল। পবনের জীবনের সমস্যার উৎস দুটো। এক, তার পরিবারের ওপর 'সামন্ততান্ত্রিক শোষণ', আর পুলিশের কাজে ওপরওয়ালার 'নিপীড়ন'। পবন তার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হয়ে গেল, যদি তার পরিবারের যথেষ্ট জমি থাকত তাহলে সমস্যার সমাধান হত। এমনকী সেই জমি নিয়ে কী করত সেই পরিকল্পনাও প্রায় মুখস্থ বলে গেল। 'বৃহত্তর ঐক্যমত'-এর আশায় সে চুপ করে সেই পরিকল্পনাও শুনল। পবনদের গ্রামে প্রায় সমস্ত জমির মালিক ঠাকুররা এবং এই ঠাকুরদের ওপর পবনের রাগও প্রচুর। এই পর্যন্ত ঠিকঠাক ছিল, গোলমাল শুরু হল তারপর। ঠাকুরদের জমি কেড়ে নিয়ে সেই জমি যাদের যথেষ্ট জমি নেই, তাদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া উচিত, পবনের কাছে এই যুক্তি কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হল না। তার পরিষ্কার উত্তর, জমি তো ঠাকুরদেরই। জমির মালিক ঠাকুরেরা, এটা সূর্য পূর্বদিকে ওঠে, এ রকমই স্বতঃসিদ্ধ, এর কোনো নড়চড় হতে পারে বলে পবন বিশ্বাসই করে না। 'সামন্ততান্ত্রিক শোষণ' সম্পর্কে তার চোখা বিপ্লবী বক্তৃতা বিশেষ দাগ কাটতে পারল না। তার বক্তৃতার তোড়ে পবন চুপ করে গেলেও নিজের মত থেকে সরল না। তার শেষ কথা, সে 'লিখাপড়া আদমি' তার কথা সব ঠিক হতে পারে, কিন্তু তাদের মুলুকে 'সাদিও সে' এ রকমই চলছে এবং 'এহ্ই চলেগা'। বাক্যের শেষ অংশে গলায় প্রায় মুলুকের ঐতিহ্য সম্পর্কে অহঙ্কারের ছোঁয়া। গভীর হতাশায় ডুবে যাওয়া ছাড়া আর কোনো রাস্তা তার সামনে খোলা নেই।

কিন্তু এত সহজে হাল ছাড়লে হবে না, মনে মনে সে নিজেকেই গালাগাল দিল, কাজটা এত সহজ হবে ভাবায়। পৃথিবীর সবচেয়ে পশ্চাদপদ চেতনা হল সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব, আর তার সামনে বসে থাকা কনস্টেবলটি হল এর সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ। আবার এটি কাজ করে পুলিশে, কাজেই প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা তীব্র মোহ থাকাটাই স্বাভাবিক।

তার পরের প্রচেষ্টা দু-তিন দিন পরে। এটা পরিষ্কার কমিউনিস্ট চিন্তাভাবনা দূরে থাক, কোনো প্রগতিশীল ধারণার সঙ্গেও পরিচয় এই পবনের হয়নি। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে কিছু ধারণা নিশ্চই আছে। আর উত্তরপ্রদেশ যখন, এ বিষয়ে একদম অজ্ঞ নিশ্চয়ই হবে না। হতে পারে চৌরিচৌরার কাছাকাছিই এর মুলুক, আর ৮। ৭।দ হয়, তা হলে তো জঙ্গি আন্দোলনের পটভূমিকা থেকেই ও এসেছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়ে দেখা গেল, পবনের যথেষ্ট উৎসাহ। কিন্তু তার উৎসাহের চরম ঘটনা হল, তাদের আজমগঞ্জে 'গাঁধিবাবা' এসেছিলেন। যদিও

বয়স অল্প থাকায় পবন নিজে যায়নি, কিন্তু গ্রামের সবাই গিয়েছিল, আর তাদের কাছ থেকে বহুবার পবন 'গাঁধিবাবা'র কথা শুনেছে। যথেষ্ট উত্তেজিত পবনের কাছ থেকে 'গাঁধিবাবা'-সংক্রান্ত গোটা বিবরণটি তাকে শুনতে হয়েছে। তিনি সেখানে কি বলেছিলেন সেই অংশটি বাদ দিয়ে গোটা বিষয়ই পবনের বিবরণীতে ছিল, এমনকী বলতে বলতে অন্ধকার হয়ে যাবার পরেও 'গাঁধিবাবা-র শরীর থেকে এমন আলো বেরোচ্ছিল যে 'অন্ধেরা'-তেও বহু দুর থেকে গাঁধিবাবা'কে দেখা যাচ্ছিল, এটিও পবন বিশেষভাবে উল্লেখ করছিল। তবে এই আলোচনার মধ্যে লক্ষণীয় ছিল, গোটা সময়টায় পবন কথা বলছিল গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে, অর্থাৎ গান্ধি বিষয়টি রাজনৈতিক, কাজেই নিষিদ্ধ প্রসঙ্গ। আর যতবার পবন 'গাঁধিবাবা' কথাটি উল্লেখ করেছে, ততবার কপালে হাত ঠেকিয়েছে, ঠিক যেমন ভাবে 'রামলালা' বা 'হনুমানজি'-র প্রসঙ্গ এলে করে।

ভারতবর্ষের আগামী বিপ্লবের প্রধান অক্ষ হবে কৃষিবিপ্লব এবং তাতে প্রধান বিপ্লবী বাহিনী হিসাবে থাকবে গরিব কৃষক, রাতে তার ঘুম হল না।

'নিপীড়নকারী' ওপরওয়ালাদের বিরুদ্ধে পবনের বিশেষ ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ কখনোই তার নজরে পড়েনি। ওপরওয়ালা বলতে পবন 'সুপার সাব'-কে চোখে দেখেছে জীবনে একবার কোনো এক প্যারেডের সময়। 'ডিপটি সুপার'-কে দু একবার থানায় দেখেছে। পবনের ওপরওয়ালা বলতে একজনই, তিনি হলেন থানার বড়োবাবু। পবন এক কথায় তার 'গুণমুগ্ধ'। এ রকম 'জবরদস্ত' অফিসার না কি সে জীবনে দেখেনি। পবন তার চলা, বলা এমনকী তাঁর জাঁদরেল গোঁফেরও ভক্ত।

'প্রচলিত ব্যবস্থা'-র বিরুদ্ধে পুলিশ কনস্টেবলকে বিদ্রোহী করে তোলার প্রচেষ্টা আর সে করেনি।

তবে একটা কারণে সে পবনের ওপর কৃতজ্ঞ, প্রথম দিনই পবন তাকে জানিয়েছিল চাইলে প্রতিদিন তাকে থানায় নিয়ে যাবার সময় হাতে বা কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু সে যেহেতু 'ভদ্দরলোকের ছেলে' তাই সে কোনো বেগরবাঁই করবে না এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে দড়ি ছাড়াই তাকে থানায় নিয়ে যেতে রাজি। সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়েছিল। প্রকাশ্য রাস্তায় তাকে পুলিশ দড়ি বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে, হাসিমুখে এ দৃশ্য সহ্য করার মতো বিপ্লবী সে এখনো হয়নি। তবে তার কোমরে না বাঁধলেও পবন হাতে দড়িটা রাখে।

প্রথম কয়েক দিন কোনো দিকে না তাকিয়ে সে মাথা নীচু করে সে হেঁটে

গেছে। মাথা না তুললেও সে দেখেছে চলতে থাকা পাগুলো থেমে গেছে তাদের দেখে। মাথা না তুললেও সে শুনেছে পেছনে ছুটে আসা বাচ্চাদের পায়ের আওয়াজ, তাদের বিস্ময়সূচক মন্তব্য।

পরে তার মনে হল কাজটা ঠিক হচ্ছে না, যত খারাপ লাগুক তাকে মুখ তুলে তাকাতেই হবে। মুকুলদির অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে গেলে এই রাস্তাতেই কেউ তাকে সিগনাল দেবে। পার্টির কেউ যদি যোগাযোগ করতে চায়, তবে রাস্তাটাই হবে প্রথম জায়গা। তারপর থেকে সে মাথা তুলেই হাঁটে। প্রথম প্রথম মনে হত, প্রতিটি মুখই অর্থবহ, ইশারায় তাকে কিছু বলতে চায়। আস্তে আস্তে সে বুঝেছে, মুখগুলোই এ রকম—তার জন্য আলাদা কোনো বার্তা কারুর কাছে নেই। বাড়তি লাভ এটুকুই, ঘর থেকে থানা, দশ মিনিট পায়ে হাঁটা এই পথটা তার চেনা হয়ে গেছে। এই রাস্তা সে চেনে, প্রতিটা মোড় সে চেনে, দু পাশের বাড়িগুলো চেনে, ফাঁকা মাঠগুলো চেনে, মানুষগুলোর মুখ চেনে।

এখন এই দশ মাস কাটানোর পর তার মনে হচ্ছে, থানার বড়োবাবু এই টাউন সম্পর্কে অর্ধেক বলেছে। এই টাউন থেকে কেউ পালাতে পারে না কেবল নয়, এখানে কেউ ঢুকতেও পারে না। তাহলে কী করে হয়, দশ মাস ধরে প্রায় একই কতগুলো মুখ সে দেখে যাচ্ছে। সে নিশ্চিত, এখানে নতুন কেউ আসে না। মুখগুলো এক, মুখের ভাবও এক—সেই প্রথম দিন থেকেই। সামান্য কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে, এই টাউনের লোকেরা তাকে দেখে যেন সে চিড়িয়াখানার কোনো জানোয়ার। নিরাপদ দূরত্ব থেকে, নিজেদের মধ্যে গলা নামিয়ে ফিসফিস করে তাকে নিয়ে আলোচনা করতে করতে। সমর্থন দূরে থাক তার প্রতি কোনো সহানুভূতির চিহ্নও তাদের চোখে সে কখনো দেখেনি। সে ঠিক মনে করতে পারে না, কোর্টের রায় ঘোষণার আগে এই শহরের নাম সে কখনো শুনেছে কি না। কিন্তু তক্ষুনি তার মনে প্রশ্নটা এসেছিল, এত জায়গা থাকতে এখানে কেন? এখানকার বিশেষ বৈশিষ্ট্যটা কী, যার জন্য আটকে রাখার জায়গা হিসেবে এই শহরটাকেই বেছে নেওয়া হল। এখন সে বোঝে কি নিখুঁত এই সিদ্ধান্ত।

এই শহরের থেকে বহু উঁচুতে, আকাশে, ঋতুর পরিবর্তন হয়। তার ফলে এখানে কখনও রোদ, কখনো শীত, কখনো বা বৃষ্টি, ব্যাস ওই পর্যন্তই—কিন্তু শহরটা তাতে পালটায় না, ভেতর থেকে এখানে কিচ্ছু পাল্টায় না। গোটা শহরটায় আটকে থাকে গোবর, খড়, আর খোলা নর্দমার একটা গা গোলানো গন্ধ। বাড়িগুলোর দেওয়ালে একশো বছরের পুরোনো শ্যাওলার দাগ, কোনো বাড়িতে

বেশি কোনো বাড়িতে কম। গাছের পাতায় জমে থাকা ধুলো, কবেকার? বটতলার মোড়ের জড়িবুটি বিক্রি করে যে হিন্দুস্থানি বুড়ি, ডোমপাড়ার রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো শুয়োরগুলো, হাজার বছর ধরে একই রকম আছে। ঘড়ির মোড়ের ঘড়িটা—কবে থেকে বন্ধ হয়ে আছে? এটাই পৃথিবীর প্রথম জেলখানা, পৃথিবীর সেরা জেলখানা।

কিন্তু তা কী করে হয়। পরিবর্তনের যে অমোঘ নিয়মের কথা সে জেনেছে—এখানে এসে কী তা ভুল প্রমাণ হয়ে যাবে? দু-একটা বাদ দিলে সে এখানে কারোর মুখে আনন্দ দেখেনি। সময়ের পলেস্তারা পড়তে পড়তে একটা পাথুরে আস্তরণে ঢেকে গেছে প্রতিটি মানুষ। দুঃস্বপ্ন দেখার মতো সে মাঝে মাঝে আঁতকে ওঠে এই ভেবে, এখানে থাকতে থাকতে সেও একদিন এ রকম হয়ে যাবে। মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও সে এখান থেকে আর যেতে পারবে না, যেতে চাইবে না। অনন্তকাল ধরে সে পবনের পেছন পেছন হেঁটে যাবে, ঘর থেকে থানা আর থানা থেকে ঘর। কবে আসবে মুকুলদির লোক, কবে আসবে পার্টি, তাকে এই জেল ভেঙে মুক্ত করতে? আর সে দিন সে একবার চেষ্টা করবে। পার্টি করতে এসে মানুষ সম্পর্কে যা শিখেছে, তা সে এখনো বিশ্বাস করে। এই পাথুরে আস্তরণের নীচে এখনও কোথাও হৃৎপিণ্ড আছে, যা ধুকপুক করে চলছে। এবং এর পরিচয়ও সে কখনো পেয়েছে, যেমন পাশের বাড়ির মাসিমা আর তার সম্ভবত শহিদ হওয়া ছেলে।

হঠাৎ একদিন ভোরবেলায় থানার বড়োবাবু এসে হাজির তাদের ওখানে। আগেও দু-একবার এসেছেন, কিন্তু এ আসা ঠিক সে আসা নয়, আগে এসেছেন দুপুরে, জেলার সাহেব জেল দেখতে এসেছে এই ভঙ্গিতে। কিন্তু আজ একদম অন্য রকম, এই প্রথম সে লোকটাকে ইউনিফর্ম ছাড়া দেখল। ধুতি পাঞ্জাবি পরা, হাতে ছোটো একটা মিষ্টির হাঁড়ি, মুখে কেমন একটা লাজুক হাসি। সাত সকালে দরজায় সাক্ষাৎ দেবতা, পবন কী করবে ঠিক করে উঠতে পারছে না। পবনকে রেহাই দিলেন তিনিই, পাঠালেন দু কাপ চা আনতে (দু কাপ, অর্থাৎ পবন বাদ)। তারপরই বসে পড়লেন তার খাটে।

—সক্কালবেলা এলাম আপনার সঙ্গে দেখা করতে। ধরুন, মিষ্টিটা আপনার।

এমনিতেই সে যথেষ্ট অবাক—এই বেশ, এই সময়, হাতে মিষ্টি। সে যন্ত্রের মতো মিষ্টির হাঁড়িটা হাতে নিল।

—আপনাকে একটা আনন্দ সংবাদ দিতে এলাম। সংবাদটা আমারই, আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন আজ। তিন মেয়ের পর কাল সন্ধ্যায় আমার

প্রথম পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। ভাবলাম আপনাকে মিষ্টিমুখ করিয়ে যাই। শত হলেও আপনি তো আমারই লোক, সরকার আপনার দেখাশোনার দায়িত্ব তো আমাকেই দিয়েছে। মিষ্টিমুখ করবেন আর দূর থেকে ছেলেটাকে একটু আশীর্বাদ করবেন। যেন বেঁচেবর্তে থাকে, বড়ো হয়ে লেখাপড়া শিখে যাতে মানুষ হয়।

পবন ফিরে এসেছে চা নিয়ে। হাতে চায়ের গেলাসটা নিয়ে লোকটা কেমন অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে রইল তার দিকে, তারপর আবার শুরু করল,

—লেখাপড়া তো আপনিও শিখেছেন, কিন্তু কি লাভ হল। পার্টি করতে গিয়ে সব জলাঞ্জলি দিলেন। বাপ-মার কথা ভাবলেনও না। ভালো কথা বলি বিশুবাবু, এ সব ছাড়েন।

হঠাৎ পাওয়া সাধের চা-টাও আস্তে আস্তে কেমন বিস্বাদ হয়ে উঠছে কিন্তু বক্তৃতা থামছে না,

—আপনি কথা দিন, আমি ঠিক আপনার রেহাইয়ের ব্যবস্থা করে দেব। আর এখানেই থেকে যান, আপনার চাকরিবাকরিও করে দেব।

তার চিরাচরিত অভ্যাস, জিভে ভর করল দুষ্ট সরস্বতী, দুম করে বলে বসল,

—আচ্ছা, বড়ো হয়ে আপনার ছেলেও যদি পার্টি করে?

লোকটা চুপ, চোয়ালের ওঠানামা দেখে বোঝা যাচ্ছে রাগ সংবরণ করার চেষ্টা করছে। না কথাটা বলে ঠিক করিনি—মনে মনে সে ভাবল। লোকটা হঠাৎ গলা নামিয়ে বলল,

—আমি নশ্বর মানুষ, ঈশ্বর যদি কপালে লিখে থাকেন, তাই হবে। তবে তা হলে খুব দুঃখ পাব। কিন্তু চারদিকে তো সব দেখছি, অন্তত লজ্জা পাব না।

পাথরের নীচে চাপা পড়া, কোথাও একটা হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ। তবে এই টাউনে আর কোথাও না থাকলে একটি জায়গায় প্রাণ আছে, তার 'জেলখানা'র ঘরের উল্টো দিকের দোতলার বারান্দায়।

ঠিক উলটো দিকের বাড়িটা পবনের 'ডাগদারবাবু'র, যার মতো 'দিলবালা আদমি' না কি এই টাউনে নেই। টাউনের চরিত্রের ব্যতিক্রমী একটি নেমপ্লেট বাড়ির দরজায় লাগানো, ডা. স্বদেশ চৌধুরি। তলায় নানা রকম দুর্বোধ্য ডিগ্রির মধ্যে লন্ডন কথাটা তাকে বিস্মিত করেছিল। এই টাউনে একজন বিলেত ফেরত ডাক্তার! লোকটা পাগল, না কি কোথাও পসার জমাতে না পেরে বাধ্য হয়ে এখানে? কিন্তু পবনের কথা যদি ঠিক হয় তাহলে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা বাতিল। গোটা টাউনের লোকেরা না কি ডাক্তারবাবুকে ভগবান বলে মানে। সকাল বেলা

হাজিরা দিয়ে থানা থেকে ফেরার সময় ডাক্তারবাবুর চেম্বার খুলে যায়, রাস্তার ওপরের ভিড়টা দেখে মনে হয়, ভগবান হিসাবে কতটা বলা যাবে না, কিন্তু ডাক্তার হিসাবে লোকটি যথেষ্ট সফল।

মেয়েটিকে চোখে পড়েছিল হঠাৎই একদিন ডাক্তারবাবুর বাড়ির দোতলায়। কেউ বলে দেয়নি, কিন্তু দেখেই সে বুঝেছে ডাক্তারবাবুর মেয়ে। নামটা অবশ্য পবনের দয়ায় জানা, মিলি। বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে কার সাথে যেন কথা বলছিল, যথারীতি তাকে দেখে কথা বন্ধ, একদৃষ্টিতে তারই দিকে। মনের ভুল কি না জানে না, মনে হল সে-দৃষ্টি টাউনের আর পাঁচজনের মতো না। এ দৃষ্টিতে কোনো দূরত্ব নেই, নেই কোনো ঘৃণা, বরং আছে কিছুটা অনুসন্ধিৎসা। কোনো একটি নদীর পাড়ে মেয়েটির সঙ্গে বসে গল্প করতে পারলে নিজের সম্পর্কে বানিয়ে বানিয়ে বেশ কিছু বীরত্বের কাহিনি বলবে, সেটা সে তক্ষুনি ঠিক করে ফেলল। আর মুকুলদি যদি এই মেয়েকে দিয়ে তার ইনস্ট্রাকশন পাঠায় তবে সে পৃথিবী জয় করবে পার্টির হয়ে।

মেয়েটিকে দেখেই সে বুঝেছে, এ মেয়ে মাটিতে থাকে না, দোতলায় অথবা তারও উঁচু কোনো মেঘের দেশে থাকে। ভোরবেলায় শিশির পড়ে এ মেয়ের গায়ে। কাছে গেলে পাওয়া যাবে ল্যাভেন্ডার ফুলের গন্ধ। দোলা কি কিছু মনে করবে? না, সে তো রূপকথার রাজকন্যার কথা ভাবছে, সে আর দোলা দুজনেই জানে, রাজকন্যারা কখনো মাটিতে আসে না। কিন্তু দোলাও যদি তার মতো কোনো রূপকথার রাজপুত্রের কথা ভাবে সারাক্ষণ? না না, দোলা খুব প্র্যাক্টিকাল, তার মতো না।

বন্দি জীবনটার মধ্যেই একটা অপমানবোধ আছে। কিন্তু সেটা অসহ্য হয়ে ওঠে দড়ি হাতে পবনের পেছন পেছন গোটা টাউনের 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' হয়ে দু বেলা থানা পর্যন্ত যাওয়া এবং আসার সময়। কিন্তু এখন তার মধ্যে একটা উৎসাহের বিন্দু তৈরি হয়েছে, যদি তাকে একবার দেখা যায়। তার কপাল খারাপ, দু দিন বারান্দায় আর একদিন রাস্তায়, রিকশয় ফিরছিল. ব্যাস এইটুকুই। এ টাউনে এইটাই একমাত্র প্রাণের চিহ্ন, বাকি গোটাটা মর্গের মতোই।

না না ভুল হল, তার হার্মিটেজ আছে—আর একটুকু জীবনের চিহ্ন। তাকে এখানে আনা হয়েছিল সরস্বতী পুজোর দু তিন দিন পরে। তখন সে কিছু খেয়াল করেনি। হার্মিটেজকে তার নজরে পড়ে তার বেশ কয়েক মাস পরে, বর্ষার সময়। প্রতিদিনের বন্দিত্বের স্বীকৃতি তাকে দিতে হয় সকাল সকাল নীরেনদারোগার সামনে হাজিরা দিয়ে। এটা তার সবচেয়ে খারাপ লাগার সময়, সেই সময় হঠাৎই

হাজির হয় হার্মিটেজ তার রূপের ডালি নিয়ে। থানার গেটের মুখে একটা কদমগাছ, আর তাতে এত ফুল, তার মনে হল গতকালও গাছটা ছিল না। তা হলে কেন আগে নজরে পড়েনি। একটা কদমগাছ এত সুন্দর হতে পারে সে আগে জানত না। সে নিশ্চিত এই গাছটা নেবুকাডনেজারের স্বর্গোদ্যান থেকে এসেছে, আর সে এই টাউন ছেড়ে চলে যাবার পর ও আবার ফিরে যাবে সেখানেই।

তাদের ডিস্ট্রিক্ট কমিটির সেক্রেটারি এসেছিলেন তাদের ওখানে মিটিং করতে। মিটিংয়ের পর তাদের পার্টি অফিসে বসে চা খাচ্ছিলেন, তখন কবে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়েছিলেন, সেই গল্প করছিলেন। ভিড়ের মধ্যে সেও ছিল। হার্মিটেজ কথাটা সেখানেই তার প্রথম শোনা। মুগ্ধ হয়ে সে হার্মিটেজের বর্ণনা শুনেছিল। স্বপ্নেও সে ভাবে না, কোনো দিন লেলিনগ্রাদে যাবে। কিন্তু সেখানের একটা মিউজিয়ামে পৃথিবীর সেরা সব শিল্পের সম্ভার, সে মুগ্ধ হয়ে সেই বিবরণ শুনেছিল। তারপর থেকে হার্মিটেজ তার স্বপ্নের জগতের স্থায়ী বাসিন্দা। কেন জানি কদমগাছটাকে সে মনে মনে হার্মিটেজ নাম দিয়ে দিল।

দারোগার টেবিলের যে কোণটায় বসে তাকে হাজিরা সই করতে হয় সেখানে থেকে সে পরিষ্কার হার্মিটেজকে দেখতে পায়। এখন হাজিরার খাতা দিতে দেরি করলে আর বিরক্ত হয় না।

বর্ষার শেষ দিকে ফুলগুলো শুকিয়ে গেল, মাটিতে পড়ে ভেঙে কেমন কাদাকাদা হয়ে গেল, সেগুলোর থেকে একটা অদ্ভুত গন্ধ বোরোল, কিন্তু তার হার্মিটেজ প্রেম গেল না।

যখন ফুল ছিল তখন তার খুব ইচ্ছে হত দু একটা ফুল নিয়ে যেতে। কিন্তু গাছটা বেশ বড়ো, হাত বাড়িয়ে ফুল পাড়া যাবে না। সে ভালো করে দেখল গাছটায় ওঠা খুব কঠিন না। কিন্তু একজন 'বিপ্লবী কমিউনিস্ট' গাছে উঠে কদমফুল পাড়ছে, এই দৃশ্য পাবলিক বা পুলিশ ঠিক কী ভাবে নেবে সেটা নিয়ে সন্দেহ থাকায় সে আর চেষ্টা করেনি। তবে সে ঠিক করে রেখেছে এখান থেকে চলে যাবার সময় দুটো ফুল তুলে নিয়ে যাবে। একটা মিলিকে দিয়ে যাবে, আর একটা নিয়ে যাবে দোলার জন্য। কিন্তু হার্মিটেজ আর কতক্ষণই বা তার সাথে থাকে। বাকি চব্বিশ ঘণ্টা, অসহ্য।

মুকুলদির লোক নিশ্চয়ই একদিন তাকে নিতে আসবে, সে দিন কিছু একটা করতে হবে। কী করবে সেটা সে জানে না, ভয়ংকর কিছু একটা করতে হবে, যাতে বন্ধ হয়ে যাওয়া এই টাউনের সময় আবার ছুটতে শুরু করে, হাজার বছরের ঘুম ভেঙে মানুষগুলো আবার জেগে ওঠে, মৃত্যুর পলেস্তারা ঝরিয়ে আবার বেঁচে

ওঠে। আর যদি তা না হয়, নদীর ওপারে মাঠ পার হয়ে ধোঁয়াধোঁয়া পাথুরে টিলাগুলোর ওপরে দাঁড়িয়ে সে দেখবে টাউনটা জ্বলছে, হিরোশিমা থেকে আগুন ধার করে নিয়ে জ্বলছে। অবশ্য যাওয়ার সময় মিলিকে নিয়ে যাবে এখান থেকে। মিলি এখানে কেন থাকবে? মিলি থাকবে পৌরাণিক আলেকজান্দ্রিয়ায় অথবা ক্রেমলিনে কিংবা মন্দাকিনী নদীর উৎসে।

কাল থেকে পবনের 'বুখার'। এমনিতে যতই পলোয়ান পালোয়ান হাবভাব করুক, এই জ্বরেই যে রকম কোঁকাচ্ছে আর বিলাপ করছে, তার মাঝেমাঝে হাসিই পাচ্ছিল ; কিন্তু বিকেলে থানা থেকে ফিরে যে-ভাবে কাটা কলাগাছের মতো বিছানাতে পড়ল তাতে মনে হল জ্বরটা বোধহয় বেড়েছে। লোকটার তারপর থেকে কোনো আওয়াজ নেই, বাধ্য হয়েই সে উঠে এসে একবার ডাকল। কোনো সাড়া নেই, এ বার সে আস্তে আস্তে ধাক্কা দিল। গায়ে হাত দিয়েই সে চমকে উঠল, জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না, এখন তার কী করা উচিত। চুপ করে বসে রইল। একটাই দুশ্চিন্তা, রাতের খাবারটা বোধহয় হাত পুড়িয়ে তাকেই করতে হবে। এ ঘরে কোনো ঘড়ি নেই, কাজেই কতক্ষণ সময় পার হয়েছে, তার নির্দিষ্ট খেয়ালও নেই। মনে হল, পবন বিড়বিড় করে কিছু বলছে। কান পেতে কথাগুলো শোনার চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝল, আসলে পবন ভুল বকছে। লোকটা জ্বরে একদম বেহুঁশ।

এই সুযোগ, সে এখন পালাতে পারে। কেউ বাধা দেবার নেই। রাতে একটা ট্রেন আছে, সেটা কলকাতায় যায় না, উল্টো দিকে কোথাও একটা যায়। তা যেখানে খুশি যাক, এই টাউন ছেড়ে তো যাওয়া যাবে। একটা মুশকিল হল স্টেশনের রাস্তাটা সে ঠিক চেনে না, শুধু এইটুকু জানে, ঘড়ির মোড় থেকে ডান দিকে যেতে হবে। কিন্তু এই টাউনের কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারবে না, সবার চোখ এড়িয়ে তাকে পালাতে হবে। কিন্তু চেষ্টা করলে নিজে নিজেই স্টেশনটা খুঁজে বার করা যাবে, সে কনফিডেন্ট। স্টেশনে পুলিশের লোক আছে। টিকিট কাউন্টারের ধারে কাছে না গিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঘাপটি মেরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকবে, ট্রেনটা চলতে শুরু করলে রানিংয়ে উঠে পড়বে। কোনো অলৌকিক ক্ষমতা না থাকলে এই টাউন তাকে ধরতে পারবে না। এই টাউনকে সে কোনো দিন রাতে দেখেনি, কিন্তু সে নিশ্চিত এই হতশ্রী টাউনের রাস্তায় খুব বেশি আলো নেই। কারুর চোখে না পড়ে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছোতে হবে, ঝুঁকি আছে, কিন্তু অসম্ভব নয়। তাকে যার পাহারা দেবার কথা সে এখন বেহুঁশ, কাল সকালেও জ্ঞান ফিরতে পারে, কিংবা হয়তো আর কোনো দিন জ্ঞান ফিরলই না। আর যাই

হোক কাল সকালের আগে কেউ টেরও পাবে না, আর যখন টের পাবে সে তখন এই টাউন এবং বড়োবাবুর নাগালের বাইরে। কিন্তু প্রশ্ন, তারপর কী? অন্য কোনো ঘোরা পথ দিয়ে বাড়িতেও ফিরে যাওয়া যাবে না, পুলিশ সেখানে নজর রাখবে। এক কলকাতায় কারো কাছে শেল্টার নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাদের ওখানেও পুলিশের নজর থাকবে না, গ্যারান্টি কী? একমাত্র পার্টিই তার জন্য নিরাপদ একটা শেল্টারের ব্যবস্থা করতে পারে, কিন্তু পার্টিকে খবরটা সে দেবে কী করে? তা ছাড়া গত কয়েক মাস বাইরের দুনিয়ার কোনো যোগাযোগ নেই। যাদের সঙ্গে সে কলকাতায় কনটাক্ট করতে পারে, তারা কে কোথায় আছে তাও তো সে জানে না। তাও সে রিস্ক নিতে পারে, কিন্তু সিদ্ধান্তটা তাকে একা নিতে হবে। পার্টির অনুমোদন ছাড়া এ কাজ করলে কমরেডরাও তো তাকে শেল্টার দিতে অস্বীকার করতে পারে। হয়তো এতে মুকুলদির প্ল্যান আপসেট হয়ে যাবে। মুকুলদি কি করল? তার সমস্ত রাগ এখন গিয়ে পরছে মুকুলদির ওপর। সে একজন পার্টি কমরেড, এ ভাবে আছে—একবার যোগাযোগ করতে পারে না? এ কথা পার্টিতেই শুনেছে, কখনো কখনো একজন কমিউনিস্টকে নিজের সিদ্ধান্ত নিজেকেই নিতে হয়।

দরজা খুলে সে এসে দাঁড়াল রাস্তায় নামার সিঁড়িটার ওপর। এই প্রথম একা। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আশেপাশের বাড়িগুলোর বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে যেটুকু আলো আসছে সেটুকু ছাড়া আর কোনো আলো নেই গোটা রাস্তায়। ঠান্ডা আর ভেজা হাওয়াতে সে বুক ভরে নিশ্বাস নিল। হাওয়াটাও যেন অন্য রকম। কিছু একটা সিদ্ধান্ত তাকে নিতে হবে, এক্ষুনি।

## ॥ বারো ॥

দু-তিন বার কড়া নাড়ার পর কে একটা ভেতর থেকে সাড়া দিল। নিজের অবস্থানটা সে একবার ভালো করে দেখে নিল। না, তার মুখ অন্ধকারে কেউ দেখতে পারবে না। দরজাটা যে খুলল সে বোধহয় বাড়িতে কাজকর্ম করে।

—ডাক্তারবাবু আছেন?

—ডাক্তারবাবু বিশ্রাম নিচ্ছেন, আপনি কে?

—আমি রোগীর বাড়ি থেকে এসেছি, রোগীর অবস্থা ভালো না, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একবার কথা বলব।

—কোথায় বাড়ি আপনার?

—উল্টো দিকে।

—উল্টো দিকে? কোন্ বাড়ি?

লোকটা রীতিমতো জেরা করছে। তার আসল পরিচয় পেলে কাজটা আরো কঠিন হবে। শেষ চেষ্টা হিসাবে সে চেঁচিয়ে উঠল,

—ডাক্তারবাবু ও ডাক্তারবাবু, একবার শুনন না, পেশেন্টের অবস্থা খুব খারাপ।

সে এ ভাবে চ্যাঁচাবে লোকটা ভাবেনি। লোকটাও পাল্টা চ্যাঁচাল,

—চ্যাঁচাচ্ছেন কেন? যা বলার আমায় বলুন।

'ভূষণ, কী হয়েছে?' দোতলা থেকে ভারী গলার আওয়াজ। ডাক্তারবাবুকে সে কখনো দেখেনি. গলার আওয়াজও শোনেনি। কিন্তু সে একশো ভাগ নিশ্চিত, ডাক্তারবাবুই কথা বললেন। উঠোনের ওপারে সিঁড়িতে আলো জ্বলল, সে মানুষটিকে দেখতে পেল। ফরসা দোহারা চেহারা, একটা সাহেব-সাহেব ব্যাপার আছে, যেটাকে কোনো কালেই সে খুব একটা পছন্দ করে না। কাছে আসতে দেখা গেল সাহেব-সাহেব ব্যাপারটার থেকেও বেশি আছে একটা সৌম্য ভালোমানুষি ভাব, যেটাকে তার অতটা খারাপ লাগল না।

—কে?

কী উত্তর দেবে সে? অতএব চুপ।

—অন্ধকারে কেন, আলোয় আসুন।

আর কিছু করার নেই, সে এগিয়ে এল দু পা। তার দিকে তাকিয়ে চুপ কয়েক মুহূর্ত, তারপর,

—আপনি?

অবাক হয়ে সে বুঝল, সে কোনো দিন ডাক্তারবাবুকে দেখেনি, কিন্তু ডাক্তারবাবু তাকে চেনে। অসম্ভব নরম গলায় পরের প্রশ্ন,

—কী হয়েছে?

পবনের অবস্থা বর্ণনা করার পর তাকে আশ্বস্ত করে ডাক্তারবাবু বললেন,

—আপনি যান, আমি আসছি।

দশ মিনিটের পক্ষে বড়ো বেশি ঘটনা ঘটে গেল তার ওপর। এই প্রথম একা একা বাইরে আসা, কী এক অজ্ঞাত ভয়ে পালাতে না পারা, এই টাউনের এক জন মানুষের কাছ থেকে প্রথম সমমর্যাদায় কথা শোনা, মনের কোণে একটা আশা থাকা সত্ত্বেও এত কাছে এসে মিলিকে দেখতে না পাওয়া (বাড়ির ভেতরে কোথাও রেডিয়োতে বাজছে, 'তুমি কি কেবলই ছবি ...', নিশ্চয়ই মিলি-ই শুনছে)।

একটু পরেই ডাক্তারবাবু তাদের ঘরে এসেছিলেন, সঙ্গে হাতে মোটা লাঠি এবং ছাতা নিয়ে ভূষণ। জিজ্ঞাসাটা থেকেই গেল, রাত্রিবেলায় রোগী দেখতে গেলে সব সময়ই এই লাঠি হাতের ভূষণটি থাকে, নাকি এক জন 'বিপজ্জনক প্রিজনার'এর ঘরে ঢোকার জন্য বিশেষ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা এটি? মনোযোগ দিয়ে পবনকে দেখেছিলেন, ওষুধ দিয়েছিলেন আর সমান মনোযোগ দিয়ে গোটা ঘরটা দেখছিলেন। সে নিশ্চিত, রোগীর ঘর দেখছিলেন না, দেখছিলেন প্রিজনারের ঘর।

ওষুধপত্র বুঝিয়ে-দিয়েছিলেন, বেরিয়ে যেতে যেতে বলেছিলেন, 'রাতে অসুবিধা বুঝলে আমায় খবর দেবেন।'

আর কথাটা বলতে বলতে তার কাঁধে একবার হাত রেখেছিলেন মানুষটি। খোলা দরজা দিয়ে দুজন বেরিয়ে গেছে, বৃষ্টির ছাঁট আসছে। তাও সে দাঁড়িয়ে ছিল অনেকক্ষণ গলাতে কান্নার মতো কী একটা চেপে রেখে। একজন মানুষ আর একজন মানুষের স্পর্শ এভাবে চায়!

ধ্যাত, একজন কমিউনিস্টের এ সব দুর্বলতা হাস্যকর। মাঝখান থেকে কাল

থানাকে বলে ফিস-টা পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা করবে, এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটাই বলতে ভুলে গেল।

পবন সুস্থ হয়ে গেল দু-তিন দিনের মধ্যে। কিন্তু পবন সুস্থ হল এই ধারণা নিয়ে যে, সে মরেই যাচ্ছিল তার দয়াতেই বেঁচে ফিরেছে। কথাটা পুরোপুরি সত্যি না, কিন্তু এটা যে সত্যি না, সেটা পবনকে জানানোর খুব একটা তাগিদ অনুভব করেনি। এর ফল ফলল অপ্রত্যাশিতভাবে। বিনা প্ররোচনায় একটি ভূমিকা সহ পবনই প্রস্তাবটি দিল। মোদ্দা কথা, তাকে এ রকম বাইরের থেকে তালা দিয়ে রেখে যেতে তারও খুব খারাপ লাগে। এই ব্যাপারে পবনের প্রস্তাব হল, সকাল বা সন্ধ্যা বেলায় কিছু করা যাবে না, কিন্তু দুপুর বেলায় বড়োবাবু যেহেতু প্রতিদিন বাড়িতে খেতে এবং ঘুমোতে চলে যায়, আর এ সময় রাস্তাঘাটে লোকজনও বিশেষ থাকে না, তাই সে চাইলে পবন বাইরের তালা না লাগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাকে 'কসম' খেতে হবে, খুব 'জরুরত' না পরলে কখনো সে বেরোবে না, কারণ ধরা পড়লে পবনের 'নোকরি' চলে যাবে আর তার মেয়াদ 'দুগ্‌না' হয়ে যাবে। বহু দিন পর তার আনন্দ হল, এই প্রথম পবনকে তার ভালো লাগল।

পরের দিনের প্রথম অংশটা প্রায় তার কাটতেই চাইছিল না। দুপুরে পবন বেড়িয়ে যাবার পর সে মনে মনে তিনশো গুনল, পাঁচ মিনিটের গ্যাপ দিতে হবে। সুর করে বাসন বিক্রি করছে একটা ফেরিওলা, এ ছাড়া গোটা রাস্তায় আর কেউ নেই—থাকুক, সে ব্যাপারটাকে অগ্রাহ্য করল। অনেক আগের থেকেই ঠিক করে রেখেছিল, প্রথমেই সে কী করবে।

গরম, এই দুপুরেও কিন্তু বটতলায় ছোটোখাটো একটা ভিড়; রিকশওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, ফেরিওয়ালা। বিকাশদা থাকলে বলত, 'একটা অসংগঠিত শ্রমজীবীদের দঙ্গাল'। বটতলার বাঁধানো শানটার ওপর ঘুমোচ্ছে কেউ কেউ। সে কাছে যেতেই ভিড়টা হঠাৎ চুপ, দু পাশে সরে গিয়ে তাকে জায়গা করে দিল। গোটা বিষয়টাকে অগ্রাহ্য করে সে সোজা দোকানের সামনে গিয়ে যে লোকটা কুচকুচে কালো কেটলি থেকে চা ঢালছিল, তার কাছে এক কাপ চা চাইল। লোকটা এমন হাঁ করে তাকে দেখছিল যে, মাটির খুরি উপচে চা পড়ে যাচ্ছে সেটাও খেয়াল নেই। হঠাৎ সম্বিত ফেরায় কেটলিটাকে সোজা করে একটা কড়া গলায় উত্তর দিল, 'চা হবে না।'

অপ্রত্যাশিত কিছু হতে পারে এটা তার হিসাবে ছিল, কিন্তু ব্যাপারটা এ জায়গায় যাবে, সেও ভাবেনি। মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে, কারণ চা খাওয়া ছাড়াও একটা বড়ো উদ্দেশ্য তার আছে। গলাটাকে স্বাভাবিক রেখেই সে বলল,

—ওই তো চা হচ্ছে।

—ওটা অর্ডারের চা।

—ঠিক আছে আমি বসছি, পরে তৈরি করুন।

বটতলার নীচে বাঁধানো শানের এক কোণে ঝুড়িতে করে কালোজাম আর আধপাকা দেশি খেজুর নিয়ে বসেছিল একটা লোক। তার পাশে গিয়ে সে বসে পড়ল। চাওয়ালা কেমন অসহায়ের মতো ভিড়টার দিকে তাকাচ্ছে, বোধহয় সমর্থনের আশায়। ভিড় অবশ্য আঁকা ছবির মতো নিশ্চুপ এবং নিশ্চল, এই নিস্তরঙ্গ দুপুরে পরে পাওয়া গল্প করার মতো ঘটে যাওয়া এই ঘটনার রস নিচ্ছে চেটেপুটে। চা-ওয়ালা হঠাৎ হাউমাউ করে উঠল, 'আপনার পায়ে পড়ি, আপনি চলে যান, আপনাকে আমি চা দিতে পারব না। জানতে পারলে নীরেনদারোগা মারতে মারতে আমার দোকান তুলে দেবে, বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে আমি না খেয়ে মরব। বাবু, আপনি চলে যান বাবু।'

পরের লক্ষ্য উকিলপাড়ার মুখের মুদির দোকান। এমনিতে এই টাউনে দোকানপাট দুপুরবেলায় বন্ধ থাকে। কিন্তু যে কোনো কারণে দোকানটা খোলা, আসবার সময়ই সে দেখে এসেছে। এখানে কোনো লোক নেই, সে আর দোকানদার, সে চেয়েছে একটা গায়ে মাখার সাবান। তাকে দেখে বিস্ময় এবং হতভম্ব ভাবটা চা-ওয়ালার মতোই। কিন্তু এদিক-ওদিক তাকিয়ে পয়সাটা নিল, বোধহয় আশেপাশে কোনো সাক্ষী নেই দেখেই। সাবানটা দেবার সময় এমনভাবে দিল যাতে কোনোভাবে আঙুল তার হাত স্পর্শ না করে, সে যেন দুরারোগ্য ছোঁয়াচে রোগের রুগি।

ফিরে এসে সে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল। কী সঠিক সিদ্ধান্ত, কী নিখুঁত একটি জেলখানা!

প্রথম মনে হল, তার এই পবনের ঘরই ভালো। সে আর কোনোদিন বাইরে বেরোবে না, আর চেষ্টা করবে একদিন রাতে এই টাউনে আগুন লাগিয়ে দিতে। কিন্তু পর মুহূর্তেই মনে হল, তাকে যে বাইরের লোকের নজরে পরতেই হবে, তার কী হবে?

তাদের ওদিককার সবাই মুকুলদির কথাকে বেদবাক্য বলে মানে। মুকুলদি বাজে কথা বলে না। মুকুলদি যখন বলেছে, কিছু একটা হবেই, এই অটুট বিশ্বাস নিয়েই সে এখানে এসেছিল। এই অসহ্য কয়েকটা মাস পার করেও সে বিশ্বাস তার এখনো আছে। কিন্তু পরিকল্পনা যদি মুকুলদি করেও, সেটা তাকে জানাবে

কী করে? তাকে এখানে যেভাবে চলাফেরা করতে হয়, বাইরের কারুর পক্ষে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা অসম্ভব। চিঠিপত্রের মাধ্যমে কিছু জানানোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ এখানে তার নামের চিঠি আসে সরাসরি থানায় বড়োবাবুর কাছে। তিনি চিঠিগুলো আগে পড়েন, তাতে আপত্তিকর কিছু আছে মনে করলে ভালো করে কালো কালি দিয়ে কেটে দিয়ে তারপর তাকে দেন। উত্তর লিখেও তাকে একইভাবে বড়োবাবুর হাতে তুলে দিতে হয়। সেগুলো নিয়ে তিনি ঠিক কি করেন তা সে জানে না, তার দৃঢ় ধারণা তার সব চিঠি পাঠানোও হয় না। খুব স্বাভাবিক কারণেই পার্টির কেউ তাকে এখানে চিঠি লেখে না, চিঠি লেখে কেবল দোলা আর দিদি।

প্রতিদিনের দুপুরের এই অস্থায়ী মুক্তি কেবল তার ভালো লাগার বিষয় না, পার্টিকে সুযোগ দেবে তার সঙ্গে যোগাযোগের। মুকুলদির লোক আসবেই, আর তাই তাকে বেরোতে হবেই। কিন্তু আজকের পর আর এই টাউনের কারুর মুখদর্শনও সে করতে চায় না। কিন্তু যত খারাপই লাগুক কথা তাকে বলতেই হবে। সে ঠিক করল বটতলার দিকে না, সে বেরোবে উল্টো দিকে, নদীর দিকে। তাদের এই নতুনপল্লির শেষেই নদীটা, মাঝখানে কয়েকটা মাত্র বাড়ি। একদিন পবনের মেজাজ ভালো ছিল, তাকে নদী দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। নদীটা তার ভালো লাগেনি। নদীটা এই টাউনের মতোই হতশ্রী। বর্ষাকালে কী হয় সে জানে না, এমনিতে কতগুলো কালো কালো পাথরের মধ্যে দিয়ে কোনোমতে নদীটা বয়ে গেছে। এই টাউনের সমস্ত ময়লা জল বোধহয় এই নদীতে এসে পড়ে, কাজেই নদীর জলটা কেমন কালো, গা ঘিনঘিন করা। বাঁ পাশেই এই টাউনের একমাত্র শ্মশান, সেই শ্মশানের পোড়া কাঠ, ভাঙা মাটির হাঁড়ি, হাজার রকমের জঞ্জাল ছড়িয়ে আছে নদীর পারে। আর নদীর মাঝখানটায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটা অর্ধেক তৈরি ব্রিজ, কবে থেকে কে জানে?

ভগবানের মতো ভূতেও পবনের অচল বিশ্বাস এবং এই পাড়ার আনাচে-কানাচে এ রকম হাজারটা উপাদান পবনের জন্য ছড়িয়ে আছে। এর সবচেয়ে বড়ো উৎস হল শ্মশানটা। পবনের দৃঢ় ধারণা, ওখানে যাদের মড়া পোড়ানো হয় তাদের সবার 'আতমা' ধারে কাছেই থেকে যায় এবং চেষ্টা করে, জ্যান্ত কোনো মানুষের ঘাড়ে চাপবার। সেও লক্ষ্য করে দেখেছে, রাতের বেলাতেই বেশি মড়া আসে শ্মশানে। আর 'বলো হরি হরিবোল' শুনলেই পবনের মুখচোখের চেহারা পাল্টে যায়, গলা ছেড়ে 'জয় রামজি, জয় হনুমানজি' বলে বন্দনা শুরু

হয়ে যায়। রামনামে ভূত পালায় এটা জানা ছিল, কিন্তু এ ব্যাপারে 'হনুমানজি'-রও যে বিশেষ ক্ষমতা আছে এটা সে পবনের কাছ থেকেই জেনেছে। আর একটি উৎস হল তাদের পরের পরের বাড়িটা, সে-বাড়িতে নাকি জনৈক মাস্টারমশাই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। বাড়িটা তারপর থেকে খালিই পড়ে আছে। পবন নাকি বহুবার মাস্টারমশাইয়ের 'ভটক রহি' আত্মাকে নিজের চোখে দেখেছে। তবে মাস্টারমশাইয়ের মতো তার আত্মাটিও ভালো, কাউকে কিছু বলে না। এই ভাঙা ব্রিজটিও নাকি অলৌকিক শক্তির কাজ, নদীর ওপারের মাঠ ও পাহাড়ের 'দেও'-রা নাকি রাগ করে ব্রিজ ভেঙে দিয়েছে, কারণ তেনারা চান না কোনো মানুষ ওদিকে পা রাখুক। কথাটা তার কাছে খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে না বুঝে পবন আরো জোর দিয়ে বলল, তার কথা যদি বিশ্বাস না হয় টাউনের যে কোনো লোককে সে জিজ্ঞাসা করতে পারে, সবাই একই কথা বলবে। সে মনে মনে বলল, যেমন টাউন তেমন তার পুলিশ।

সে অধিকাংশ দিন নদীর দিকেই যায়। যদি শ্মশানে ভিড় থাকে, তবে অবশ্য চলে আসে। চা খাওয়ার চেষ্টা আর সে করেনি, জিনিসপত্র কেনার থাকলে পবনকে দিয়েই আনিয়ে নেয়। কিছু কিছু লোকজন তাকে বাইরে দেখে—আশেপাশের বাড়ির লোকেরা, রিকশওয়ালা, ফেরিওয়ালা, ডোমপাড়ার লোকেরা, পাড়ার বাচ্চাগুলো। কেউই তাকে কিছু বলে না, সেও কাউকে কিছু বলে না। কিন্তু সে জানে, কথাটা মুখেমুখে গোটা টাউনে ছড়াচ্ছে এবং সে এটাই চায়। পাশের বাড়ির মাসিমা যদি চলে আসতে পারে, তবে মুকুলদির লোকেরাও পারবে। শুধু একটাই ভয়, নীরেনদারোগার আগেই যেন খবরটা তাদের কাছে যায়।

না, নীরেনদারোগা বা মুকুলদি কারুর লোকই এখনো আসেনি।

ক-দিন থেকে ভয়ঙ্কর ঠান্ডা পড়েছে। গায়ে কুটকুট করা পুলিশের দেওয়া দুটো কম্বল চাপিয়েও রাতে ঠান্ডায় তার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। আর এই পাড়াটা বোধহয় টাউনের মধ্যে সবচেয়ে ঠান্ডা, কারণ উত্তরের হাওয়া নদীর ওপারের পাহাড় আর খালি মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে এসে প্রথম আছড়ে পড়ে এই পাড়াটার ওপর। দুপুর বেলাতেও নদীর পাড়ে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যায় না, ঠান্ডা হাওয়া যেন চাবুক। একমাত্র ভাবান্তর নেই পবনের, ঠান্ডা বা গরম কিছুতেই তার কিছু যায় আসে না। তার ব্যাপারেও পবন এখন অনেক নিশ্চিন্ত, সে কিছু গড়বড় করবে না এটা ধরেই নিয়েছে। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই তাকে একা রেখে চলে যাচ্ছে 'রামগান' করতে। এই রামগানটি কেমন, সে ব্যাপারে ধারণা আছে ; মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে দল বেঁধে বাজখাঁই গলায় 'রামা হো রামা হো' বলে চ্যাঁচায়।

নিজের কাছে স্বীকার করতেও তার লজ্জা লাগে, সন্ধেবেলায় পবন না থাকলে তার খারাপ লাগে। সারা দিনের পর একটা মানুষের সঙ্গে যা হোক কথা বলার সুযোগ, এটাও এখন তার কাছে অনেক। পবনের চলে যাবার পর তার আর কিছু করার থাকে না। একটা টিমটিম করে জ্বলা ইলেকট্রিক বাল্বের নীচে সে চুপচাপ বসে থাকে অন্ধকার উঠোনের দিকে তাকিয়ে। তারা জ্বলজ্বল করা এক টুকরো আকাশ দেখা যায়, চাঁদ উঠলে উঠোনের আকারহীন নামহীন জিনিসগুলোর ওপর জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়ে। মাথায় ঘুরপাক খেয়ে যায় হাজারটা লক্ষ্যহীন চিন্তা। সে আগাম বিপ্লবের কথা ভাবার চেষ্টা করে, সে বিপ্লবে তার নিজস্ব বীরত্বের কথা কল্পনা করে নিজেকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সে দোলার কথা ভাবে, মিলির কথাও ভাবে, এমনকী দোলার জায়গায় মিলিকে বসিয়ে ভাবার অপরাধও করে, কিন্তু সেখানেও সে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। তার সব সময় মনে হয়, এ সব ভেবে কী লাভ, কোনো দিন কি সে তার পুরোনো জীবনে ফিরতে পারবে? মনে হয় এই টাউন, এই ঘর, এই পবন—সে চিরকালই এখানেই থেকে যাবে, তার মুক্তি নেই।

সব চিন্তাই তাকে ঠেলে দেয় একটি দিকেই—তাকে এখান থেকে পালাতে হবে, তা না হলে এই টাউন অক্টোপাসের মতো তাকে গিলে ফেলবে, সে নিজেও টের পাবে না কখন। এক হতে পারে, কেউ একদিন এই জেলখানা ভেঙে তাকে মুক্ত করবে। এটা হতে পারে, যদি গোটা দেশের পরিস্থিতি পাল্টায়। এটা অসম্ভব না, তার অল্পদিনের রাজনীতি করার জীবনই এই বিশ্বাস এনে দিয়েছে। সে নিজে দেখেছে, কি দ্রুত গ্রামের দিকে সংগঠন বাড়ছে, ট্রেড ইউনিয়নের জোর বাড়ছে, আরো জঙ্গি হচ্ছে। মানুষ কত উৎসাহ নিয়ে তাদের কথা শুনছে। কিন্তু কবে সেই পরিবর্তন আসবে? কত রক্ত, কত জেলখানা পার হয়ে সে-দিন আসবে? আর একটা নতুন ভয় আজকাল তাকে পেয়ে বসেছে, পার্টি তার কথা ভুলে যায়নি তো? হয়তো সব কিছুই মুক্ত হয়ে গেছে, কিন্তু এই টাউনটার কথা কারুর খেয়াল নেই। সময় এই টাউনটাকে বাদ দিয়েই চলে গেছে।

তাকে একমাত্র বাঁচাতে পারে মুকুলদির লোক। কিন্তু সে কবে আসবে, কীভাবে আসবে? সে যেন বেঁচে আছে, এই একজনের অপেক্ষায়। প্রথম দেখা যে কোনো মুখ, অপরিচিত কোনো শব্দ, দূর থেকে আসা কোনো পায়ের আওয়াজ—সে চমকে ওঠে প্রতি ক্ষেত্রেই।

কাল দোলার চিঠি পেয়েছে। সে সবচেয়ে খুশি হয় এটাতেই। নিজের কাছে তো লুকোনোর কিছু নেই, দোলার ব্যাপারে একটা আশঙ্কা নিয়েই সে এখানে

এসেছে। গল্প উপন্যাসে যে রকম প্রেম হয়, প্রেম করা হয়, তার আর দোলার ক্ষেত্রে সে সব কিছুই হয়নি। পার্টি অফিসেই দোলার সঙ্গে প্রথম দেখা। আজ পর্যন্ত তারা একে অন্যকে ভালোবাসে এই কথাটি তাদেব দুজনের কেউ উচ্চারণও করেনি। কিন্তু কী ভাবে যেন একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে, তাদের একে অন্যকে প্রয়োজন, সারা জীবনের জন্যই। তাদের এই বোঝাপড়া ঘনিষ্ঠ কয়েকজন ছাড়া কেউই জানে না। বাড়ির কেউ তো নয়ই, এমনকী পার্টিরও বিশেষ কেউ জানে না। পার্টির বয়স্ক নেতারা ব্যাপারটা কী ভাবে নেবে সে ব্যাপারে তারা ঠিক নিশ্চিত না। এক সঙ্গে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে, স্টেশনে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে করতে, মিছিল থেকে একসঙ্গে ফেরার সময় তাদের যা কথা। কখনো-কখনো তার হয়তো আবেগের বহিঃপ্রকাশ হয়েছে, কিন্তু দোলার কথায় কখনো না। মাঝেমাঝে সে অবাকও হয়েছে। পরে ভেবেছে, বেঁচে থাকার প্রতি দিনের কঠিন লড়াই দোলাকে বাইরের থেকে এ রকম আবেগহীন করে তুলেছে। কিন্তু সে জানে, তার প্রতি দোলার আস্থা কতটা গভীর।

চলে আসার আগে দোলার সঙ্গে সেভাবে, অনেক কথা হয়নি। থানায় এসেছিল দোলা, কিন্তু ঘাড়ের কাছে পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকলে আর কী-বা কথা হয়। তার মনে আছে, রায় ঘোষণা হবার পরই দোলাকে সে আর কোর্টের ভিড়ের মধ্যে দেখতে পায়নি। বোধহয় ওই একবারই দোলা তার আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি। কিন্তু সেটাও সবার সামনে প্রকাশ করতে পারেনি, কোথাও লুকিয়ে চোখের জল ফেলছিল—একা, সম্পূর্ণ একা। দোলার মতো মেয়ের প্রকাশ্যে আবেগ দেখানোর অধিকারও নেই। মায়াকভেস্কির একটা কবিতা পড়েছিল। মায়াকোভস্কি লিখেছিলেন এমন এক সমাজের কথা যেখানে ব্যক্তিগত যন্ত্রণাও রাষ্ট্রায়ত্ত হবে। দোলারা বোধহয় পার্টির কাছে আসে সেই স্বপ্ন নিয়েই।

তার এই শাস্তি তার কাছে যতটা আঘাত, দোলার কাছে তার আরো বড়ো আঘাত। সে তো বাউন্ডুলে, চাল নেই চুলো নেই, ভবিষ্যতের কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত লক্ষ্য নেই। কিন্তু দোলার তো তা নয়, চাল বাছার মতো করে তাকে অল্প অল্প করে ভবিষ্যতের রসদ সংগ্রহ করতে হয়। তার এই পাঁচ বছরের জন্য চলে আসা, দোলার সব কিছুকে তছনছ করে দিয়েছে। যদি দোলার হাতে দোলার সব কিছু থাকত, তবে তার জন্য পাঁচ বছর কেন, দোলা সারা জীবনের জন্য অপেক্ষা করে থাকত। কিন্তু দোলা কি সে সুযোগ পাবে? দোলাকে তো বেঁচে থাকতে হয় অন্যের কথা ভেবে, নিজের স্বার্থের থেকে অনেক বেশি দেখতে হয়

অন্যের স্বার্থ। দোলা কি পারবে নিজের জন্য পাঁচটা বছর অপেক্ষা করতে, নাকি এটাও তাকে ছেড়ে দিতে হবে অন্য কারুর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে। তার বড়ো ভয় করে। দোলার চিঠি এলে সে আশ্বস্ত হয়, না দোলা তার সঙ্গেই আছে।

দোলার চিঠি নিয়ে তার একটা ভয় ছিল। তার সব চিঠি তো নীরেনদারোগা পড়বে। সে ভাবতে পারে না, ওই মোটা দারোগা ঠোঁটের কোণে একটা অশালীন হাসি ঝুলিয়ে দোলার ব্যক্তিগত আবেগের কথা পড়ছে। না, দোলা সে-সুযোগ মহামান্য বড়োবাবুকে দেয়নি। চিঠিতে দোলা মুখের কথার থেকেও বেশি সংযত এবং সংক্ষিপ্ত। বোধহয় পার্টির কেউ ব্যাপারটা দোলাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। কিন্তু দিদিকে কে বোঝাবে! দিদি তাদের চোদ্দোগুষ্টির সব খবর চিঠিতে লিখবে, প্রায় পড়া যায় না এ রকম হাতের লেখায়। যা লেখে তার অর্ধেক সেই বোঝে না, তো নীরেনদারোগা কী বুঝবে? আর যা বোঝে না, তার ওপরেই কালো কালি। বড়োবাবুর 'দুর্দশা' দেখে তার মজাও লাগে, আবার দিদির চিঠির 'দুর্দশা' দেখে কষ্টও হয়।

গতকাল দোলার চিঠিটা অদ্ভুত, অন্য রকম'। এর আগে দোলার চিঠির দু-একটা লাইন কখনো কখনো পুলিশ কালি বুলিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এ রকম হয়নি কখনো। এবারে দোলার চিঠির শেষ দিকের প্রায় ছ-সাতটা লাইন ভালো করে কেটে দেওয়া। আর তার মনে হল, চিঠিটা হাতে দেবার সময় বড়োবাবু এক দৃষ্টিতে তার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল। কী লিখেছিল দোলা? কাটার ঠিক পরের লাইনটাও অদ্ভুত, 'আপনার সঙ্গে দেখা হলে সব বলব।'

কী বলতে চাইছিল দোলা? কোনো ব্যক্তিগত সমস্যা? তা হলে পুলিশ লাইনগুলো কাটত না। টেবিলের উল্টোদিকে বসে থাকা লোকটার এইটুকু বুদ্ধি আছে। তা হলে পার্টির কোনো কথা? না, সরাসরি পার্টির কোনো কথা দোলা এ ভাবে লিখবে না। তা হলে কি কোনো বিশেষ খবর দেবার চেষ্টা করেছিল দোলা। বড়োবাবুর পায়ে পড়বে? 'স্যার, একবার বলুন, দোলা কী লিখেছিল'।

সারাটা দিন এক অস্থিরতার মধ্যে সে কাটাল। তার সঙ্গে গোটা পৃথিবীর দেখা হবে চার বছর পর, তাহলে আজ হঠাৎ দোলা তার সঙ্গে দেখা হবার কথা কেন লিখল? তাহলে শিগগির দেখা হবার কোনো সম্ভাবনার ইঙ্গিত ছিল দোলার চিঠিতে? রাতে তার ভালো করে ঘুম হল না, শেষ রাতে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখে ঘুমটা ভেঙেই গেল। সে স্বপ্নে মুকুলদি আছে, অনেকগুলো অপরিচিত মানুষ আছে, কিন্তু ঘুমটা ভেঙে গেল গুরুদশার বেশ পরা নীরেনদারোগা পিস্তল

হাতে দাঁড়িয়ে আছে দেখে। প্রচণ্ড ঠান্ডা, কম্বলের ভেতর কাঁপতে কাঁপতে সে জেগে রইল। ভোরের আলো ফোটার পর তার আবার চোখটা লেগে এসেছিল।

বড়োবাবুর উল্টো দিকে বসে সে দৈনিক হাজিরার খাতায় সই করছিল। যে প্রশ্ন কোনো দিন করেনি, বড়োবাবু হঠাৎ সেই প্রশ্ন করল,

—শরীর স্বাস্থ্য সব ভালো তো?

সে আর কী বলবে, সে হাসিমুখে সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়ল।

—না না, শরীরের দিকে নজর দেবেন। কিছু হলে তো কেউ আপনাকে দোষ দেবে না, সব দোষ পড়বে আমার ঘাড়ে।

এই সব কথাগুলোর মানে কী? নীরেনদারোগা কিসের ইঙ্গিত দিতে চাইছে? নিশ্চিত, কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

দুপুরে পবন চলে যাওয়া মাত্র সে বেরিয়ে এল। হাওয়াটা বেড়েছে, ঠান্ডায় দাঁড়ানো যাচ্ছে না। একবার ভাবল চাদরটা রেখে বিছানা থেকে কম্বলটা নিয়ে আসবে। সে-সব কিছু না করে সোজা সে হাঁটা দিল নদীর দিকে। তাকে একা বসে ভাবতে হবে, পুলিশ কনস্টেবলের চিহ্ন ছড়ানো ঘরে বসে সে-ভাবনা হবে না।

তার কপালটা খারাপ, শ্মশানে দু-দুটো মড়া পুড়ছে, এক দঙ্গল লোক, চ্যাঁচামেচি। যথারীতি ভিড়টার নজর পড়ল তার দিকে, তারপর পরিচিত ঘটনাবলি। তার দিকে তাকিয়ে থাকা, নিজেদের মধ্যে তাকে নিয়ে কথাবার্তা, উৎসাহী কয়েকজনের তার কাছাকাছি এসে তাকে ভালো করে দেখার চেষ্টা। না, এভাবে বসে থাকা যায় না। কিছুক্ষণ পরে সে উঠেই পড়ল।

নীচু পাড় থেকে উঁচু রাস্তায় উঠে আসা মাত্র লোকটাকে তার নজরে পড়ল। ঠিক তাদের দরজার সামনে লোকটা দাঁড়িয়ে নেই, দাঁড়িয়ে আছে তাদের ঠিক পাশের দিদিমণির ঘরের দরজার সামনে। লোকটাও তাকে দেখতে পেয়েছে এবং এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। হাঁটার গতি সে কমায়নি, লোকটাও এক চুল নড়েনি। এখন আরো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে লোকটাকে। না, লোকটাকে আগে কখনো দেখেনি। লোকটার সঙ্গে তার দূরত্ব এখন বড়ো জোর পঞ্চাশ-ষাট ফুট। পেছনে কথাবার্তার আওয়াজ। শ্মশান থেকে কিছু লোকজন উঠে এসেছে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে। লোকটা যেন কিছুটা ইতস্তত করছে। তারপরই হঠাৎ উল্টো দিকে হনহন করে হাঁটতে শুরু করল। সেও হাঁটার গতি বাড়াল, লোকটাকে ভালো করে দেখা দরকার। কিন্তু লোকটা যেন হাওয়ার

গতিতে মিলিয়ে গেল। বটতলার মোড়ে গিয়ে লোকটার কোনো চিহ্নই সে আর দেখতে পেল না। এত জোরে হেঁটেছে, এই ঠান্ডার মধ্যে ঘামছে। ফেরার পথে চোখে পড়ল, ডাক্তারবাবুর বাড়ির বারান্দায় মিলি দাঁড়িয়ে। আজ সে কোনো উৎসাহই পেল না।

মনের মধ্যে তোলপাড় চলছে। কে লোকটা? কেন এসেছিল? এই কি মুকুলদির লোক? নাক মুকুলদির লোকের বার্তাবাহক? নাকি নিছকই চোরছ্যাঁচড়? কিন্তু চোরছ্যাঁচড় হলে তো তাকে দেখেই পালাত? তবে কি একান্তে তাকে কিছু বলবার জন্য লোকটা এসেছিল, অন্য লোকজন দেখে সরে গেল? তা হলে সে আবার আসবে। তাকে অপেক্ষা করতে হবে।

তার সেই অপেক্ষার দুপুর পার করে বিকেল গড়িয়ে গেল, এক সময় শীতের সন্ধ্যাও ঝুপ করে নেমে এল। পবন ফিরে এল। সে তখনো খাটের প্রান্তে চুপ করে বসে। তার আশা ছিল, পবন নিশ্চয়ই রামগান করতে চলে যাবে, সে এখন কারোর উপস্থিতি সহ্য করতে পারছে না। সে একা কানখাড়া করে কারোর পায়ের আওয়াজ শুনতে চায়। আর পবন থাকলে তো কেউ আসতে পারবে না। পবনের দিক থেকে কোনো উদ্যোগ না দেখে সে বাধ্য হয়ে জিজ্ঞাসাই করে বসল এবং শুনে হতাশ হল, আজ এই প্রচণ্ড ঠান্ডার জন্য পবন আর বেরোবেই না। কাজেই তাকে অপেক্ষা করতে হবে, একমাত্র পবন ঘুমোলে যদি সে ফিরে আসে।

পবন শোয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়ে। সেটা তার নাক ডাকা শুনেই বোঝা যায়, আজও তার অন্যথা হয়নি। সে তাও অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। ঘরকন্নার খুটখাট আওয়াজ হচ্ছিল পাশে মাসিমাদের ঘর থেকে, কিছুক্ষণ পর সে আওয়াজও থেমে গেল। একমাত্র পবনের নাক ডাকার আওয়াজ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই চারদিকে। আর নাক ডাকার শব্দটা এমনই, কিছুক্ষণ পরে আলাদা করে আর টের পাওয়া যায় না। শব্দটা যেন নৈঃশব্দ্যেরই একটা অংশ। সে সাবধানে পা টিপে টিপে উঠে এল। যতখানি সম্ভব আওয়াজ না করে দরজাটা খুলল। সে নিশ্চিত, এই আওয়াজে পবনের ঘুম ভাঙবে না। বাইরে বেরোনোর আগে ভালো করে কম্বলটা জড়িয়ে নিল মাথা পর্যন্ত। এই অবস্থায় তাকে দেখলে পবন নিশ্চয়ই ভূত ভেবে মুচ্ছো যাবে।

সোজা এসে দাঁড়াল রাস্তায়। ঠান্ডা হাওয়ায় দাঁড়ানো যাচ্ছে না। সে এবার ভালো করে তাকাল চারদিকে। মানুষ দূরে থাক, একটা কুকুর পর্যন্ত রাস্তায় নেই। রাস্তায় আলো ছাড়া বলতে কালীবাড়ির গেটে টিমটিম করে জ্বলা একটা বাল্ব।

আকাশে কোনো আলো নেই, আজ বোধহয় অমাবস্যা, আর কুয়াশার মতো একটা চাদর থেকে ঢেকে রেখেছে আকাশকে, কোনো তারাও দেখা যাচ্ছে না। চারদিকটা যেন কফিনে ঢাকা। একদম ভালো লাগছে না তার। কে আসবে এখন? এখানে? সে ঘরে ফিরে এল, কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা শুয়ে পড়ল বিছানায়।

তার ঘুমটা ভাঙল আচমকাই একটা অজানা আতঙ্কের মধ্যে,.ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটেছে। কারণটা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল, বাইরে কেউ একটা চ্যাঁচাচ্ছে। কিন্তু এভাবে কেন? কী হয়েছে? মানুষ একমাত্র প্রাণের ভয়ে এ ভাবে চ্যাঁচাতে পারে। সে লাফিয়ে উঠে বসেছে। এবার কেউ প্রাণপণ তাদের দরজাটা ধাক্কা দিচ্ছে, আরো কেউ একজন চিৎকার করে উঠল, 'এই শুনছেন, শিগগির দরজাটা খুলুন, দেখুন কী হয়েছে।' গলাটা চেনা, পাশের ঘরের দিদিমণি। কম্বলটা হাতে নিয়ে সে দরজাটা খুলতে এগল, পবন কী করছে সে দিকে না তাকিয়েই।

## ॥ তেরো ॥

ব্যাপারটা একদম বিরক্তিকর জায়গায় চলে গেছে। শুরুতে সেও ছিল সবার সঙ্গে, কিন্তু এক ব্যাপার নিয়ে কতক্ষণ থাকা যায়? মেয়েটা এখন প্রায় কেঁদে দেবার মতো অবস্থায়। এমনিতে আরতিকে খুব চালাক-চতুর বলে কোনো দিনই তার মনে হয়নি। থাকে স্টেশন রোডের ওদিকে। ওদের ক্লাসের সীমাও থাকে ওই পাড়াতেই, খবরটা সীমাই এনেছে, কাল নাকি আরতিকে কারা দেখতে এসেছিল। ব্যাস, গোটা ক্লাসটা এ রকম একটা খবরের জন্যই মুখিয়ে থাকে। সেই প্রথমে ধরেছিল,

—কী রে আরতি, জামাই বাবাজিকে কেমন দেখলি?

সে মেয়ে তো ধ্যাত বলে লজ্জায় ঘেমে নেয়ে একশা। আর এই লজ্জটাই তো সবাই দেখতে চায়। গোটা দঙ্গালটা একদম ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু আরতি কিছুই বলে না। সবাই তখন পড়ল সীমাকে নিয়ে, তা হলে তুই-ই বল। সীমাটা আরো ফাজিল, বলল,

—না ভাই, আমার মা অন্যের বরের দিকে নজর দিতে বারণ করেছে, তাই আমি বলতে পারব না। তবে তোমরা যদি জানতে চাও তবে আরতির শ্বশুরকে কেমন দেখতে তা আমি বলতে পারি, আমি আমাদের জানালা থেকে দেখেছি।

সবাই হইহই করে উঠল বল, বল।

—আরতির শ্বশুরকে দেখতে অনেকটা দিলীপকুমার বুড়ো হলে যে রকম হবে সে রকম, তবে আর একটু কালো আর নাকটা একটু বোঁচা।

গোটা ক্লাসটা একদম হেসে গড়িয়ে পড়ল। এবার আরতিকে নিয়ে পড়ল মায়া, কোমরে শাড়িটা জড়িয়ে একদম আরতির সামনে গিয়ে বলল,

—দ্যাখ আরতি, বলতে তোকে হবেই, ঝামেলা না করে ভাই তাড়াতাড়ি বলে দে।

মাথা নীচু করে আরতি বলল,

—বললুম তো, দেখিনি।

—ইয়ার্কি মারছিস? জ্বলজ্যান্ত একটা লোক তোর সামনে এল আর তুই তাকে দেখিসনি?

—আমি মাথা নীচু করে বসেছিলুম, মুখের দিকে তাকাইনি।

—কী? মুখের দিকে তাকাসনি? তা হলে বল, মুখের দিকে না তাকিয়ে জামাই বাবাজির কোন দিকে তাকিয়েছিলি?

বাকিরা হেসে গড়াগড়ি, সঙ্গে কতগুলো অশ্লীল কথা। সত্যি পারেও এই মেয়েগুলো। এমনিতে সব বাইরে লজ্জাবতী লতা, সাত চড়ে রা নেই। কিন্তু চার দেওয়ালের ভেতর এই মেয়েদের ক্লাসরুমে একদম অন্য চেহারা। অবশ্য এদের দোষ দিয়েও লাভ নেই। বাইরে তো কেবল 'এটা করবি না, ওটা করবি না', হাজারটা বাধা-নিষেধ। বাড়িতে বাবা, মা, এক গন্ডা গুরুজন, দাদা, ভাই, পাড়া-প্রতিবেশী—পান থেকে চুন খসলেই সর্বনাশ। এখানে তো ও সব কিছু নেই, প্রাণে যা চায় তাই করে। কিন্তু না বাবা, মরে গেলেও সে ওসব কথা উচ্চারণ করতে পারবে না। কিন্তু এ যাত্রায় আরতিকে বাঁচিয়ে দিল বাসন্তীদি, তাদের বাংলার টিচার। আপাতত মঙ্গলকাব্যে আরতির পঞ্চাশ মিনিটের রেহাই মিলবে।

কলেজ তাদের ছোটোই। দিদিমণি ছ জন, ছাত্রীও প্রায় হাতে গোনা যায়। গত বছর আই এ-তে তারা সতেরোজন ভরতি হয়েছিল। বেশ কিছু দিন হল দুজন আর আসে না, বোধহয় লেখাপড়াই ছেড়ে দিয়েছে। আর একজনের বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি দুর্গাপুর চলে গেছে। রোজ ক্লাসে বড়ো জোর আট-ন জন আসে। বাবা বলে, এই টাউনে মেয়েদের কলেজটা একটা অ্যাকসিডেন্ট, যেখানে মাত্র দুটো মেয়েদের হাই স্কুল সেখানে মেয়েদের কলেজ করার কোনো অর্থ হয় না। স্কুল ফাইনালের পর কথা হয়েছিল কাকুর বাড়িতে থেকে কলকাতার কলেজে পড়বে। মা বেঁকে বসল, সোজা কথা, কলেজে পড়া নিয়ে কথা, হাতের কাছে একটা কলেজ যখন আছে, তখন অত দূরে যাবার কোনো দরকার নেই। বাবা একটু অন্য কথা বলেছিল, কিন্তু সে-কথা বেশি দূর এগোয়নি। কেন জানি তার মনে হচ্ছিল, বাবাও ঠিক চাইছে না যে সে কলকাতায় যাক। সত্যি কথা বলতে, তারও একটু ভয় ভয় করছিল। কাকু কাকিমা ঠিক আছে, কিন্তু খুড়তুতো বোন সুমি—ও বাবা! কেমন সব সাজগোজ, ফটরফটর করে ইংরেজি বলে, শিস দিয়ে হিন্দি গানের সুর তুলতে পারে। আর-এক দিন তাকে ছাদে ডেকে নিয়ে তার ছেলে-বন্ধুদের গল্প বলেছিল, মরে গেলেও সে ও সব পারবে না। শেষমেশ সে

বলেছিল, ঠিক আছে বি এ পর্যন্ত এখানেই পড়ব, কিন্তু রেজাল্ট ভালো হলে আমি এম এ পড়তে কলকাতায় যাব, তখন আটকাবে না। মা আবার রেগে গেলে তাকে তুমি বলে, 'দ্যাখো তুমি এখন বাচ্চা নও, ভেবেচিন্তে কথা বলবে। তুমি কোথায় যাবে, সেটা সবটা আমরা ঠিক করব না, ও বাড়িরও একটা মতামত থাকবে।'

এবার তার রাগার পালা, বোধহয় সেটা বুঝেই বাবা এগিয়ে এল, 'রাখো তো এ সব, চার বছর পর কী হবে, সেটা তখনই দেখা যাবে।'

তাকে ছেড়ে মা-র লক্ষ্য এবার বাবা, 'দ্যাখো, তোমাকেও একটা কথা বলে রাখি, সারাটা জীবন তো তুমি মেয়েকে কোলে বসিয়ে আদর করতে পারবে না। তোমাকেও এটা বুঝতে হবে ওকে জীবনটা ও বাড়িতে গিয়েই কাটাতে হবে। দয়া করে মেয়েকে আহ্লাদ না দিয়ে আমাকে একটু সাহায্য করো।'

এ রকম অবস্থায় চিরকালই বাবা চুপ করে যায়, এ বারেও তাই হল। মাঝে মাঝে বাবার ওপরেই রাগ হয়।

এখন তার মনে হয়, জোর করে, রাগ করে, কান্নাকাটি করে কলকাতায় চলে গেলেই ভালো করত। এখানে তার একদম ভালো লাগছে না। যখন লাল পাড় সাদা শাড়ি পরা নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে যেত, তখন মনে হত কবে কলেজে যাবে, তা হলে এই স্কুলের জেলখানা থেকে মুক্তি মিলবে। কলেজে একই রঙের শাড়ি পরে রোজ যেতে হয় না, এটুকুই বাড়তি স্বাধীনতা। বরং স্কুলে একটা প্রাণ ছিল, একগাদা মেয়ে, হই-হুল্লোড় একটা লেগেই থাকত। কলেজের মেয়েগুলো খারাপ না, কিন্তু সবাই যেন এক রকম, এক ধাঁচে গড়া। বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার পথে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাচ্ছে, এভাবেই কলেজে আসে। বাইরে যে এত বড়ো একটা জগৎ আছে তার কথা জানে না, বা জানলেও তা নিয়ে ভাবার সাহস নেই। প্রফেসাররাও তো সে রকম, এই যে বাসন্তীদি 'মনসামঙ্গল' পড়াচ্ছেন। বেহুলা কতটা পতিব্রতা তা বলে যাচ্ছেন, একবারও বলছেন না মেয়েটা তার স্বামীকে কতটা ভালোবাসত। 'ভালোবাসা' নিষিদ্ধ কথা, এখানে তা উচ্চারণ করা যাবে না। সত্যি কথা বলা যাবে না। তার মাঝে মাঝে মনে হয়, পৃথিবীটা একটা আলো ঝলমলে মাঠ, আর সে আছে তার এক কোণে একটা বন্ধ কুঠরিতে, সেখানে ঘুলঘুলি দিয়ে অল্প একটু আলোই আসতে দেওয়া হয়। তার আজকাল কেমন দম বন্ধ হয়ে আসে, এখানে থেকে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। চলে গেলেই হত কলকাতায়। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথা বলে তো মনে হয় না, এই সব নিয়ে তাদের কোনো

মাথাব্যথা আছে। সবাই কেমন সুখে আছে। তারই-বা কেন এ রকম হয়? এই টাউনের বাইরে একটা আলাদা জগৎ আছে, সেখানে প্রাণ আছে, গতি আছে, এখানে সে সব কিছু নেই। সে এখান থেকে হারিয়ে যেতে চায়।

বাইরের আশ্চর্য জগতের আঁচ সে পায় বাবার কাছে গেলে। কেউ যদি বলে বাকি জীবনটা তাকে কাটিয়ে দিতে হবে বাবার পাশে বসে, এক কথায় সে রাজি হয়ে যাবে। বাবা যখন ইংল্যান্ডের গল্প বলে—কলেজ, পিকাডেলি সার্কাস, বাকিংহাম প্যালেসের বাগান, স্কটল্যান্ডের ঘাসে ঢাকা ঢালু পাহাড় যার চূড়ার দিকটা ঘন সবুজ পাইনের বনে ঘেরা—সে যেন হাওয়াতে নতুন গন্ধ পায়। প্যারিসে আইফেল টাওয়ারের সামনে বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কিংবা আলেকজান্দ্রিয়ায় জাহাজ থেকে নেমে উট, ঘোড়া আর হাজার মানুষের ভিড়ের মধ্যে বোরখার পর্দা সরিয়ে মিশরীয় সুন্দরীর বিদ্যুতের ছটার মতো রূপ—একদিন সে চলে যাবে ওখানে, আর বাবা যদি নিজে তাকে নিয়ে যায়, তার থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না।

বাবা বোধহয় চেয়েছিল, তাকে তার রাস্তায় নিয়ে যেতে। মনে পড়ে ছোটোবেলায় বাবা স্টেথোস্কোপটা নিয়ে সে ডাক্তার-ডাক্তার খেলত, বাবা মা'কে বলত,

—ওর যখন ডাক্তার হবার অতই শখ, ওকে ডাক্তারিই পড়াব।

মা যেত রেগে,

—খবরদার, আমার মেয়ে কখনো মড়া কাটার কাজ করবে না।

বাবা তর্ক করত,

—যা জানো না, তা বলতে এসো না। ডাক্তারি মানে শুধু মড়া কাটা? তোমার স্বামী কি সারাদিন মড়া কেটে বেড়ায়?

মাকে কিছু বোঝানো কঠিন। মার শেষ কথা,

—মড়া কাটা মেয়ের হাতের জল কেউ খায় না। মেয়েকে তো বিয়ে দিতে হবে, শ্বশুরবাড়িতে পাঠাতে হবে, তোমার মতো তো গলায় যন্ত্র ঝুলিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেরালে তার চলবে না।

বাবা হাল ছেড়ে দিত।

পরে একটু বড়ো হয়ে নিজেরও মনে হয়েছে, ডাক্তারি পড়া তার দ্বারা হবে না। বিজ্ঞান তার ভীষণ খারাপ লাগত, অঙ্কে তো যথেষ্ট কাঁচা ছিল। আই এ পড়তে এসে সে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে, আর তাকে অঙ্ক করতে হয় না। এখনো মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে—তার অঙ্ক পরীক্ষা, কোয়েশ্চেন পেপার হাতে পেয়ে

দেখছে একটা অঙ্কও পারবে না, ঘুমের মধ্যেই সে দরদর করে ঘামতে থাকে। স্কুলের অঙ্ক দিদিমণি তৃপ্তিদি, তার মুখটা মনে পরলে এখনো আতঙ্ক হয়। ম্যাট্রিকের আগে টেস্টের পর মাঝে মাঝে সুরোকে ডাকত অঙ্ক করিয়ে দেবার জন্য। এক ক্লাসে পড়লেও সুরোটা অঙ্কে খুব ভালো ছিল, পটপট করে সব অঙ্ক করে ফেলত। সেও তাকে অঙ্ক করাতে গিয়ে যেত রেগে, বলত তার নাকি মাথা ভর্তি গোবর।

সুরোর কথা মনে হলে ভীষণ কান্না পায়। সুরোটা এভাবে মরে গেল! পুলিশ এভাবে মেরে ফেলল সুরোটাকে! সে আর সুরো এক বয়সি, আর সুরোদের বাড়িটা তাদের বাড়ির ঠিক উল্টো দিকে। ছোটোবেলায় একসঙ্গে খেলত দুজনে। বড়ো হয়ে যাবার পরও বন্ধুত্ব ছিল। সুরো তাদের বাড়িতে আসত, মা-ও তাতে কোনো আপত্তি করেনি কোনোদিন। তারপর তো সুরো চলে গেল কলকাতার কলেজে পড়তে, সে রয়ে গেল এখানে। প্রথম প্রথম যখন কলকাতা থেকে বাড়ি আসত, দেখা করত তার সঙ্গে, কলকাতার কত গল্প করত। আর সুরোর কলকাতা সুমির কলকাতার থেকে আলাদা, তার ভীষণ ভালো লাগত শুনতে। সেও বলত এম এ পড়তে যাবে কলকাতায়। সুরো তাকে উৎসাহ দিত, চলে আয় কলকাতায়, খুব মজা হবে, আমি তোকে কলকাতার সব কিছু চিনিয়ে দেব। পরের দিকে আর অত ঘনঘন আসতও না, তার সঙ্গে দেখাও হত কম। তবে সুরো আস্তে আস্তে কেমন জানি পাল্টে যাচ্ছিল, কথাবার্তাগুলো কেমন কাঠখোট্টাদের মতো হয়ে যাচ্ছিল।

তার সঙ্গে সুরোর শেষ দেখা বাড়ির সামনে রাস্তায়। সেই ডেকে বলেছিল,

—কী খবর রে তোর, আজকাল আসিস না একদম?

সুরো কেমন গম্ভীর হয়ে বলল,

—কাজের চাপ অনেক বেড়েছে।

—ও বাবা! তুই তো সরকারি বাবুদের মতো করে কথা বলছিস! কলকাতায় তোর কী এত রাজকাজ রে?

—ছাত্র সংগঠনের অনেক কাজ করতে হয় আমায়।

—সে আবার কী কাজ।

—সে তুই বুঝবি না।

—বুঝব না তো বুঝিয়ে দে।

কেমন হাসিহাসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে সুরো বলল,

—এমনিতে বড়োলোকের মেয়েদের ব্যাপারটা বোঝানো কঠিন। আর

তোকে বুঝিয়ে লাভ কী বল, দুদিন পরে গয়নায় মুড়ে তোর বাবা-মা তোকে পাঠিয়ে দেবে রায়বাড়ির বউ করে। মাঝখান থেকে আমার বোঝানোটা জলে যাবে।

রেগেমেগে গিয়ে সে বলেছিল,

—কলকাতায় গিয়ে তোর খুব ডাঁট হয়েছে সুরো।

ছোটোবেলার মতো তার রাগ দেখে সুরো অনেকক্ষণ ধরে হো হো করে হাসল, তারপর বলল,

—আমাকে খবর না দিয়ে যদি বিয়ে করিস, ছোটোবেলায় যেমন চুলের মুঠি ধরে মারতাম সে রকম মারব, রায়বাড়ির মেজোকত্তা এসেও তোকে বাঁচাতে পারবে না।

আরো রেগে গিয়ে সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল, হাসতে হাসতে সুরো চলে গেল বটতলার দিকে। সুরোর ওপর সে রেগে ছিল, সেই দিন সকালে মাসিমার বুকে ফাটা কান্না শোনার আগে পর্যন্ত।

বাসন্তীদি বেরিয়ে যাওয়া মাত্র মেয়েগুলো আবার আরতিকে নিয়ে পড়ছিল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসে বাণীদি ঢুকে পড়ায় এ যাত্রায়ও বেঁচে গেল আরতি। এই একটা ক্লাস তার সবচেয়ে ভালো লাগে। বাণীদি পড়ানও ভালো, আর হিস্ট্রি তার প্রিয় বিষয়। ভারতবর্ষের ইতিহাস ঠিক আছে, কিন্তু তার খুব ভালো লাগে পৃথিবীর ইতিহাস। বাবার কাছ থেকে ইউরোপের নানা জায়গায় যে-সব গল্প শুনেছে, সেগুলো যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। আগের দিন বাণীদি রেনেসাঁস পড়াচ্ছিলেন। ফ্লোরেন্স শুনে কেমন একটা ছবি ভেসে উঠল মনে—পাথরের সরু সরু রাস্তা, পুরোনো পুরোনো তিনতলা বাড়ি আর গির্জা, শহর আর পাশের পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা নীল নদী, নদীর ওপরে ধনুকের মতো বাঁকা পাথরের ব্রিজ, পাহাড়ের ওপরে মাইকেলেঞ্জোলোর শ্বেতপাথরের ডেভিড মাথা তুলে সোজা তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। একদিন সে যাবেই ওখানে, যেভাবে হোক।

বাবাকে বলে রেখেছে রেজাল্ট ভালো হলে সে হিস্ট্রি নিয়ে এম এ পড়বে, মা-কে বুঝিয়ে রাজি করানোর দায়িত্ব বাবাকেই নিতে হবে।

আরতির অবস্থা দেখে আর না পেরে সে-ই বলল,

—মায়া কী করছিস তোরা, ছাড় না ওকে। দেখছিস না, বেচারি এবার কেঁদে ফেলবে?

—ওরে আমাদের দিদিমণি এসেছেন! আরতিকে কিছু বললে তোর গায়ে কেন ফোসকা পড়ছে?

—ও বেচারি ভালোমানুষ বলেই তোরা এত সব করতে পারছিস। অন্য কেউ হলে পারতিস না। আয় তো আরতি তুই আমার পাশে এসে বোস।

হাঁফ ছেড়ে আরতি এসে তার পাশে বসল। কিন্তু বাকিরা এত সহজে ছাড়ার পাত্রী না। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জয়া বলল,

—ভেবে দেখ আরতি, কার দিকে যাবি? ওর তো কার্তিককুমার ঠিক করা আছে, কিন্তু তোর হাল তো আমাদের মতোই, কপাল ঠুকে বর জোগাড় করতে হবে।

কথাগুলো শুনলে একদম মাথায় রক্ত উঠে যায়, ঝাঁজিয়ে উঠে সে জবাব দিল,

—আমি একটা কার্তিককুমার পেয়েছি, তাতে তোর কেন চোখ টাটাচ্ছে? যা না, তোকে কে বারণ করেছে. তুইও নিজের জন্য একটা গণেশকুমার জোগাড় কর।

বিরক্তিকর। তাকে আর ইন্দ্রকে নিয়ে এদের আলোচনা কোনোদিন শেষ হবে না। তার আর ইন্দ্রর বিয়ে হবে এটা কোনো গোপন কথা না। গোটা টাউনের লোক একথা জানে। কিন্তু এদের উৎসাহের শেষ নেই। এর থেকে বেশি রসালো আলোচনার বিষয় আর এদের কাছে নেই। ইন্দ্রদের বাড়ির সবাই খুব ফরসা, ইন্দ্রও তাই। শুভ্রা মাসিমার মতোই ইন্দ্রর চুলও ঘন আর কোঁকড়ানো, ব্যাস, ইন্দ্র হয়ে গেল কার্তিককুমার। ইন্দ্র মোটাসোটা, রোদে ইন্দ্রর গাল লাল হয়ে যায়, দাড়ি কাটার পর ইন্দ্র সেন্ট লাগায়, ইন্দ্রর মুখটা একদম বাচ্চা বাচ্চা, ইন্দ্রকে নিয়ে যেন এদের উৎসাহ যেন তার থেকেও বেশি।

একটা বিরক্তি নিয়েই কলেজ থেকে বেরিয়েছিল। অনেক দিনই দল বেঁধে গল্প করতে করতে পায়ে হেঁটে সে বাড়ি ফেরে। আজ কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা উঠে পড়ল রিকশয়। এই টাউনের রাস্তায় কিছু দেখার নেই, চোখ খুলে রাখা আর বন্ধ করে রাখা একই। একমাত্র তাকিয়ে দেখা যায়, ঘড়ির মোড়ের ঘড়িটা। এখন ধুলো পড়েছে, পাখিরা ময়লা করেছে, সারা গায়ে অযত্নের ছাপ। কিন্তু সে রোজই ঘড়িটাকে ভালো করে দেখে. ঘড়িটা একসময় সুন্দরই ছিল। ফ্রেম আর লোহার যে স্তম্ভটার ওপর ঘড়িটা দাড়িয়ে আছে তার ওপর কী সুন্দর কাজ। এক সময় গোল রেলিং দিয়ে ঘড়িটা ঘেরা ছিল। রেলিংগুলো এখন প্রায় সবই ভেঙে গেছে, আর-একটা দিক বোধহয় কোনো অসাবধানি গাড়ির ধাক্কায় একদম তুবড়ে গেছে। রেলিং আর ঘড়িটার মাঝখানে বোধহয় বাগান ছিল, এখন ন্যাড়া মাটি, একটা ঘাসও নেই। ঘড়িটার গায়ে ইলেকশনের সময় পতাকা লাগিয়েছিল, এখন ছিঁড়ে নোংরা ন্যাকড়া হয়ে ঝুলে আছে। স্তম্ভের গায়ে পুরোনো সিনেমার ছেঁড়া পোস্টার।

বাবা বলছিল, একবার নাকি ঘড়িটা সারানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, কলকাতা থেকে লোক আনা হয়েছিল। তারা দেখে-টেখে বলেছিল, যে সব কলকবজা খারাপ হয়েছে সেগুলো নাকি এ দেশে পাওয়া যায় না. বিলেতের যে কোম্পানির ঘড়ি একমাত্র তাদের কাছ থেকেই পাওয়া যেতে পারে। কে আনবে? আর অত টাকাই-বা কে দেবে? আরো কারা সব খবর আনল ওই বিলিতি কোম্পানি এডওয়ার্ড অ্যান্ড ইয়াং নাকি উঠে গেছে বহু দিন। ব্যাস, ঘড়িটা একই ভাবে রয়ে গেল। ছোটোবেলায় ঘড়িটা চলতে দেখেছে বাবারা। তখন নাকি টাউনটাও অনেক সুন্দর ছিল, অনেক জমজমাট ছিল। নদীটাও নাকি অনেক চওড়া ছিল, বর্ষাকালে টাউনের নীচু জায়গায় জল উঠে যেত। তারপর বড়ো নদীর ওপর ব্রিজ হয়ে যাবার পর রেলগুলো সব এখান থেকে সরে গেল, টাউনটাও আস্তে আস্তে মরে যেতে লাগল। অনেকে চলে গেল, আর যারা গেল না, তাদের কথা বাকি দুনিয়ার সবাই ভুলে গেল।

বাবা কেন যায়নি? বাবা বলেছিল, কোথায় যাব ভাবতে ভাবতেই আর যাওয়া হল না।

—চলো না, এখন চলে যাই।

—না রে, আর যাওয়া হবে না।

—কেন?

—আসলে কী জানিস, এই টাউনটা আমার একদম ভেতর পর্যন্ত ঢুকে গেছে। যেখানেই যাই টাউনটা সঙ্গে যায়, ওর থেকে আমি আর আলাদা হতে পারি না। তুই এখানে থাকিস না, চলে যা অন্য কোথাও।

- তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না।

—দূর পাগল।

সন্ধেবেলায় আজ ইন্দ্র এসেছিল। সপ্তাহে দু-তিনবার ইন্দ্র আসে তার কাছে। লোকে কী বলবে, এই ভয়ে বোধহয় রোজ আসে না। তার মাঝে মাঝে মনে হয়, কেউ কিছু না বললে ইন্দ্র সারাক্ষণ তার পাশে বসে থাকতে রাজি। যতক্ষণ ইন্দ্র থাকে, অন্য কিছু করার বা ভাবার উপায় নেই। আগের দিন থেকে আজ পর্যন্ত যতক্ষণ তার সঙ্গে দেখা হয়নি, কী কী হয়েছে সেই সব কথা ইন্দ্র বলবে, এই সময় যা-যা প্রশ্ন ইন্দ্রর মনে তৈরি হয়েছে সেই সব প্রশ্ন ইন্দ্র করবে, আর যা-যা সমস্যা ইন্দ্রর হয়েছে তার সব ক-টির সমাধান তার কাছ থেকে জানতে চাইবে। যে যাই বলুক, তার মজাই লাগে। আর সব কথা শেষ হয়ে গেলে, শুরু হবে ইন্দ্রর ফুটবলের কথা, যে কথার কোনো শেষ অন্তত ইন্দ্রর কাছে নেই।

ইন্দ্রর পৃথিবীর দুটোই ভাগ ; এক ভাগ সে, আর এক ভাগ ফুটবল। এক সময় সে-ই ইন্দ্রকে থামায়,

—অনেক রাত হয়েছে, এবার বাড়ি যাও, মাসিমা চিন্তা করবে।

করুণ মুখ করে ইন্দ্র বলে,

—আর একটু বসি?

—ঠিক আছে বোসো, কিন্তু ফুটবল নিয়ে বকবক থামাও।

—না, না, আমি ফুটবল নিয়ে কিছু বলছি না। আমি ছেলেটার কথা বলছি। গরিব ঘরের ছেলে কিন্তু বাঁ পায়ের কী কাজ, তুমি দেখলে বুঝতে! কলকাতার কোনো ক্লাব দেখলে একদম লুফে নিত।

মা হঠাৎ ঘরে ঢোকায় সে অবশেষে রেহাই পেল।

ইন্দ্র প্রতিদিনই আসবার সময় নিয়ম করে একতলায় বাবার সঙ্গে দেখা করে আসে, তারপর দোতলায় উঠে মার সঙ্গে, তারপর তার ঘরে। মা তো একদম মুগ্ধ, আজকাল এ রকম ভদ্র ছেলে দেখা যায় না।

মা জানে ইন্দ্র কী খেতে ভালোবাসে। পছন্দের খাবার আসলে ইন্দ্র তৃপ্তি করে খায়, আর সে গালে হাত দিয়ে ইন্দ্রর খাওয়া দেখে। ছোটোবেলার বন্ধু দোলন একদিন ইয়ার্কি মেরে বলেছিল, তোকে তো দেখছি এক সঙ্গে দু-দুটো ছেলে মানুষ করতে হবে। একটা তোর নিজের ছেলে আর একটা তোর শাশুড়ির ছেলে। দেখিস একটা আবার আর একটাকে হিংসে না করে। শুনে সে খুব হেসেছিল, বলেছিল, কোনো আপত্তি নেই, দুটোকেই মানুষ করব একসাথে। ছোটোবেলার পুতুলখেলার মতো করে ইন্দ্রকে নিয়ে সংসার করব। ইন্দ্র না এলে ফাঁকা ফাঁকাই লাগে।

একটা মেয়ে যে বয়সে ছেলেদের বিশেষ নজরে দেখতে শুরু করে, বন্ধুদের মধ্যেকার আলোচনাগুলো আরো রোমাঞ্চকর আরো গোপনীয় হয়ে ওঠে, সেই বয়স আসার আগের থেকেই তাকে জানানো হয়েছে, ইন্দ্রর সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করা আছে। তার মত কেউ তাকে জিজ্ঞাসাও করেনি, আর সেও তো কখনো অন্য কিছু বলেনি। ইন্দ্রকে তো সে চেনে ছোটোবেলা থেকে, দাদার বন্ধু হিসেবে তাদের বাড়িতে ইন্দ্রর যাতায়াত অনেক দিনই। পুরুষ যে সব অর্থে সুপুরুষ বলে গণ্য হয়, সে অর্থে ইন্দ্র সুপুরুষ। একটু মোটা এই যা। ইনশিয়োরেন্স কোম্পানিতে ইন্দ্র বড়ো চাকরি করে। ইন্দ্রদের পরিবার এক সময় এই এলাকার জমিদার ছিল। জমিদারি আর নেই, মাঝেরপাড়ায় পুরোনো বিশাল বাড়িটা আছে আর জমিদারি রূপটা আছে। আজ ইন্দ্র একটা ভারী নীল বুশশার্ট পরে এসেছে,

কী সুন্দর লাগছে! এই যে বন্ধুরা তার আর ইন্দ্রের ব্যাপারটা নিয়ে এত পেছনে লাগে, সে বোঝে এর ভেতরে একটা হিংসের ব্যাপারও আছে। ইন্দ্র জমিদারবাড়ির ছেলে, আর সে টাউনের একমাত্র বিলেত ফেরত ডাক্তারের একমাত্র মেয়ে, তাদের ব্যাপার নিয়ে গোটা টাউনে আলোচনা হবে—এটা তাকে সহ্য করতে হবে, এটা মা-ই তাকে বুঝিয়েছে।

ইন্দ্রর মা শুভ্রা মাসিমা আর তার মা ছোটোবেলার বন্ধু, এই দুজনে মিলেই তাদের ভবিষ্যৎ ঠিক করে দিয়েছে। মাঝে মাঝে নিজের মধ্যেই একটা প্রশ্ন তৈরি হয়, যদি তাকে বেছে নিতে বলত কেউ, তা হলে কি সে ইন্দ্রকে বাছত? প্রশ্নটাকে সে কোনোদিনই প্রশ্রয় দেয়নি।

পাশাপাশি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছে, ইন্দ্রর পাশে তাকে একদম ছোটোখাটো দেখায়। কিন্তু ইন্দ্রর মুখটা ভীষণ সরল সরল, একদম বাচ্চাদের মতো। ইন্দ্রর চোখে একটা অসহায়তা আছে। এই যে ইন্দ্র তার পাশে বসে তার সব কথা বলে—তার নিজের কথা, অফিসের কথা, ফুটবলের কথা। বোধহয় তাকে সব কথা বলে নিশ্চিন্ত হতে চায়। ইন্দ্র তার কাছে আশ্রয় চায়। ইন্দ্রর জন্য তার কেমন একটু কষ্ট হয়, বেচারি বড়ো অসহায়।

তবে ইন্দ্রর কোনো দুঃখ নেই, ইন্দ্রর কোনো অভিযোগ নেই, ইন্দ্র সব সময় খুশি। সেও ইন্দ্রকে সব সময় খুশির কথাই বলে। তার দুঃখ, তার হতাশা, এ সব বিষয় সে কখনো জানায়নি। জানায়নি অন্য কোনো কারণে না, সে দুঃখ পাচ্ছে জানলে ইন্দ্র বড়ো অস্থির হবে এর জন্যই। মোহনবাগান ক্লাব এই টাউনে কখনো আসেনি এটাই যার কাছে সব চেয়ে বড়ো দুঃখ, তাকে অন্য কথা বলে মন খারাপ করিয়ে কী লাভ।

মাঝে মাঝে তার অবাকই লাগে, ইন্দ্র যখন তার হাজারটা সমস্যার কথা বলে, সে সেগুলো মন দিয়ে শোনে, নিজের বিচারবুদ্ধি মতো পরামর্শ দেয়। আর তার থেকেও অবাক কাণ্ড হল, ইন্দ্র সে-কথা মন দিয়ে শোনে না কেবল, অক্ষরে অক্ষরে মেনেও নেয়। ইন্দ্র তাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করে। যে মানুষের সঙ্গে জীবন কাটাবে সে তাকে এতটা বিশ্বাস করে, সে তো ভাগ্যবান। সে যেখানে নিয়ে যাবে চোখ বুজে ইন্দ্র চলে যাবে, এর থেকে বেশি আর কী বা চাইবার থাকতে পারে। জীবনের পথে সহযাত্রী না-কি অনুসরণকারী, সে কী চেয়েছে সে-প্রশ্ন এখন তার কাছে অবান্তর।

ইন্দ্র চলে যাবার পর পড়ার টেবিলে বসে বইপত্র নাড়াচাড়া করতে করতেই টের পায়, চেম্বারের কাজ শেষ করে বাবা ওপরে উঠে আসছে। সে জানে,

জামাকাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে ইজিচেয়ারে বসতে বাবার মিনিট পনেরো কুড়ি সময় লাগবে। তারপর কালীদি বাবার জন্য চা নিয়ে আসবে, আর কালীদির পেছন পেছন সে ঢুকবে। এই সময়টার জন্য প্রতিদিনই অপেক্ষা করে থাকে, এ তার বড়ো ভালো লাগার সময়।

সারাটা দিন তার যত ভালো না লাগা, জানে এবার আস্তে আস্তে কেটে যাবে। সে যেন ঘুম না আসা একটা বাচ্চা মেয়ে, বাবা তাকে রূপকথার গল্প বলে ঘুম পাড়াচ্ছে। কিন্তু বাবার এই জগৎটা কোনো কল্পনার জগৎ না, ধরাছোঁয়ার মধ্যেই তা আছে ; এই টাউনের চৌহদ্দির বাইরে, তার এখনকার চব্বিশ ঘণ্টার বাইরেই। বাবা তাকে কল্পনা করতে শেখায়। বাবা তাকে লোভ দেখায়, একটা নতুন জীবনের লোভ, বদলে কেবল তার এই ছোটো পুরোনো জীবনের সামান্য যেটুকু জমা সেটুকুকে হারাতে হবে। কোনো কথা না বলে বাবা তার চোখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে জিজ্ঞাসা করে, পারবি না মিলি? তার কেমন যেন ভয় করে। বারবার মনে হয়, বাবা যতটা সহজ বলছে, কাজটা অত সহজ না। তা হলে বাবা নিজে পারল না কেন?

বাবার সঙ্গে তার এই গল্প করাটা চলে অনেকক্ষণ। প্রথমে ভূষণদা জানিয়ে যায়, খেতে দেওয়া হচ্ছে ; তারপর কালীদির সংক্ষিপ্ত ঘোষণা, মা ডাকছে। এরপর খোদ মা-র প্রবেশ। আজ কেন জানি মা-র মেজাজ খারাপ, এসেই পড়ল তাকে নিয়ে। এই যে সে পড়াশুনা ছেড়ে সারাদিন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই দিয়ে শুরু। আর তার যদি হাতে এতই সময়, তবে সে কেন বাড়ির কাজে একটু হাত লাগায় না, তা হলে মা একটু জিরোতে পারে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজেই মুখ বুজে খেতে চলে যাওয়াই রেহাইয়ের একমাত্র রাস্তা।

রাতে ঘুমোতে যাবার আগে মা তার ঘরে একবার আসবেই। মা না এলেই তার কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। মা এলে সারাদিন বাড়িতে, পাড়াতে, এমনকী টাউনে যা-যা হয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাওয়া যায়, সেও সাধ্যমতো তার জানা খবরগুলো দেয়। তবে আজকাল সুযোগ পেলেই মা তাকে আদর্শ সংসার ধর্ম কাকে বলে, তা বোঝাবার চেষ্টা করে। যদিও নাকি শুভ্রা (মানে ইন্দ্রর মা) বলেছে, তাদের বাড়ির বউদের গায়ে আগুনের আঁচ লাগতে দেওয়া হয় না, তবুও একটি মেয়েকে শ্বশুরবাড়িতে যাবার আগে ঘরকন্নার সব কাজ পারার মতো করে তৈরি হতে হয়। ধর, কাল যদি ইন্দ্রকে একটা বড়ো চাকরি পেয়ে কলকাতায় চলে যেতে হয়, তবে তো তাকেই সংসারের সব কাজ করতে হবে। মা-র কোনো কথাতেই সে আপত্তি করে না, সে মুখ বুজে সব কথা শুনে

যায়। এবার মা তার চুল নিয়ে পড়বে। ছোটোবেলা থেকেই মা রাতে তার চুল আঁচড়ে দেয়। এটা তার বড়ো ভালো লাগে। রূপচর্চার জন্য মা তাকে সারাদিন যা-যা করতে বলেছে, সেগুলোর ব্যাপারে এবার খোঁজখবর শুরু হয় এবং যথারীতি তার অর্ধেকের বেশিই সে করতে ভুলে গেছে। এবার মা রেগে যাবে। আর যত রাগবে, চুলের ওপর টান তত বাড়বে। এক সময় ব্যাথায় সে চেঁচিয়ে উঠবে, কি হচ্ছে মা? ব্যথা লাগছে তো।

সে বাজি ধরতে রাজি, এই টাউনে তার মা-র মতো সুন্দরী আর কেউ নেই। দিদিমা তো রীতিমতো ঠেস দিয়ে বলে, সে নাকি মায়ের কিছুই পায়নি, সে নাকি বাবার মতো কাঠ-কাঠ। সে ঝাঁঝিয়ে উত্তর দিয়েছে, 'কাঠ-কাঠ তো ভালো। বাবা খারাপ দেখতে নাকি? অন্তত তোমার বাকি জামাইদের থেকে দেখতে অনেক ভালো।'

মা-র রাগও কমে আসে তাড়াতাড়ি। গলা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করে,

—হ্যাঁ রে, এই যে ইন্দ্র এসেছিল, কী বলল তোকে?

—কী আর বলবে। যা বলে, তাই বলল।

সে দায়সারা উত্তর দিল।

—শোন মিলি, ছেলেটা বড়ো ভালো। ভালো করে আদর যত্ন করিস, এ রকম বাউন্ডুলেপনা করিস না। শুনে রাখ, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ মানুষ বড়ো পাল্টে যায়, চোখের আড়াল হতে দিস না। অনেক কষ্ট করে এই বিয়ে ঠিক করেছি। কম কথা শুনতে হয়েছে আমাকে এর জন্য! তোর ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমি মুখ বুজে সব সহ্য করেছি। শোন, তোর বাবা জানে না, অনঙ্গ পণ্ডিতকে দিয়ে তোর কোষ্ঠী করিয়েছি, লেখা আছে তাতে তুই রাজরানি হবি।

মা এই সময় তাকে আদর করে। 'আয় তো দেখি কাছে। হুঁ, বললেই হল, তোকে খুব ভালো মানাবে ইন্দ্রের পাশে।'

মা তার কপালে চুমু খায়, 'কিন্তু তুই ও বাড়ি চলে গেলে, আমার যে দিন কী করে কাটবে?'

মা-র সব কথাই এখন শেষ হয় এই কথা দিয়ে। মনে মনে মা তাকে বিদায় জানিয়েই দিয়েছে। কিন্তু এই বিষয় নিয়ে সে এখনো নিজের সঙ্গেই কোনো বোঝাপড়ায় আসেনি। এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতেও চায় না। ভাবতেই পারে না তাকে পাকাপাকি ভাবে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। বাবাকে ছেড়ে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। বাবাকে ছেড়ে ইন্দ্রদের বাড়িতে চলে যাওয়া মানে সারা জীবনের জন্য বন্দিদশা মেনে নেওয়া।

ইন্দ্রকে সে ভালোবাসে। ইন্দ্রর সব কিছু নিয়েই ভালোবাসে। ইন্দ্র ছাড়া আর কেউ তার জীবনে আসেনি, সে খুশি ইন্দ্রকে নিয়ে। সে তৈরি, সারাটা জীবন ইন্দ্রর সঙ্গেই কাটাতে চায়। জীবনে একবারই ইন্দ্র তাকে স্পর্শ করেছিল। প্রথম একটু ভয় করেছিল ; কিন্তু তারপর, তার ভালো লেগেছিল, ভীষণ ভালো লেগেছিল। সেই ভালোলাগাকে সে লোভীর মতো বারবার ফিরে পেতে চায়, পারলে আজ রাতেই। ইন্দ্র বড়ো সরল, ইন্দ্র বড়ো অসহায়। নিজের বুক দিয়ে সে ইন্দ্রকে আড়াল করে রাখবে, সব বিপদ থেকে। কিন্তু এই সব সত্ত্বেও ইন্দ্র তো বাবা নয়।

তার প্রথম প্রথম মনে হত ইন্দ্রকেও বাবার কাছে নিয়ে যাবে। তার মতো বাবা ইন্দ্রকেও বোঝাবে, জীবন মানে কী। তার মতো ইন্দ্রও স্বপ্ন দেখবে, কল্পনা করতে শিখবে। পরে সে বুঝেছে, এটা হবার নয়। ইন্দ্র বোধহয় বাবার কথা বুঝবেই না, ফুটবল ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে স্বপ্ন দেখার কথা সে ভাবতেই পারবে না। তা ছাড়া বাবার ব্যাপারে ইন্দ্রর কেমন যেন একটা অস্বস্তি, বাবাকে এড়িয়ে যেতে চায়। নাকি সে সারাক্ষণ 'বাবা বাবা' করে বলে ইন্দ্র মনে মনে বাবাকে হিংসে করে, বাবাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। না, ছি! ইন্দ্র এ রকম না। কিন্তু আজ যদি তার সামনে এসে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করে, তার জীবনের এক নম্বর মানুষটি কে? ইন্দ্রকে খুশি করার জন্য তাকে মিথ্যা কথা বলতে হবে।

## ॥ চোদ্দো ॥

গোটা বাড়ির মধ্যে বাবার পড়ার ঘরটাই তাকে সবচেয়ে বেশি টানে, সেই ছোটোবেলা থেকেই। সাধারণত বাবা দুপুরে রোগী দেখতে বেরিয়ে যেত, দুপুরবেলায় মা না-ঘুমিয়ে পারে না, মা-র দেখাদেখি কালীদিও রান্নাঘরের মেঝেতে সটান, ভূষণদাও বেরিয়ে যেত এদিক-ওদিক আড্ডা মারতে, দাদা স্কুলে। তাকে এখন বকাবকি করার কেউ নেই, এই সুযোগে সে বাবার পড়ার ঘরে। এ ঘরে হাজারটা আকর্ষণের জিনিস—টেবিলের ওপর লোহার ভারী সৈনিকের মূর্তিটা (বাবা বলে নাইট), অদ্ভুত দেখতে দোয়াত, কোণের টেবিলে রাখা গ্রামোফোন, ড্রয়ারে রাখা রেকর্ডের খাপে সাহেব আর মেমদের ছবিগুলো, এ রকম আরো কত কিছু। অবশ্য বাবার বইগুলোকে সে ভয় পেত, কারণ ওখানে কঙ্কালের ছবি আছে।

এখন বয়স হয়েছে, কিন্তু ওই ঘরটার প্রতি তার আকর্ষণ এখনো। দুপুরে কিছু করার না থাকলে সময় কাটানোর জায়গা তার ওই ঘরই—শুধু আগের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে আসতে হয় না, এই যা। সে বরং অগোছালো ঘরটাকে একটু গুছিয়ে রাখার চেস্টা করে।

কলেজের ছুটি ছিল, বাবার পড়ার ঘরে ঢুকে সে আবিষ্কার করল ওপরের দিকে বইয়ের র‍্যাকে দুটো চড়াই বাসা বানাচ্ছে। তাড়া দিতেই চড়াই দুটো পালাল, কিন্তু বাসাটাকে কী করবে? অত উঁচুতে তার হাত যাবে না। বারান্দায় বেরিয়ে দুবার ডেকেও সাড়া না পেয়ে বুঝল ভূষণদা আড্ডা মারতে বেরিয়ে গেছে। একটা লম্বা মতো কিছু পেলে খুঁচিয়ে বাসাটা ফেলে দেওয়া যায়, কিন্তু যদি এর মধ্যে ডিম বা বাচ্চা থেকে যায় তবে সে-সব মেঝেতে পড়লে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। চেয়ারে দাঁড়িয়েও সে ভালো করে হাত পাচ্ছিল না। আর একটু চেস্টা করতে যা হল, তার ভয়ই সে পাচ্ছিল। বাসাটাকে নিয়ে বইটা

পড়ল মেঝেতে। তার ভাগ্য ভালো, ডিম বা বাচ্চা কিছুই হয়নি। কিন্তু এত উঁচু থেকে ভারী বইটা পড়ল, বইয়ের কিছু হলে বাবা তাকে আস্ত রাখবে না। বইটা তুলতে গিয়ে ছবিটা বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। বইটা পুরোনো, ছবিটাও তাই, রংটা কিছুটা হলদেটে হয়ে গেছে। অল্পবয়সি মেমসাহেবের ছবি। একটা বড়ো বাড়ির গেটের বাইরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, বুকের সামনে ডান হাতে কয়েকটা বই। পুরোনো আমলের ইংরেজি সিনেমার নায়িকাদের মতো কোঁকড়ানো চুল, মুখটা মিষ্টি মিষ্টি। বাবার পুরোনো বইয়ের মধ্যে এটা কার ছবি? ছবিটা উলটোতে যার ছবি, তার নামটা জানা গেল। একটা অদ্ভুত পাকানো পাকানো হাতের লেখা, সে কষ্ট করে পড়তে পারল—টু স্বদেশ উইদ লাভ, এমিলি। তারিখ লেখা, ২৮শে এপ্রিল, ১৯৩৫। কে এই এমিলি? বোঝাই যাচ্ছে বিলেতের কেউ, কিন্তু বাবার কাছ থেকে যে বিলেতের এত গল্প সে শুনেছে, কই এই নামটা তো শুনেছে বলে মনে পড়ছে না? বাবা যার বাড়িতে কিছু দিন পেয়িংগেস্ট ছিল, তার নাম মিসেস এলমার। এ নিশ্চয়ই মিসেস এলমার নন, কারণ তার তো বয়স অনেক বেশি হবে। তা হলে এ কে?

রাতে বাবার হাতে ছবিটা দিতে, বাবা প্রথমে কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। অনেকক্ষণ ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর জিজ্ঞাসা করল,

—তুই এই ছবিটা কোথায় পেলি?

ছবিটা সে কোথায় পেয়েছে বলবার পর বাবা কোনো কথা না বলে ছবিটা টেবিলের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দিল। ঠিক এর জন্য সে সারাটা দিন অপেক্ষা করছিল না।

—বাবা, এটা কার ছবি গো?

—ওই, আমাদের সঙ্গে পড়ত।

বাবার দায়সারা উত্তর।

—এর কথা তো কখনো বলোনি আমায়?

—আমাদের সঙ্গে তো কত লোক পড়ত, অনেক মেয়েও পড়ত। তাদের সবার কথা কি তোকে বলেছি। ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের কথাই তোকে বলেছি।

যে তার নিজের ছবির তলায় 'স্বদেশ উইদ লাভ' লিখে উপহার দেয়, সে একদম ঘনিষ্ঠ ছিল না?

—উনি এখন কোথায়?

এই সামান্য কথাটা বাবাকে যেন একটা ধাক্কা দিয়ে গেল। অদ্ভুতভাবে বাবা তাকিয়ে রইল তার দিকে। তার কেমন ভয় লাগছিল, সে কি অন্যায় কিছু বলে বসল? কিছুক্ষণ পরে বাবাই বলল,

—আমি জানি না।

ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক করতে সে হালকাভাবে জিজ্ঞাসা করল,

—পাশ করার পর আর যোগাযোগ হয়নি?

—পাশ করার আগেই ও চলে গিয়েছিল।

এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে বাবার কিছু একটা অস্বস্তি হচ্ছে, কাজেই এই ব্যাপারে আর কথা বাড়াব না, এটা ঠিক করা সত্ত্বেও মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,

—কেন?

—পড়াশুনা ছেড়ে ও স্পেনে চলে গিয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের হয়ে যুদ্ধ করতে।

স্পেন? ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড? কথাগুলো চেনাচেনা। মনে পড়েছে, বাণীদি পড়াচ্ছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকা। স্পেনের প্রজাতন্ত্রীদের সঙ্গে জেনারেল ফ্রাংকোর বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ। ফ্রাংকোর হয়ে নেমেছিল হিটলারের আর মুসোলিনির বাহিনী, অন্য দিকে পৃথিবীর নানা দেশের স্বেচ্ছাসেবীরা ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড তৈরি করে লড়াই করেছিল স্পেনের প্রজাতন্ত্রীদের পক্ষে। প্রজাতন্ত্রীরা হেরে গিয়েছিল সে যুদ্ধে।

এই মিষ্টি দেখতে মেয়েটা গিয়েছিল হিটলারের বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে?

—বাবা, তারপর?

—তারপর? ওখান থেকে আমাকে তিনটে চিঠি লিখেছিল, শেষ চিঠিটা মাদ্রিদের কাছের হারামা নদীর পাশে ভাসিয়ামাদ্রিদ বলে কোনো একটা জায়গা থেকে লিখেছিল। ব্যাস, আর কোনো চিঠি আসেনি।

—তোমরা খোঁজ করোনি?

বাবা যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো জবাব দিচ্ছে।

—মাস খানেক পর থেকে খোঁজ করতে শুরু করি। তখন তো আর এত টেলিফোন ছিল না। ব্রিটিশ ফরেন অফিস তো স্বীকারই করল না, তাদের ওখান থেকে কেউ স্পেনে যুদ্ধ করতে গেছে। অথচ রোজ কাগজে খবর বেরোচ্ছিল, ইংল্যান্ডের দু-চারজন বিখ্যাত লোকের যুদ্ধে মারা যাবার খবরও ছিল। ও যে পার্টির সাথে যুক্ত ছিল সেই আইরিশ সোশ্যালিস্ট লিগের লন্ডনের অফিসে খোঁজ করলাম, ওরা কিছু বলতে পারল না। ওদের কথামতো গেলাম গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে। ওখানে স্পেনের যুদ্ধে যারা গেছে, তাদের খোঁজখবরের জন্য আলাদা একটা অফিস খুলেছিল। ওরাও কোনো খবর দিতে পারল না, বলল নাম আর পরিচয় লিখে দিয়ে যান, কোনো খবর পেলে

জানিয়ে দেব। প্রতি সপ্তাহে যেতাম খোঁজ করতে, কোনো খবর পেতাম না। শুধু দেখতাম, ওদের বোর্ডে মৃত লোকদের নামের লিস্টটা কেবল বড়ো হচ্ছে। ওরাই বলল, হারামার যুদ্ধের বিস্তৃত রিপোর্ট বেরিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে। লাইব্রেরি থেকে কাগজটা খুঁজে বার করলাম। ও যে বাহিনীতে নার্সের কাজ করছিল সেই কনোলি কলামের কথাও আছে সে-রিপোর্টে, ওই যুদ্ধে কনোলি কলাম নাকি প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে।

তাও এখানে ওখানে আরো খোঁজ করেছি, যদি কেউ খবর দিতে পারে। আর এদিকে আমারও দেশে ফেরার সময় হয়ে আসছিল। একটা সময় বুঝলাম ও আর ফিরবে না।

সে নিশ্বাস বন্ধ করে শুনছিল,

—বাবা, এর কথা তুমি আমায় আগে বলোনি কেন?

বাবা কেমন করে যেন হাসল,

—শোন, প্রত্যেক মানুষের জীবনে এমন কিছু কথা থাকে, যা সে সারা জীবন নিজের কাছেই রেখে দিতে চায়। আর ফেরার জাহাজে উঠে নিজের মনেই ঠিক করে নিলাম, ও নেই, ও আর ফিরবে না। দেশে ফিরে আবার নতুন করে জীবন শুরু করব, সেখানে এমিলি বলে কেউ আর আসবে না।

কথাটা তার কানে বাজল বিদ্যুতের মতো। বাবা 'এমিলি' বলল, তাকে ঠিক যেভাবে মিলি বলে ডাকে সেই ভাবে। বাবার ইজিচেয়ারের সামনে মাটিতে বসে পড়ে সে বলল,

—বাবা সত্যি কথা বলো, তুমি আমার নাম মিলি নাম দিয়েছ এমিলির জন্য।

বাবা হাসল ঠিক সেভাবে, যে হাসি দেখার জন্য সে মরে যেতেও রাজি!

—বল, নামটা সুন্দর না?

সে আর্তনাদ করে উঠল,

—বাবা, তুমি এমিলিকে ভালোবাসতে।

ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে বাবা বলল,

—বলে না রে মা, এই সব কথা বলতে হয় না। এই যে দেখছিস আমি আর আমার চারদিকের সব কিছু নিয়ে সাজিয়ে বসেছি, একথা বললে এই সব কিছু ভেঙে খানখান হয়ে যাবে।

বাবা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলছিল,

—ঠিকই বুঝেছিস, তুই-ই আমার এমিলি।

বাবা, এমিলির গল্প বলেছিল।

বাবা বলেছিল আগেই, ও-দেশের সাহেবরা সাধারণভাবে বেশ ভদ্রই। কিন্তু এই ভদ্রতার মধ্যেই ওরা বুঝিয়ে দেয়, কালো চামড়ার লোকেরা দ্বিতীয় শ্রেণির, ওদের সমান নয়। অথচ এমিলি এসে প্রথম দিনই আলাপ করেছিল, বলেছিল ও ভারতীয়দের পছন্দ করে। নিজের সম্পর্কে বলেছিল, ও আইরিশ। তাদের মতোই এই প্রথম ইংল্যান্ডে এসেছে ডাক্তারি পড়তে, পড়া শেষ করেই আবার দেশে ফিরে যাবে। ওর পুরো নাম এমিলি ও'ব্রিয়েন। আর ও ইংরেজদের অপছন্দ করে।

একটা অপরিচিত দেশ, একটা অপরিচিত পরিবেশ, তার ওপর সাহেবদের নাকউঁচু হাবভাব, তার মধ্যে নিজের থেকে এগিয়ে আসা এ রকম একটা মেয়ে। বন্ধুত্ব হতে দেরি হয়নি।

বাবা বলেছিল, এমিলির নাকি রক্তে রাজনীতি ছিল। এমিলির কোনো এক পূর্বপুরুষ উইলিয়াম ও'ব্রিয়েন নাকি আয়ারল্যান্ডের খুব বড়ো নেতা ছিলেন। আয়ারল্যান্ডের মানুষকে তাদের নিজেদের জমির অধিকার ইংরেজদের সাথে লড়াই করে তিনিই ফিরিয়ে এনেছিলেন। আয়ারল্যান্ডের মানুষ তাকে জাতির পিতার মতো শ্রদ্ধা করে।

—আমি রাজনীতি নিয়ে কোনোদিনই খুব একটা মাথা ঘামাইনি। এমিলিই আমাকে রাজনীতির দিকে তাকাতে শিখিয়েছিল। ইংরেজ সাহেবদের খুব একটা পছন্দ করতাম না, কেই-বা পছন্দ করত? কিন্তু এমিলি যেটা করত, তা এক কথায়, ঘেন্না। আমি তোকে বোঝাতে পারব না, সেই ঘেন্নার তীব্রতা কতটা। কখনো-কখনো হয়তো আমি আপত্তি করতাম, উল্টে আমায় বকাবকি করত। বলত, তুমি জানো না ইংরেজরা আমাদের কত ক্ষতি করেছে। এমনকী তুমি এটাও ভালো করে জানো না, ইংরেজরা তোমাদের কত ক্ষতি করেছে, এবং এখনো করছে।

সত্যি বলছি, এমিলির চোখ দিয়ে আমি আবার নিজের দেশকে বুঝতে শুরু করেছিলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'স্বদেশ' কথাটার মানে কি। যখন বললাম 'স্বদেশ' মানে নিজের দেশ, তখন কী উত্তেজিত। বলল, তোমাদের ভাষা কত সমৃদ্ধ। কোনো ইউরোপীয় ভাষা তার মানুষকে এত সুন্দর নাম দিতে পারবে না। তোমার বাবা-মাও কত চিন্তাভাবনা করেছেন তোমাকে নাম দিতে গিয়ে। আমি কী করে বোঝাই, বাংলাদেশে এ রকম স্বদেশ শয়ে শয়ে আছে। ও এরকমই ছিল, সামান্য ব্যাপারেই বাচ্চাদের মতো খুশি, আবার পর মুহূর্তেই মনে হত, গোটা পৃথিবীর সব দুঃখের বোঝা ওর একার ওপর।

ক্লাসে প্রফেসার নিউট্রিশন পড়াচ্ছেন, পড়াতে পড়াতে বলেছেন, ম্যালনিউট্রিশনের অন্যতম কারণ জন্মগত দুর্বলতা আর অশিক্ষা। লাফিয়ে উঠল এমিলি, প্রফেসরের সঙ্গে তুমুল তর্ক। ওর বক্তব্য, এক দল মানুষের লোভের জন্যই অন্যরা অপুষ্টিতে ভোগে। এক সময় প্রফেসার ধমক দিতে, এমিলি বলে উঠল, আপনি কখনো দুর্ভিক্ষ দেখেননি তাই ম্যালনিউট্রিশন কাকে বলে জানেন না। বলে কাঁদতে কাঁদতে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল।

ক্লাসের পর তাকে আবিষ্কার করলাম কলেজের পেছনে বাগানে, গুম হয়ে বসে আছে। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, ওই স্কাউন্ড্রেল ইংরেজটার ক্লাস এতক্ষণ ধরে করলে কী করে? আমি একটু রেগে গিয়ে বলেছিলাম, সব কিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি কোরো না। অদ্ভুতভাবে হেসে বলল,

—বাঃ, ইংরেজদের সঙ্গে থাকতে থাকতে কেমন ইংরেজদের মতো করে ভাবতে শিখেছ। বাড়াবাড়ি আমি করছি? শোনো স্বদেশ, মন দিয়ে শোনো। ১৮৪৫ থেকে ১৮৪৯, এই চার বছরে আমার দেশের দু মিলিয়ন মানুষ না খেতে পেয়ে মারা গেছে। প্রতি পাঁচ জন আইরিশের মধ্যে একজন মরে গিয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এর থেকে তীব্র দুর্ভিক্ষের কোনো নজির নেই। আর না খেতে পেয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল আরো এক মিলিয়ন লোক। আর ওই ইংরেজ লোকটার কাছ থেকে আমাকে ম্যালনিউট্রিশনের কারণ শিখতে হবে? এই সব কিছুর জন্য দায়ী ইংরেজরা। একদিন গোটা পৃথিবী জানবে, ইংরেজরা কীভাবে গোটা আইরিশ জাতিটাকে মুছে দিতে চেয়েছিল। শোনো, দুশো বছরের পরিকল্পনার ফল এই দুর্ভিক্ষ। ১৬৪৯ সালে ক্রমওয়েল আমাদের দেশ দখল করল। আমাদের অপরাধ, আমরা নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াই করেছিলাম, তাই আয়ারল্যান্ডকে শাস্তি দেওয়া হল। আমাদের আইরিশদের অধিকাংশ জমিই কেড়ে নেওয়া হল। জমিগুলো দিয়ে দেওয়া হল ইংরেজ আর তাদের পেটোয়া কিছু লোকজনকে এবং গোটাটা করা হল ধর্মের নাম করে, অধিকাংশ আইরিশ ক্যাথলিক আর ইংরেজরা প্রোটেস্টান্ট। ক্যাথলিকদের জমি নিয়ে দিয়ে দেওয়া হল প্রোটেস্টান্টদের। এখানেই শেষ না। আমাদের দেশেও ভারতবর্ষের মতো যৌথ পরিবার। পরিবারের জমি ভাগ হয় না, বাবার জমি পায় বড়ো ছেলে আর তার দায়িত্ব গোটা পরিবারের দেখাশোনা করা। হাজার বছর ধরে এভাবেই আমাদের সমাজ চলেছে। ওরা এই আইন পাল্টে দিল। ইংরেজদের মতো ধূর্ত আর কেউ না। ওরা আইন করল, বাবার জমি সমান ভাগ করে দেওয়া হবে সব সন্তানের মধ্যে। এমনিতেই জমি অল্পই ছিল, এই

আইনের ফলে সেই জমিও টুকরো টুকরো হয়ে ভাগ হয়ে গেল। অত ছোটো জমিতে তো চাষ করে বেঁচে থাকতে পারে না কেউ, বড়ো ইংরেজ মালিক আর তাদের তাঁবেদার জমিদাররা সেই সব জমি জলের দরে কিনে নিল।

ইংরেজরা আমাদের বাধ্য করল আলুর চাষ করতে। আলু তখন সবে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ইউরোপে এসেছে এবং আমরা শুধু আলুর চাষই করতাম। তারও একটা বড়ো অংশ বাইরে রপ্তানি হত। ওই সময় আলু গাছে মড়ক লেগেছিল। মানুষের হাতে খাবার কেনবার কোনো পয়সা ছিল না। আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে খাবার কিনতাম, ওরা সব দেখেও হাত গুটিয়ে বসে রইল। এখানেই শেষ না, যেটুকু আলু হয়েছিল সেটুকুও ওরা জোর করে নিয়ে চলে গেল। অসহায়ভাবে আমরা না খেতে পেয়ে মরলাম।

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম,

—সরি এমিলি, আমি জানতাম না।

—আমি জানি, তুমি জানতে না। আয়ারল্যান্ডের ইতিহাস তুমি জানবে কি করে। কিন্তু নিজের দেশের ইতিহাস ভুলে যাবে কেন? ইংরেজরা আফগানিস্তান দখল করার জন্য যুদ্ধ করল, আর তার জন্য তোমাদের ম্যাড্রাস প্রেসিডেন্সির তিরিশ মিলিয়ন মানুষ না খেতে পেয়ে মরে গেল।

আমি কোন লজ্জায় বলি—আমি এ কথা জানি না, আমাকে কেউ এ কথা বলেনি। আমি চুপ করে রইলাম,

—আমি আর পি ডাটের লেখায় পড়েছি, তোমাদের ইন্ডিয়ানদের গড় আয়ু তেইশ বছরেরও কম, আর ইংরেজদের প্রায় পঞ্চাশ। এরপর ওরা ম্যালনিউট্রিশন নিয়ে লেকচার দেবে এবং তুমি খাতা ভরে তার নোট নেবে।

এরপর হঠাৎ চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ পরে বলল,

—তুমি আমার পাশে এসে বোসো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। কয়েকদিন থেকেই ভাবছিলাম তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

আমি বাধ্য ছাত্রর মতো ওর পাশে গিয়ে বসলাম,

—স্বদেশ, এখনও পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ পেট ভরে খেতে পায় না। আমি আর তুমি দু জনে মিলে কিছু করতে পারব না। কিন্তু ডাক্তার হিসাবে আমরা তো এদের কিছুটা সাহায্য করতে পারি। বড়োলোকদের জন্য অনেক ডাক্তার আছে, কিন্তু এদের জন্য কেউ নেই। চলো, আমরা সারাটা জীবন এদের জন্য কাজ করি। সারা জীবন, দুজনে, এক সঙ্গে। তুমি রাজি?

আমি কথাটায় হকচকিয়ে গেলাম। কী বলতে চাইছে এমিলি? আমি যা ভাবছি তাই কি? কিন্তু তা বিশ্বাস করার সাহস আমার নেই।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে খিলখিল করে হেসে উঠে বলল,

—ঠিকই। ফুলও ফোটেনি, পাখিরা গানও গাইছে না, দেবশিশুরাও আকাশ থেকে ফুল ছুড়ছে না। কিন্তু বন্ধু, তোমাকে একজন সম্ভ্রান্ত আইরিশ মহিলা প্রোপোজ করেছেন। সম্মত হলে আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বোসো, আমার হাতটা টেনে নিয়ে খুব আস্তে একটা চুমু খেয়ে বলো, ম্যাডাম আমি কৃতার্থ হলাম।

বাবার মুখে সব দুঃখ ভোলানো সেই হাসি।

—তুই তো এখন বড়ো হয়েছিস মিলি, তুই আমার কথা বুঝবি। সেই মুহূর্তের আগে আমি জানতাম না, এত আনন্দ এক জনের জীবনে হতে পারে। আমার মনের কথা আমি কোনোদিন এমিলিকে বলতে পারব না, এটা আমি ধরেই নিয়েছিলাম। এমিলি সেই কথা নিজে বলছে, আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমার মনে হল এখন আমি একাই গোটা পৃথিবীর সব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারি।

আমার গোটা জীবনটাই এর আগে ছিল হিসেব করা। লেখাপড়ায় খারাপ ছিলাম না, পরিবার মোটামুটি অবস্থাপন্নই ছিল, যদিও আমাকে বিলেতে পাঠানোর খরচ জোগাড় করতে গিয়ে বাবা কিছু সংকটে পড়ে গিয়েছিলেন। তবে সে তো সাময়িক, আমি ফিরে এলেই সব সমস্যার সমাধান। মেডিক্যাল কলেজে চাকরি, বিলেত ফেরত ডাক্তারের কলকাতায় জমজমাট পসার। তারপর বাবা-মা দেখেশুনে কোষ্ঠী মিলিয়ে সুলক্ষণযুক্ত পাত্রীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবেন।

এমিলি এসে আমার জীবনের সব হিসেবপত্র ঝড়ের মতো উড়িয়ে দিল। আমার শুধু একটাই দুশ্চিন্তা ছিল, বাবা-মা ব্যাপারটা কী ভাবে নেবেন। এমিলি আমায় ভরসা দিত, তোমার কোনো চিন্তা নেই, তোমাদের মতো আমরা আইরিশরাও যৌথ পরিবারেই বড়ো হই, তোমার বাবা-মার প্রতি আমার দায়িত্ব আমি পালন করব। আমি জানি ভারতীয় হিন্দুরা খুব গোঁড়া হয়, কিন্তু তোমার কাছ থেকে আমি বুঝেছি, তোমার বাবা মা খুব স্নেহশীল, আমরা গিয়ে সামনে দাঁড়ালে ওঁরা আমাদের সম্পর্ক ঠিক মেনে নেবেন। আমি অবশ্য কিছু বলতাম না, যখন ফিরব তখন দেখা যাবে, এভাবেই রেখে দিয়েছিলাম।

এর আগে ইংল্যান্ডে আমার জীবন ছিল. হস্টেল-কলেজ-হাসপাতাল ব্যাস। এমিলি আমাকে এর বাইরে নিয়ে এল। ওর সঙ্গে আমি ওদের মিটিংগুলোতে যেতে শুরু করলাম। সে এক সম্পূর্ণ অন্য জগৎ। মানুষগুলো কত বন্ধুত্বপূর্ণ,

এমনকী ইংরেজরাও। ও দেশে গিয়েই দেখেছিলাম, আমরা যে রকম ভাবি সে রকম না, ওখানেও গরিব মানুষ  আছে। আর আরো বুঝলাম, ওখানকার গরিবদের সমস্যাও আমাদের দেশের গরিবদের মতোই। বেশ কিছু ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গেও আলাপ হল ওখানে। সবাই উত্তেজিত, সবাই যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে রয়েছে, কিছু একটা ঘটতে চলেছে, আজ কিংবা কাল দুনিয়াটা পালটে যাবে। আমি যেন ওদের মধ্যে গিয়ে নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম।

কিন্তু চারদিকের পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হয়ে আসছিল। হিটলারের জার্মানির খবরগুলো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছিল। অচল অনড় আমাদের অভিজাত মেডিক্যাল কলেজও যেন অস্থির হয়ে উঠল। ডা. উনবার্গ আমাদের পেডিয়াট্রি পড়াতেন, ইহুদি। জার্মানিতে ইহুদিদের দুরবস্থার কথা বলতে গিয়ে ক্লাসে কেঁদে ফেললেন। যে-দিন মুসোলিনির বাহিনী আবিসিনিয়ার যুদ্ধ শুরু করল, এমিলি হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে আবিসিনিয়া নিয়ে ক্লাসে কিছু বলবার অনুমতি চাইল। এবং সবাইকে অবাক করে দিয়ে যিনি পড়াচ্ছিলেন সেই প্রফেসার অনুমতি দিলেন। এমিলি কী বলেছিল, তার থেকেও বেশি আমার মনে আছে, আমার ভয় হচ্ছিল এই বক্তৃতার জন্যই এমিলিকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু কিছুই হল না, উল্টে ক্লাসের ছেলেরা হাততালি দিয়ে এমিলিকে সমর্থন করল। মনে আছে, বাবা চিঠি লিখলেন, আমি যেন সে-রকম বুঝলে দেশে ফিরে আসি, কারণ ডাক্তারি ডিগ্রির থেকে প্রাণের দাম বেশি।

তারপর স্পেন। আমি দেখলাম, এমিলির কথা কতটা সত্যি। পশ্চিমের নেতারা কত বড়ো ভণ্ড। মুখে গণতন্ত্রের কথা, আর ভোটে অপছন্দের লোকরা জিতলেই মধ্যযুগের দাঁত আর নখ বেরিয়ে পড়ে। সামনে পরীক্ষা, কিন্তু সে-সবের পরোয়া না করে আমরা ছুটলাম। মিটিংয়ের পর মিটিং, চাঁদা তোলা, সময় যেন ছুটছে। তারপর অ্যালবার্ট হলের মিটিংয়ে স্পেনের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে যাবার আহ্বান জানানো হল। আমরা বসার জায়গা পাইনি, দোতলায় ব্যালকনির মেঝেতে বসেছিলাম। এমিলি আমাকে মঞ্চে বসা সব বিখ্যাত লোকদের চিনিয়ে দিচ্ছিল, আমি তাঁদের নাম কেবল শুনেছিলাম কখনও দেখিনি। হঠাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে এমিলি বলল, ওই দ্যাখো আর পি ডাট, তোমাদের দেশের নেতা। কোথায় দেশের, এও তো দেখি প্রায় সাহেব। মিটিং যখন শেষ হল, গোটা হল যেন উত্তেজনায় কাঁপছে। সবাই তৈরি স্পেনের জন্য যুদ্ধে যেতে।

ট্রাম থেকে নেমে কিছুটা হেঁটে আমাদের হস্টেল, আগে এমিলির, তারপর আমার। খুব ঠান্ডা আর ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। ওভারকোটে নাক কান

ঢেকে আমরা হাঁটছিলাম কোনো কথা না বলে। নিজের হস্টেলের গেটে পৌঁছে এমিলি বিদায় নেবে। কিন্তু গুডনাইট না বলে এমিলি বলল, 'স্বদেশ, চলো স্পেনে চলো'। কথাটা আমার কাছে এতটাই অপ্রত্যাশিত, আমি চট করে কিছু বলতেই পারলাম না। যখন মিটিংয়ে কথাটা বলা হল আমিও খুব উত্তেজিত হয়েছিলাম, কিন্তু কথাটা আমাদের লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে এটা আমি ভাবিনি। এমিলি কথাটা আবার বলল। এবার আমি বললাম, 'কী বলছ, সামনে আমাদের পরীক্ষা!' এমিলি বলল, 'পরীক্ষা দেবার সুযোগ আমরা আবার পাব, কিন্তু এখনই না বাঁচালে স্পেনের মানুষ আর বাঁচার সুযোগ পাবে না।'

ওই বৃষ্টির মধ্যে মাঝরাত পর্যন্ত আমরা কথা বলেছিলাম। অনুরোধ, উপরোধ, রাগ, ঝগড়া—না, আমি এমিলিকে তার জায়গা থেকে এক চুলও সরাতে পারিনি। বলল, 'স্বদেশ তুমি আমাকে যুদ্ধের ভয় দেখাচ্ছ? বিশ্বাস করো, আমি ভীষণ ভয় পাই যুদ্ধকে। আমার তখন বোধহয় বছর আটেক বয়স, বেশ কিছু দিন হল বাবা আর ছোটোকাকা বাড়িতে নেই। পরে বুঝেছি, ওরা সিন ফিনের হয়ে লড়তে চলে গিয়েছিল। সালটা খুব সম্ভবত, ১৯২১। সকালবেলা থেকে গুলি চলতে শুরু করল, জানালা ভেঙে ঘরের ভেতরে যখন গুলি ঢুকছে, বাধ্য হয়ে মা আমাকে আর ভাইকে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ডাবলিনের অলিগলি দিয়ে আমরা ছুটছি, আমাদের মতো আরো মানুষ পালাচ্ছে। রাস্তাতে গুলি খেয়ে মানুষ পড়ে আছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারদিক। কি করে যে পাশের এক গ্রামে আমরা এক মাসির বাড়িতে গিয়ে পৌঁছেছিলাম জানি না। জানো স্বদেশ, আমি এখনো সেই দৃশ্য রাতে দুঃস্বপ্নে দেখি। আর এত ভয় পাই বলেই তো তোমাকে পাশে চাইছি। ঠিক আছে, আমি জানি তোমার পরিবার কত কষ্ট করে তোমাকে এখানে পড়তে পাঠিয়েছে। তুমি পরীক্ষাটা দাও, তারপর পারলে স্পেনে চলে এসো, আমি তোমার জন্য সেখানে অপেক্ষা করব।'

এমিলি সে দিনই প্রথম আর শেষবার আমায় চুমু খেয়েছিল।

মিলির মনে হল, এতদিন পর্যন্ত তার জীবনটা ছিল সহজ সরল একটা দিনের মতো। হঠাৎ মনে হল, না জীবন অতটা সহজ সরল না, এই জীবনের মধ্যে ছায়া আছে, অন্ধকার আছে, এমনকী পথ ভোলানো ঝড়বৃষ্টিও আছে। তার ঠিক কী মনে হচ্ছে তা সে ভাষায় বর্ণনা করতে পারবে না। তার জীবনে আদর্শ পুরুষ বাবাই, তার চলার পথে বাবাই ধ্রুবতারা। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে কোথাও একটা হিসেবের গন্ডগোল হয়ে আছে। সে যা শুনল, তা তো একজন হেরে যাওয়া মানুষের কথা। এমিলির কথা মা জানে কিনা, সেটা তার আদপেও

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বলে মনে হচ্ছে না। যেটা খারাপ লাগছে, তার আদর্শ মানুষটির অসহায়তা। যাকে সে চিরকাল দেখেছে তার জীবনের সব কিছু সমস্যার শেষ আশ্রয় হিসাবে, আজ আর তাকে অতটা শক্তিশালী মনে হচ্ছে না। কিন্তু মনে হচ্ছে, বাবাকে আগে কোনোদিন এতটা ভালোবাসেনি। আজ সে যতটা ভালোবাসছে।

সে মাথা নামাল বাবার হাঁটুর ওপর, বাবার চোখের দিকে সে এখন তাকাতে পারবে না। সে কেঁদেছিল, এটা জেনেই—বাবার তুলনায় তার আজকের কান্নার দাম কানাকড়িও না। আজ হঠাৎ মনে হচ্ছে, বাবা আর ইন্দ্র একই রকম, বোধহয় পৃথিবীর সব পুরুষ মানুষই।

## ॥ পনেরো ॥

টিচার্সরুমে বাণীদি একাই ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন,

—বল, কী বলছিস?

বাণীদিই কলেজের একমাত্র দিদিমণি, ছাত্রীদের তুই বলেন। তার অবশ্য ভালোই লাগে। ভয় করছিল, তাও ইতস্তত না করেই সে বলে ফেলল,

—দিদি, স্পেনের গৃহযুদ্ধ নিয়ে একটু ভালো করে জানতে চাই।

—স্পেনের গৃহযুদ্ধ? হঠাৎ এ বিষয়ে?

এই প্রশ্নটার জন্য সে তৈরি হয়েই এসেছিল।

—না মানে, একটা গল্পে এই বিষয়টা পড়ছিলাম, তাই ভাবলাম।

—বাঃ, এটা খুব ভালো অভ্যাস। আচ্ছা আগে বল, এ বিষয়ে তুই কতটা জানিস।

দিদিমণিদের নিয়ে এই হল মুশকিল, সব সময় পড়া ধরে।

—খুব বেশি জানি না দিদি, ক্লাসে আপনি যেটুকু পড়িয়েছেন সেটুকু, আর টেক্সট বইয়ে যা আছে। কিন্তু সে তো সামান্য।

—তুই আমাকে সমস্যায় ফেললি, কলেজের লাইব্রেরিতে এ বিষয়ে কোনো বই আছে বলে মনে হচ্ছে না। কলকাতায় গেলে খোঁজ করতে পারি, কিন্তু সেখানেও খুব ভালো কিছু পাব বলে মনে হচ্ছে না। ঠিক আছে, তুই আজ যা। আমি দেখি ছেলেদের কলেজ থেকে কিছু জোগাড় করতে পারি কিনা।

ক-দিন পর বাণীদি তাকে ক্লাসের শেষে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

—শোন, কোনো বই পেলাম না, এদিক-ওদিক যেটুকু জোগাড় করতে পারলাম সেটুকুই বলি।

এরপর কেবল পেছনে ব্ল্যাকবোর্ডটা ছিল না, বাণীদি তার ক্লাসই নিলেন।

—তোকে প্রথমেই একটা কথা বলি, কোনো একটি দেশের ঘটনা যদি বুঝতে

চাস, তা হলে তার পটভূমিকাটা জানতে হবে। ইতিহাস আলাদা আলাদা ঘটনার জোড়াতালি না। ইতিহাস হল সময়ের সুতোতে গাঁথা মালা। ওই সুতোটাকে ধরতে না পারলে ইতিহাস বোঝা যায় না। আমাদের পড়াতেন প্রতুলবাবু, খুব নাম করা ইতিহাসবিদ, উনি আমাদের এভাবেই বোঝাতেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধ বুঝতে গেলে তোকে আগে সেই সময়ের স্পেনের অবস্থা কি ছিল তা জানতে হবে।

ইউরোপের ইতিহাস বলতে আমরা কেবল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স আর জার্মানির ইতিহাসই পড়ি। কিন্তু স্পেন এদের থেকে একটু আলাদা। দেখবি, পৃথিবী দখল করতে প্রথম বেরিয়েছিল পোর্তুগাল আর স্পেন। ইংল্যান্ড, হল্যান্ড আর ফ্রান্স তার পরে। দীর্ঘদিন স্পেনই ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ঔপনিবেশিক শক্তি। কিন্তু ইংল্যান্ড বা ফ্রান্স শিল্পবিপ্লবকে ব্যবহার করে অনেকটা এগিয়ে যেতে পেরেছিল, যেটা স্পেন পারেনি। তুই বুঝবি, আজকের এই আধুনিক সভ্যতা জন্ম নিয়েছিল প্রধানত এই দুই দেশেই। উপনিবেশ থেকে লুট করে আনা বিপুল সম্পদ এখানে আধুনিক শিল্প কলকারখানার জন্ম দিয়েছিল, জন্ম দিয়েছিল আধুনিক পুঁজিবাদের। আর এর হাত ধরেই এসেছিল আধুনিক রাষ্ট্র এবং গণতন্ত্রের ধারণা। এরা ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দিয়েছিল রাজা আর জমিদারদের। কিন্তু নানা কারণে স্পেনে এই পরিবর্তনটা হয়নি। ফলত স্পেন রয়ে গেল মধ্যযুগেই। মধ্যযুগ মানে রাজতন্ত্র, পরম পরাক্রান্ত ক্যাথলিক যাজকরা, অভিজাত জমিদার আর যুদ্ধবাজ সেনাপতির দল--এরাই ছিল স্পেনের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। উপনিবেশ লুঠ করা সম্পদ জমা হত এদের হাতে যা খরচ হত বিলাসের কাজে আর স্পেনের সাধারণ মানুষ পড়ে থাকত দারিদ্রের মধ্যে। বিশেষত কৃষকদের অবস্থা ছিল খুবই করুণ। কিন্তু পরিবর্তনের হাওয়া তো বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা যায় না, কাজেই স্পেনের ভেতরেও পরিবর্তনের পক্ষে জনমত তৈরি হচ্ছিল। তুই যদি স্পেনের ইতিহাস পড়িস দেখবি একশো বছর ধরে এই দুই শক্তির মধ্যে লড়াই চলছিল। স্পেনের গৃহযুদ্ধের দু পক্ষ হল জাতীয়তাবাদী আর রিপাবলিকান। রিপাবলিকান মানে কী? এরা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা দেবার পক্ষে। এরা গণতন্ত্রের পক্ষে, পরিবর্তনের পক্ষে। স্পেনের প্রথম রিপাবলিক তৈরি হয় গত শতাব্দীর শেষের দিকে, ঠিক সালটা আমার এক্ষুনি মনে পড়ছে না। তবে তা বেশি দিন টেকেনি বা টিকতে দেয়নি। ১৯৩১ সালে তৈরি হয় দ্বিতীয় রিপাবলিক। এরা ক্ষমতায় এসে রাজা গির্জা আর জমিদারদের হাত থেকে একচেটিয়া ক্ষমতা কেড়ে নিতে নতুন আইন করতে শুরু করে। তার

মধ্যে একটা আইন একদম ভিমরুলের চাকে ঘা দেয়, নতুন কৃষি আইনে গির্জা আর জমিদারদের জমি নিয়ে তা গরিব চাষিদের মধ্যে বিলি করে দেবার কথা বলা হয়। ব্যাস, ঝাঁপিয়ে পড়ল বড়োলোক অভিজাত জমিদাররা আর গির্জা। এই বড়োলোক জমিদাররাই তো সেনাবাহিনীর কর্তা, কাজেই সেনাবাহিনীর একটা অংশও সরকারের বিরুদ্ধে নেমে পড়ে। এদের দাবি ছিল পুরোনো রাজতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে হবে, বাতিল করতে হবে নতুন সব আইন। আর রিপাবলিকানদের পক্ষে ছিল গরিব চাষি, শ্রমিক, শহরের মধ্যবিত্তদের একটা অংশ, আর বুদ্ধিজীবীরা। আসলে পুরোনো মধ্যযুগের স্পেনের সঙ্গে নতুন স্পেনের লড়াই শুরু হল। কিন্তু রিপাবলিকান সরকার বেশি দিন টেকেনি। দু বছরের মাথায় আবার ভোট, এবার ক্ষমতায় এল পুরোনোপন্থীদের একটা  জগাখিচুড়ি সরকার, কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করেও পুরোনো সরকারের আইনগুলো এরা বাতিল করতে পারেনি। নিজেদের মধ্যে ঝগড়ায় এই সরকারের পতন হয়। কিন্তু স্পেনে তখন প্রায় গৃহযুদ্ধের অবস্থা, রাজনৈতিক হানাহানিতে দু পক্ষেরই হাজার হাজার লোক মরছে। এই অবস্থায় ১৯৩৬ সালের ভোট। এই ভোটে জেতে বামপন্থী জোট পপুলার ফ্রন্ট। এই জোটে ছিল অনেকগুলো বামপন্থী দল, ছিল সমাজতন্ত্রীরা, ছিল কমিউনিস্টরা, বাইরের থেকে সমর্থন করেছিল নৈরাজ্যবাদীরা। সঙ্গে ছিল গ্যালিসিয়া, কাটালানিয়া আর বাস্ক জাতীয়তাবাদীরা। সত্যি সত্যিই এটা ছিল পপুলার ফ্রন্ট। দক্ষিণপন্থীরা বুঝে যায় ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসা তাদের পক্ষে অসম্ভব, আর এই সরকার টিকে থাকলে  তাদের যেটুকু সুযোগ-সুবিধা আছে সেটুকুও যাবে। কাজেই গণতন্ত্রের পথ ছেড়ে সামরিক অভ্যুত্থানের রাস্তা নিল তারা, জেনারেল ফ্র্যাংকোর নেতৃত্বেই সে কাজ শুরু হল। আর বাকিটা তো তোরা পড়েছিস, স্পেনের গৃহযুদ্ধে। তবে তোদের বইয়ে যেটা লেখা নেই তা হল, এই গৃহযুদ্ধে মারা গিয়েছিল ছ লাখেরও বেশি মানুষ, জার্মান যুদ্ধবিমান থেকে ছোঁড়া বোমাতে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল অসংখ্য শহর আর গ্রাম। কেবল জার্মান বোমায় মারা গিয়েছিল কুড়ি হাজার মানুষ। এই গৃহযুদ্ধ ইতিহাসের এক জঘন্য অধ্যায়।

কিন্তু বাণীদির কথায় তো ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের কোনো কথা নেই, যা জানবার জন্য সে এসেছে। সে বাধ্য হয়েই জিজ্ঞাসা করল,

—কিন্তু দিদি স্পেনের গৃহযুদ্ধে বাইরের লোকেরা কেন গিয়েছিল?

তার প্রশ্ন শুনে মনে হল বাণীদি খুশিই হল,

—এই ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে স্পেনের গৃহযুদ্ধকে অন্য যুদ্ধের থেকে আলাদা করে দিয়েছে। যদি আমার মত বলিস, তা হলে আমি বলব, নানা দেশের

স্বেচ্ছাসেবক জড়ো করে আন্তর্জাতিক ব্রিগেড তৈরি করে স্পেনের গৃহযুদ্ধে চলে যাওয়াটা যতটা না ক্রিয়া তার থেকে বেশি প্রতিক্রিয়া। তোকে বুঝতে হবে সেই সময়কার ইউরোপকে। ১৯৩৩-এ হিটলার জার্মানিতে ক্ষমতায় এলেন, ইটালিতে মুসোলিনি আগেই ক্ষমতায় এসেছিলেন। ফ্যাসিস্টরা তাদের উদ্দেশ্য কখনোই ঢেকে রাখেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বদলা তারা নেবে। ইটালি আবিসিনিয়া আক্রমণ করল, হিটলার চেকোস্লোভাকিয়া আর পোল্যান্ডের অংশ দাবি করল, বলল ভার্সাই চুক্তি তারা মানে না। গোটা ইউরোপ আর একটা যুদ্ধের ভয়ে তখন কাঁপছে। এই সময় স্পেনের ঘটনা। স্পেনের ফ্যাসিস্টরা প্রথম থেকেই জেনারেল ফ্র্যাংকোর সঙ্গে ছিল। আর ফ্র্যাংকো সাহায্য চাওয়া মাত্র জার্মানি আর ইতালি ঝাঁপিয়ে পরল স্পেনে। জার্মানি পাঠিয়েছিল তার বিমান আর গোলন্দাজ বাহিনী। এই সাহায্য না পেলে ফ্র্যাংকোর ক্ষমতা ছিল না স্পেন দখল করা। গোটা ইউরোপ তখন চাইছে ইংল্যান্ড আর ফ্রান্স স্পেনে হস্তক্ষেপ করুক। জার্মানি তখনো অতটা শক্তিশালী না, কাগজে কলমে এরা অনেক শক্তিশালী। কিন্তু ইংল্যান্ড আর ফ্রান্স নিরপেক্ষতার নাম করে কিচ্ছু করল না।

—কেন?

অদ্ভুতভাবে হেসে বাণীদি বললেন,

—তোর এই 'কেন'-টা পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন। কারণ এটা পরিষ্কার, স্পেনের বুকে জার্মানিকে একটা উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারলে ফ্যাসিস্টদের বিষদাঁত ভেঙে যেত—বলা যায় না, হয়তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধটা ঠেকিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু স্পেনের রিপাবলিকানদের সঙ্গে কমিউনিস্টরা আছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন রিপাবলিককে সাহায্য করছে, ওরা ধরে নিল স্পেনে কমিউনিস্টদের সঙ্গে ফ্যাসিস্টদের যুদ্ধ হচ্ছে। দুই শত্রুর লড়াই, ওরা তাই নিরপেক্ষ। ওরা একবারও ভাবল না, স্পেনে কোতল হচ্ছে গণতন্ত্র, কোতল হচ্ছে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ।

ইন্টারন্যাশানাল ব্রিগেড তৈরি হয় এই 'নিরপেক্ষতার' প্রতিবাদে। তোমরা সৈন্য পাঠাবে না, তাই আমরা অসামরিক স্বেচ্ছাসেবকরাই যাব স্পেনের মানুষের পাশে দাঁড়াতে।

—কতজন গিয়েছিল?

—আমার যত দূর মনে পড়ছে, প্রায় পঞ্চাশ বাহান্নটা দেশ থেকে হাজার তিরিশেক মানুষ গিয়েছিল। বেশির ভাগই ছিল ইউরোপের। সবচেয়ে বেশি গিয়েছিল ফ্রান্স থেকে, তবে জার্মানি আর ইটালি থেকেও স্বেচ্ছাসেবক গিয়েছিল। শোনা যায়, এরা সেনাবাহিনীর লোক না হলেও লড়েছিল বীরের মতো, এদের

একটা বড়ো অংশই অবশ্য এই যুদ্ধে মারা যায়। এদের মধ্যে অনেক বিখ্যাত লোকও ছিল।

—দিদি আমি এই ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড নিয়ে আরো জানতে চাই, আপনি একটু বলুন কী ভাবে করব?

বাণীদি কিছুক্ষণ ভাবলেন,

—না মিলি, তুই আমাকে মুশকিলে ফেললি। এর ওপর আলাদা কোনো বইয়ের কথা আমার জানা নেই।

—কেন দিদি, এই নিয়ে কেউ বই লেখেনি? এটা কি খুব গুরুত্বহীন ঘটনা ছিল?

—না না না, তা নয়। আসলে যাঁরা বড়ো ইতিহাসবিদ, আমাদের জন্য বইপত্র লেখেন, তাঁদেরও পছন্দ-অপছন্দ আছে। যেটা পছন্দ হয় তা নিয়ে অনেক কিছু করেন। আর যেটা তাঁদের অপছন্দ সে ব্যাপারে চুপ করে থাকেন।

—ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড ওনাদের পছন্দ না?

—সেটা ঠিক জানি না, তবে মনে হয়, যারা ওই যুদ্ধে জিতেছিল তাদের ওনারা পছন্দ করেন না, আর যারা হেরেছে তাদের কথা ওনারা বলতে চান না।

—ভালোমন্দের কোনো বিচার করেন না ওনারা?

বাণীদি ফাঁকা টিচার্সরুমের চারদিকটা একবার দেখলেন।

—ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের অধিকাংশই কমিউনিস্ট ছিল। যাঁরা ইতিহাস লেখেন তাঁরা, এদের কথা খুব একটা লিখতে চান না।

—কেন দিদি?

—তোর এই প্রশ্নের উত্তর ঠিক আমারও জানা নেই।

তারপর কেমন করে যেন হাসলেন, মনে হল হাসতে কষ্ট হচ্ছে, বললেন,

—যত পড়বি তত নানা প্রশ্নের উত্তর পাবি, আবার যত পড়বি মনে এমন সব প্রশ্নের উদয় হবে, যার কোনো উত্তর পাওয়া যায় না।

—আমি কিছু বুঝতে পারছি না দিদি।

তার কথাটাকে যেন শুনতেই পেলেন না,

—জানিস তো পৃথিবীর নিয়ম হল, যারা জেতে ইতিহাস তারাই লেখে। আর তা লিখতে গিয়ে এটা প্রমাণ করতেই তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, তারা কত মহৎ, আর যারা হারল তারা কত খারাপ। আচ্ছা বল, এ রকম লোক কি পাওয়া যায়, যার সব ভালো বা যার সব খারাপ? দ্যাখ মহাভারতে, পাণ্ডবরা সব ভালো আর কৌরবরা সব খারাপ, তা কি কখনো হয়!

বাণীদি কী বলছে সে কিচ্ছু বুঝতে পারছে না, মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করল,

—তা হলে সত্যি সত্যি স্পেনের গৃহযুদ্ধে কী হয়েছিল আমি জানব কী করে?

—একটা ঘটনা দিয়ে আসলে সত্যি-মিথ্যার বিচার করা যায় না। এক আঁজলা জল হাতে তুলে নিয়ে তুই যতই ভালো করে দ্যাখ না, তাতে কি নদী বোঝা যাবে? ইতিহাস পড়াতে গিয়ে আমরা আঁজলা ভরা জল দেখাই, নদীর পাড়ে নিয়ে যাই না। যে নদী দেখেছে, তাকে মিথ্যা দিয়ে ভোলানো যায় না। সে তো জানে কাল কী ছিল, আজ কী হচ্ছে, আর কাল কী হবে। তার কাছে কে জিতল আর কে হারল তার কোনো ফারাক নেই।

এই হেঁয়ালি ভরা কথার মধ্যে একটা অর্থ যেন আবছা সে ধরতে পারছে, বাণীদি অবশ্য নিজের খেয়ালে বলে যাচ্ছেন।

—তোদের পড়াতে গিয়ে মাঝে মাঝে মনে হয়, কী পড়াচ্ছি? ইতিহাস, না কি সময়ের জুয়া খেলা? সামনের দানে জোড় উঠবে না বিজোড় উঠবে কেউ জানে না। আজকাল মনে হয়, এর মধ্যে কোনো একটা ফাঁকি আছে। কালকে কী হবে তা আজকের মধ্যে অদৃশ্য কালিতে লেখা, এটা পড়তে পারাই ইতিহাস, আর এটাই কেউ পড়ায় না।

—কেন?

—যাঁরা ইতিহাস লেখেন তাঁরাও তো রাজার মাইনে করা, আমাদেরই মতো। তাঁরা কী করে লিখবেন, আজ যারা জিতলেন তারা কাল গো হারান হারবেন। চাকরি চলে যাবে তো।

—তবে সত্যিকারের ইতিহাস আমরা কবে পড়ব?

—জানি না। ইতিহাস ভালো করে পড়, দেখবি ভীষণ ইনটারেস্টিং। তেপান্তরের মাঠে সময় যেন পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটে বেড়াচ্ছে, সে দিকশূন্য, কোন্ দিকে কখন যাবে সে নিজেও জানে না। কিন্তু একদিন কেউ না কেউ এই পাগলা ঘোড়ার মুখে ঠিক লাগাম পরিয়ে দেবে।

—দিদি, কারা তারা?

—চিনি না তাদের। কিন্তু তারাই আসল ম্যাজিশিয়ান। তারাই আমাদের এই পৃথিবীটার রং, রস, গন্ধ সব পালটে দেবে। আর সে দিন থেকে আসল ইতিহাস লেখা শুরু হবে।

—কবে হবে?

—আমাদের তো বয়স হয়ে গেছে, আমাদের বোধহয় দেখা হবে না। তোরা পারবি।

বাণীদির হাসিটা এত সুন্দর, আগে সে কখনো খেয়াল করেনি।

যে কাজ নিয়ে বাণীদির কাছে আসা তা একটুও এগোল না। এমিলির কোনো বাড়তি খোঁজ পাওয়া গেল না। কার কাছে যাবে সে? সে যা জানতে চাইছে, বাবা তার কোনো খোঁজ রাখে না। বাবা এমিলিকে দেখেছে তার নিজের চোখ দিয়ে, নিজের মন দিয়ে। কিন্তু এমিলির মনের খোঁজ কে তাকে দেবে? তার থেকে সামান্য বড়ো একটা মেয়ে, নিজের প্রেম, নিজের জীবন, সব ছেড়ে চলে গেল স্পেনে। কী ছিল স্পেনে? সে তো ভাবতেই পারে না, ইন্দ্রকে ছেড়ে তাকে থাকতে হবে। বাবা জানে না, এমিলি তার মনে কী ঝড় তুলে দিয়েছে। সেদিন রাতে সে একা একা অনেকক্ষণ কেঁদেছিল। মেয়ে হিসেবেই বুঝেছিল, এমিলি প্রথম দিনেই বুঝে গিয়েছিল, বাবা কোনোদিনই স্পেনে যাবে না। একটা হাড়কাঁপানো বৃষ্টির রাতে মেয়েটা একা একা হস্টেলে ফিরে যাচ্ছে এটা জেনে, জীবনের সবচেয়ে দুর্গম রাস্তায় যাকে সে সবচেয়ে বেশি চেয়েছে তাকে সে পাবে না। এটা ভেবেই সে এতটা কাঁদছে, তাহলে এমিলি কতটা কেঁদেছিল? জীবনে তার এই প্রথম মনে হল, বাবা কাজটা ঠিক করেনি। এমিলি কি তা হলে বাণীদির ম্যাজিশিয়ান হতে চেয়েছিল? সময়ের পাগলা ঘোড়ায় লাগাম পরিয়ে স্বপ্নের সাম্রাজ্য দখল করে ফিরে আসতে চেয়েছিল নিজের রাজপুত্রের কাছে? স্পেন কি সময়ের সেই তেপান্তর, যেখানে এমিলিরা প্রথম ইতিহাস লিখতে চেয়েছিল। স্পেন তাকে জানতেই হবে।

উল্টোদিকের বাড়ির ছেলেটার কাছে যাবে? ওতো কমিউনিস্ট, কমিউনিস্ট বলেই তো ওকে এই টাউনে এনে আটকে রাখা হয়েছে। ওর সঙ্গে কারোর কথা বলা বারণ, ওরও কারোর সঙ্গে কথা বলা নিষেধ। বাবা অবশ্য কথা বলেছে। ওকে পাহারা দেবার জন্য যে পুলিশটা ওর সাথে থাকে তার একদিন খুব জ্বর হয়েছিল, ও এসে বাবাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। বাবা বলেছিল ছেলেটা খুব ভদ্র আর বিনয়ী, বাবাই বলেছিল, ওর নাম বিশ্বেশ্বর। কিন্তু গিয়ে কি বলবে? বলুন, স্পেনের গৃহযুদ্ধে কমিউনিস্টরা কেন গিয়েছিল? ধুত্, তাকে পাগল ভাববে।

সুরোটা থাকলে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলা যেত, কিন্তু সুরোও তো নেই। হঠাৎ তার মনে হল, সুরোও কি ম্যাজিশিয়ান হতে চেয়েছিল? যে মানুষেরা খেতে পায় না, তাদের সবার জন্য খাবার—এ তো সবচেয়ে বড়ো ম্যাজিক। ম্যাজিশিয়ান হতে এমিলি গিয়েছিল স্পেনে আর সুরো কলকাতার ধর্মতলায়। ওরা কি জানত না, চাইলেই ইতিহাসের মুখে লাগাম পরিয়ে দেওয়া যায় না, চাইলেই ম্যাজিশিয়ান হওয়া যায় না? সে জানে না, আর এটাও জানে না এই প্রশ্নগুলোর জবাব কার

কাছ থেকে পাওয়া যায়। তার সব রাগ গিয়ে পড়ল এই টাউনের ওপর. এটা এমন নির্জীব এমন প্রাণহীন একটা জায়গা, একটা জীবন্ত প্রশ্নের উত্তর পর্যন্ত দিতে পারে না।

বাবা কিছু না বললেও সে জানে, এমিলির কথা কাউকে বলা যাবে না। কিছু না বলে সে ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিল,

—আচ্ছা কোনোদিন যদি তোমাকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাই তুমি কী করবে?

কেমন ঘাবড়ে গিয়ে ইন্দ্র বলল,

—কী হয়েছে তোমার, হঠাৎ উল্টোপাল্টা বকছ কেন?

—আচ্ছা বলো না, কী করবে?

—কী আর করব, তোমাকে যেতে দেব না, আটকে রেখে দেব। আমি যদি তোমায় জাপটে ধরে রাখি, তুমি কোথাও যেতে পারবে? তোমার গায়ে এত জোরই নেই।

বলে ইন্দ্র হো হো করে হাসল। সে আবার জিজ্ঞাসা করল,

—আচ্ছা বলো, যদি বলি আমার সঙ্গে চলো, যাবে?

—কোথায় যেতে হবে?

—যেখানে আমি বলব।

ইন্দ্র আবার হেসে বলল,

—আমি তোমার টিমের সেন্টার ফরোয়ার্ড, তুমি যেখানে বল বাড়াবে আমি সেখানেই চলে যাব।

সে আর কিছু বলেনি।

চলে যাবার আগে সে ইন্দ্রকে একবার দাঁড়াতে বলেছিল, তারপর নিজেকে অবাক করে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পরে ইন্দ্রকে চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিয়েছিল। তার ভীষণ ভয় করছে। সে ইন্দ্রকে হারাতে চায় না। তার নিজের ভেতরে যেন আর একটা মিলি জন্ম নিচ্ছে, তাকে সে চেনে না।

ইন্দ্র আদর করে তার কানের কাছে বলে গেল,

—কী হয়েছে সোনা? আমি তো আছি তোমার সঙ্গে, আমি আজকেই মাকে বলছি, সামনের বৈশাখেই দিন দেখতে।

ইন্দ্রর গায়ে পুরুষালি পারফিউমের গন্ধ।

## ॥ ষোলো ॥

*আমার ব্যালকনির জানালা বন্ধ করে রেখেছি*
*কারণ, কান্নার শব্দ আমার পছন্দ নয়।*
*তবু ধুসর দেয়ালের আড়াল থেকে*
*কান্না ছাড়া আর কোনো কিছুরই শব্দ শোনা যায় না।*

*খুব কম দেবদূত আছে যারা গান গায়*
*খুব কম কুকুর আছে যেগুলি ডাকে*
*আমার হাতের তালুর উপর*
*বোবা হয়ে পড়ে থাকে হাজার ভায়োলিন।*

*কিন্তু ওই কান্না হয়ে যায় এক দুর্দান্ত কুকুর*
*হয়ে যায় এক প্রবল ভায়োলিন*
*বাতাস বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু*
*কান্না ছাড়া আর কোনো কিছুর শব্দ শোনা যায় না।*

—কবিতাটা আমাকে শুনিয়েছে আনা। মেয়েটা কি বোকা দ্যাখ, কবিতাটা বলতে বলতে কেঁদে ভাসাল। অথচ ও এসেছিল আমাকে সান্ত্বনা দিতে, কারণ আমি কাঁদছিলাম। খবর পেয়েছ কিনা জানি না, গতকাল ক্রিস্টোফার কডওয়েল চলে গেলেন। সুইসাইড হিলে (জায়গাটার নাম কে দিয়েছিল?) বোধহয় ব্রিটিশ ব্যাটেলিয়ানের অর্ধেকের বেশিই শেষ হয়ে গেছে। যুদ্ধে ডাক্তার হিসাবে কাজ করতে গেলে মেশিন হয়ে যেতে হয়, আমিও সেই চেষ্টাই করছিলাম। সব সময় পারছিলাম, তা নয়। কয়েক দিন আগে সন্ধ্যার দিকে নিয়ে এল একটা ইটালিয়ান

ছেলেকে। বড়ো জোর উনিশ-কুড়ি বছর বয়স। ওর প্যাংক্রিয়াসটা টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। ওকে বাঁচানোর ক্ষমতা পৃথিবীর সবচেয়ে আধুনিক হাসপাতালেরও নেই। আমি কেবল ওর শেষ যন্ত্রণাটা কমানোর চেষ্টা করছিলাম। মাঝে মাঝে ছেলেটার জ্ঞান ফিরে আসছিল, আর ও ওর অদ্ভুত নীল চোখ খুলে কাউকে ডাকছিল। আমি তো ইটালিয়ান জানি না, কিন্তু বুঝতে পারছিলাম, ছেলেটা তার মাকে ডাকছে। বলো, আমি কী করে ওর মাকে খবর দেব? আমি কী করে বলব, আপনার ছেলে হয়তো মরেছে কোনো ইটালিয়ান মেশিনগানারের গুলিতে। ফ্র্যাংকোর ডাকাতদের পাশে দাঁড়িয়ে মানুষ মারছে মুসোলিনির লোকেরা, আকাশ থেকে বোমা ফেলছে হিটলারের প্লেনগুলো, আর বাকি পৃথিবী 'নিরপেক্ষ' থাকছে। আমি কান্না চাপতে পারিনি। কিন্তু কাল থেকে যা হচ্ছে, তা সহ্য করা সম্ভব হচ্ছিল না। সুইসাইড হিল থেকে নিয়ে আসছিল ব্রিটিশ ছেলেগুলোকে। ওদের অনেককে তো আমি চিনি, নাম জানি, এক সাথে মিটিং করেছি, কফি খেয়েছি। তুমিও চিনবে কয়েকজনকে। অপরিচিত কাউকে ওই অবস্থায় দেখা এক জিনিস আর নিজের কমরেডদের দেখা অন্য জিনিস। আমাদের এখানকার আমেরিকান কমান্ডার আমাকে জোর করে ডিউটি থেকে ছুটি দিয়ে দিলেন। যে স্কুলটায় আমাদের কমান্ড হাসপাতাল, তার পেছনের দিকে একটা ঘরে আমরা জন ছয়েক মেয়ে মিলে এক সঙ্গে থাকি। সেখানেই গিয়ে কাঁদছিলাম, ঘরে তখন অবশ্য কেউ ছিল না। ঘরটা অন্ধকার আর বিমর্ষ, জানালা দিয়ে একমাত্র সামনের স্কুল বাড়িটার বিবর্ণ দেওয়াল ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। বাইরে গিয়ে যে কোথাও বসব তারও কোনো উপায় নেই, বারণ। যুদ্ধটা একদম ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। মাথার ওপর সারাক্ষণ শিস দিয়ে উড়ে যাচ্ছে মর্টার, উঠোনে এসে পড়ছে মেশিনগানের গুলি। আজ ভোরবেলায় কামানের যে গোলাটা স্কুলের ডানদিকে এসে পড়ল সেটা একটু এদিকে এসে পড়লে আর কষ্ট করে তোমাকে এই চিঠি লিখতে হত না। আমাদের মধ্যে যাদের আগে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে তারা বলছিল, যুদ্ধের এত কাছে ফিল্ড হাসপাতাল রাখা যায় না। কিন্তু কীই-বা করার আছে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় যুদ্ধের লাইনটা এগিয়ে আসছে। আমাদের ছেলেরা অবশ্য লড়ছে আপ্রাণ, কিন্তু মনে হচ্ছে নেতারা বোধহয় আন্দাজ করতে পারেনি, যুদ্ধটা এ রকম হবে। আর আমি যা বুঝেছি এই যুদ্ধটার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।'

বাবাই চিঠিটা পড়ছিল, বলেছিল, তুই ওর হাতের লেখা পড়তে পারবি না। নাকি বাবা চাইছে না, সে চিঠির সব কথা সে জানুক? সে আপত্তি করেনি।

কারণ বাবা নিজের থেকেই তাকে এমিলির চিঠি পড়াবে বলেছিল। বাবা যেন কুড়ি বছর ধরে জমে থাকা সব কথা তাকে বলে হালকা হতে চায়। এমিলির তিনটে চিঠি বাবা পেয়েছিল। প্রথম চিঠিটা প্যারিস থেকে, দ্বিতীয় চিঠিটা স্পেনের অ্যালবারসিট বলে একটা জায়গা থেকে। আর শেষ চিঠিটা মাদ্রিদের কাছ থেকে। প্রথম চিঠি দুটো ছোটো ছোটো, কিন্তু শেষটা অনেক বড়ো একটা চিঠি। বাবা সেই চিঠিটাই তাকে পড়াচ্ছিল।

'আমরা যেখানটায় আছি সেটা তোমাকে একটু জানাই। জায়গাটার নাম ভাসিয়ামাদ্রিদ, রাজধানী মাদ্রিদ থেকে মাইল সাত আট দক্ষিণে। কিন্তু এই ভাসিয়ামাদ্রিদের ওপর দিয়েই গেছে মাদ্রিদ-ভ্যালেন্সিয়া রাস্তাটা। নিশ্চয়ই খবর পেয়েছ রিপাবলিকানরা তাদের হেডকোয়ার্টার মাদ্রিদ থেকে ভ্যালেন্সিয়ায় সরিয়ে নিয়ে গেছে। ওরা ভাসিয়ামাদ্রিদ দখল করতে পারলে ভ্যালেন্সিয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে কেবল তাই না, মাদ্রিদকে আর রিপাবলিকানরা বাঁচাতে পারবে না। ফ্র্যাংকোর ডাকাতদের এখানে বাধা দিচ্ছে আমাদের ভলান্টিয়ার আর ছোটো একটা নদী। স্কুলের পেছনের উঁচু জমিটা থেকে নদীটা দেখা যায়। অদ্ভুত নাম নদীটার, হারামা। ওরা যদি হারামা পার হতে পারে তা হলে কী হবে জানি না। তুমি ভাবতে পারো, এই ভয়ংকর যুদ্ধটা করছে কেবল ইংরেজ, ফরাসি, বেলজিয়ান আর যুগোস্লাভ ভলান্টিয়াররা। এই দেশ চেনে না, অধিকাংশেরই আগে যুদ্ধ করার কোনো অভিজ্ঞতাও নেই। পৃথিবীর মুক্তি আসন্ন, এই বিশ্বাসটুকুর জোরে লড়ে যাচ্ছে। কিন্তু কতক্ষণ? শুনছি রিপাবলিকানদের বাহিনী আসছে। কিন্তু ততক্ষণ কি সুইসাইড হিল বা ভাসিয়ামাদ্রিদের আর কেউ বেঁচে থাকবে?

কডওয়েলকে কখন নিয়ে এসেছিল তা আমি জানতে পারিনি, কখন নিয়ে গেল তাও টের পাইনি, খবরটা পেলাম অনেক পর। ভাবছিলাম, গোটা ইংল্যান্ড বোধহয় আজ বুঝতেও পারবে না স্পেনের এই হারামা নদীর পারে তারা তাদের এক শ্রেষ্ঠ সম্পদকে হারাল। আনার কাছ থেকে লোরকার কথা শুনে বুঝলাম স্পেন অন্তত চিনতে পেরেছিল তার কবিকে, তার নাট্যকারকে। আনা আমাদের এখানে দোভাষী আর নার্স দুটোর কাজই করে। আমি কডওয়েলকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনতাম না, কিন্তু আনা লোরকাকে চিনত। ও আর লোরকা দুজনেই আন্দালুসিয়ার লোক। ও মুখস্থ বলে যাচ্ছিল লোরকার কবিতা আর নাটক, আর মাঝে মাঝে ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিচ্ছিল মুখে মুখে আমার বোঝার জন্য। তুমি জানো কিনা জানি না, স্প্যানিশ খুব সুন্দর ভাষা। শুনতে খুব ভালো লাগে,

আর আজকাল আমি ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশ বলতে পারি। আমি কান্না থামিয়ে ওর কবিতা শুনছিলাম, আর ও কাঁদছিল। এই কবিতাটা তো কান্না নিয়েই, কিন্তু এর মধ্যে কত আশার কথা। কিন্তু বলো, ভবিষ্যতের পৃথিবীতে কে বলবে আশার কথা? মেরে ফেলল কডওয়েলকে, মেরে ফেলল লোরকাকে, প্রতিদিন মারছে আরো কত কবি, নাট্যকার, চিত্রকর, গায়ককে। যে কোনো যুদ্ধের শেষেই এক দল মানুষ বেঁচে থাকে, তারাই নতুন করে ঘর বাঁধে। কিন্তু এ যুদ্ধে আমরা যদি হেরে যাই তবে শেষ হয়ে যাবে গান, কবিতা, ছবি। বলো তবে যারা বেঁচে থাকবে তারা কি মানুষ? বিশ্বাস করো স্বদেশ, আমরা এখানে স্পেনের জন্য না, মনুষ্যত্বের ভবিষ্যতের জন্য লড়ছি।

আমার চিঠি পড়ে তোমার নিশ্চয়ই হাসি পাচ্ছে, ভাবছ যার নিজের বেঁচে থাকারই ঠিক নেই, সে কী করে এত বড়ো বড়ো কথা বলে?

ঠিকই, চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে, একটা লণ্ঠনের টিমটিমে আলোয় বসে আমি তোমাকে চিঠি লিখছি। মাঝে মাঝেই অন্ধকার জানালাটা আলো হয়ে উঠছে বিস্ফোরণে, আর তার পর মুহূর্তে মাটি কেঁপে উঠছে গুমগুম করে। আমি এর মধ্যে কল্পনা করছি আন্দালুসিয়ায় কবির সমাধির পেছনে জলপাই ঝোপের পাশে আমার হোম, আমি আছি, তুমি আছ, আর আছে আমার স্বপ্নের শিশুরা। তোমাকে আমার বলা হয়নি, আমরা যখন মাদ্রিদে আসছিলাম আমাদের ট্রেনটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল গুয়াদালহারা স্টেশনে। ওখানেই অপেক্ষা করছিল কুড়ি-পঁচিশটা বাচ্চা, শুনলাম ওরা অনাথ কিংবা এদের বাবা-মা-রা যুদ্ধে চলে গেছে, ওদের এখন সরকার থেকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। স্বদেশ, বাচ্চাগুলো হাসছে না, খেলছে না, ওরা যেন ইজেলে আঁকা বিষাদের ছবি। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের খুশি কেড়ে নিতে পারে যে কেউ, কিন্তু শিশুদের আনন্দ কেড়ে নেয় যারা তারা কি মানুষ? তুমি জানো না, প্রতি রাতে স্বপ্নে গুয়াদালহারার বাচ্চারা আমার কাছে আসে। আমাকে বেঁচে থাকতে হবে, ওদের জন্যই।

স্বদেশ, তোমার কাছে আমার তো কিছু লুকোনোর কিছু নেই, আমি মৃত্যুকে ভয় পাই। আমি মরতে চাই না। আজকের দিনটা যেন কেমন, এত পরিচিত মৃত মুখ দেখেছি, মনে হচ্ছে মৃত্যু একদম আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার ভীষণ ভয় করছে।

আমার এই চিঠি তুমি পাবে কিনা জানি না। জানি না, এটাই আমার শেষ চিঠি কিনা। যদি তাই হয়, আমার কথা ভেবে তুমি দাঁড়িয়ে পোড়ো না। তুমি

তোমার পথেই এগিয়ো। তোমরা হিন্দুরা তো পুনর্জন্মে বিশ্বাস করো, তা হলে বিশ্বাস করো তোমার বাংলাদেশের সবুজ মাটি, নাম-না-জানা পাখির ডাক আর দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত নদীর জলে আমি আবার বেঁচে উঠব (আমার এই একটাই দুঃখ, তোমাদের সুন্দর দেশটা আমি দেখতে পেলাম না)।

কথা দাও, আমাকে যতটা ভালোবাসতে, তোমার স্ত্রীকে তার থেকেও বেশি ভালোবাসবে। আমি জানি, সে তোমাকে পেয়ে খুশি হবে। তোমাকে কোনো দিন বলিনি, তোমার অহঙ্কার হবে বলে—তুমি দেখতে ভীষণ সুন্দর। তোমার জন্য এই কাগজের চিঠিতে আমার অসংখ্য চুম্বন ভরে দিলাম। আর তোমার স্ত্রী যদি আপত্তি না করে, তবে তোমাদের মেয়ের নাম দিয়ো এমিলি। এভাবেই আমি তোমার কাছে চিরকাল থেকে যাব। বিদায়।'

—বাবা, তুমি গেলে না কেন এমিলির সঙ্গে?

কথাটা বলার আগে সে অনেকবার ভেবেছিল, কথাটা বলা উচিত হবে কিনা। বাবা রেগে যেতে পারে, তার চেয়ে বড়ো কথা, বাবা দুঃখ পেতে পারে। বাবা দুঃখ পেতে পারে এমন কোনো কাজ সে করতে পারবে না। কিন্তু এমিলিকে জানতে এটা জানা বড়ো জরুরি।

বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তার যেন মনে হল, বাবা জানত, সে এই প্রশ্নটা করবে। তারপর আস্তে আস্তে বলল,

—তুই যে প্রশ্নটা আমাকে করেছিস, সে প্রশ্নটা আমি নিজেকেই হাজার বার করেছি। যদি কেউ আমাকে এই প্রশ্ন করে আমি কী উত্তর দেব, এই ভয় নিয়েই আমি গত বাইশ তেইশটা বছর বেঁচে আছি। আমার একটা উত্তর মুখস্থ করা আছে, আমি আমার পরিবারের বড়ো ছেলে, বাবা তার জমি বেচে, বসতবাড়ি বন্ধক দিয়ে আমাকে পড়তে পাঠিয়েছিলেন, আমাকে সবার আগে তাঁদের কথা ভাবতে হয়েছিল। কিন্তু তুই যখন কথাটা জিজ্ঞাসা করলি, আমার হঠাৎ মনে হল, আজ যদি এমিলি এসে আমাকে এই প্রশ্ন করে, তা হলে আমি কী উত্তর দেব? এতদিন পরেও ওর কাছে তো আমি কিছু লুকোতে পারব না। তোকেও তাই সত্যি কথাটাই বলব, কিন্তু আমি জানি তোর শুনতে ভালো লাগবে না।

বাবা একটু থামল, মনে হল, কথাটা কি ভাবে বলবে সেটা ভাবছে। তারপর আচমকা কথাটা যেন ছুঁড়ে দিল,

—আমি এমিলির সঙ্গে যাইনি, কারণ আমি ভয় পেয়েছিলাম। আমি ভিতু।

বাবা বসে রইল যেন পাথরের মূর্তি। আকাশ থেকে কুয়াশার মতো বিষণ্ণতা নেমে আসছে। কোনো কথা নেই, এ পৃথিবীতে আর কোনো কথার প্রয়োজন

নেই। দূরে কারোর রেডিয়োতে আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান বাজছে, আবছা মেঘের ওড়না গায়ে ওগো চাঁদের মেয়ে, .....। তারও কেমন অবসন্ন লাগছে। সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাবার দিকে, যাকে সে ভালোবাসে নিজের প্রাণের থেকেও বেশি—বাবাকে তার অপরিচিত মনে হচ্ছে। কতক্ষণ তারা চুপ করে বসেছিল তার খেয়াল নেই। বাবাই প্রথম কথা বলল। হেসেই বলল, বোধহয় তার বিষণ্ণতা কাটাতেই,

—আমি এমিলির সাথে চলে গেলে, তোকে পেতাম কোথায়?

বাবার কথার উত্তর দিতে হয়, তাই সে বলল,

—ছাড়ো আমার কথা, আমার মতো হাজারটা মিলি আছে।

—আমি জানি, কিন্তু হাজারটা মিলি থেকে তুই একটা এমিলি হয়ে উঠতে পারবি না?

—আমি? এমিলি হব? কেন? কী পাবার জন্য? কী পেয়েছে এমিলি?

এভাবে বাবার সঙ্গে সে কখনো কথা বলেনি। একটিও কথা না বলে বাবা ইজিচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল, তার দিকে একবারও না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল। দরজার বাইরে অন্ধকার বারান্দায় বাবার শরীরটা মিলিয়ে যাচ্ছে। সে ছুটে বেরল,

—বাবা দাঁড়াও।

চলার গতি না কমিয়েই বাবা বলল,

—এখন যাও, আমি পরে কথা বলব।

—না, এখনই শোনো।

- বললাম তো এখন না।

লম্বা অন্ধকার বারান্দার শেষে মা-র ঘরে আলো জ্বলছে। বাবার একদম মুখোমুখি গিয়ে সে দাঁড়াল, অন্ধকারের মধ্যেও বাবার চশমার ফ্রেমটা জ্বলজ্বল করছে।

—শোনো, আমি জানি এমিলি কিসের জন্য স্পেনে গিয়েছিল।

ক্লাসে পড়ার উত্তর দেবার মতো করে, সে আস্তে আস্তে স্পষ্ট করে বলল,

—এমিলি ম্যাজিশিয়ান হতে চেয়েছিল। পৃথিবীর তেপান্তরের মাঠে সময়ের পাগলা ঘোড়ার মুখে লাগাম পরাতে চেয়েছিল।

বাবা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল,

—কী বলছিস?

—আমি জানি না তোমাকে বোঝাতে পারব কি না, কিন্তু আমি বুঝেছি।

বলো, সময়ের ওপর তোমার কোনো নিয়ন্ত্রণ আছে? কাল কী হবে তুমি তা বলতে পারবে? ভেবে দেখো আমরা সবাই ইতিহাসের কাছে রাস্তার ধারে পড়ে থাকা ইট পাথরের টুকরোর মতো ফ্যালনা, আমাদের ইচ্ছার কোনো দাম নেই। এই যে তুমি এত বড়ো ডাক্তার, লোকে বলে তুমি নাকি মরা মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পারো, কিন্তু এই যে আমাদের টাউনটা একটা মরা মানুষের মতো পড়ে আছে চাইলেও তুমি তাকে এক চুল নাড়াতে পারবে না। তোমার অসহায় লাগে না?

বাবা তার কথা শুনছিল, তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বলল,

—বলে যা।

- কারোর কারোর অসহায় লাগে, নিজেকে মনে হয় সময়ের ক্রীতদাস। বলো, কেন রিপাবলিকানরা হেরে যাবে? ওরা তো ন্যায়ের জন্য লড়ছিল। কিন্তু সময় আর তার বিবরণ ইতিহাস, ঠিক করে দিল—না তা হবে না। কেন সময়ের যা ইচ্ছে হবে, তাই আমাদের মানতে হবে। আমাদের ইচ্ছে মেনে কেন সময় চলবে না? এটা যারা সহ্য করতে পারে না, তারা ছুটে বেড়ায়, সময়ের ঘোড়ার মুখে লাগাম পরাতে চায়, চায় নিজেদের ইচ্ছেমতো তাকে চালাতে। বাবা, এরাই ম্যাজিশিয়ান, এরা যেদিন পারবে দেখবে দুনিয়ার রং, রস, গন্ধ সব পাল্টে গেছে, দেখবে ঘড়ির মোড়ের বন্ধ ঘড়িটা আবার চলতে শুরু করেছে। এমিলি ম্যাজিশিয়ান হতে গিয়েছিল। বাবা তুমি জানো না, আমাদের সুরোও ম্যাজিশিয়ান হতে চেয়েছিল।

বাবা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল,

—তোকে এ সব কে বলল?

—বলো না বাবা, আমি ঠিক বলেছি? আমি চিনতে পেরেছি এমিলিকে?

—আমি কখনো এভাবে ভাবিনি, তবে মনে হয়, তুই যা বলছিল তাই হয়তো ঠিক। এরা ম্যাজিশিয়ান হতে গিয়েই মরেছে।

—না বাবা, ওরা মরবার জন্য না, বাঁচবার জন্য ম্যাজিশিয়ান হতে চেয়েছিল। বাবা আমিও বাঁচতে চাই। তুমি আমাকে শিখিয়ে দাও, কি করে আমি এমিলি হব।

ছোটোবেলার মতো করে বাবা তার কপালে চুমু খেয়েছিল।

—আমি সত্যি জানি না. কী করে এমিলি হতে হয়। তুই চেষ্টা কর। এই বিশাল আকাশটা তোর জন্য অপেক্ষা করছে, উড়ে যা, রাস্তা ঠিক খুঁজে পাবি।

আমি বাবা হয়ে এটুকু কাজ করব, কেউ যদি তোর পায়ে শেকল পরাতে আসে আমি ঠিক আটকে দেব, তাতে আমি জীবনে যেটুকু পেয়েছি তা সব যদি নষ্ট করে দিতে হয় সেও আচ্ছা।

—বাবা তুমিও চলো আমার সঙ্গে।

—না রে, আমি পারব না।

—কেন?

—আসলে কেউ জানে না, যেদিন এমিলি চলে গেল আমার জীবন সেদিনই শেষ, তারপর থেকে আমি স্রেফ বেঁচে আছি, এই টাউনটার মতো। তুই আমাকে অনেক বার জিজ্ঞাসা করেছিস, আমি কলকাতা বা অন্য কোথায় না গিয়ে কেন এই টাউনে পড়ে রইলাম। আসল কথা হল, এই টাউনটার থেকে আর আমি আলাদা হতে পারব না। আমি একটা বুড়ো মাকড়সা আর এই টাউনটা আমার অন্ধকার জাল। এটাই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। তুই এমিলি হয়ে ফিরে এলে আমার মুক্তি। আমাকে নিয়ে চিন্তা করিস না, আমি ঠিক তত দিন বেঁচে থাকব।

খোলা বারান্দায় উত্তর দিক থেকে হু হু করে ঠান্ডা হাওয়া আসছে। আজ রাতটা বড়ো ঠান্ডা।

## ॥ সতেরো ॥

খাবার টেবিলে কেউ কোনো কথা বলছিল না। মা-ই হঠাৎ বলল,

—শুভ্রা বলছিল, সামনের বৈশাখে একটা ভালো দিন দেখতে।

কেউই কথাটার কোনো উত্তর দেয়নি। মা তাতে কিছুটা রেগেই বলল বাবাকে লক্ষ্য করে,

—কথাটা কি তোমার কানে গেল?

বাবা কিছুটা দায়সারা ভাবে বলল,

—এত তাড়া কীসের?

—যেটা করতেই হবে সেটা ফেলে রেখে কী লাভ?

—ওর ফাইনাল পরীক্ষার আগে ওসব কিছু করা যাবে না।

—পরীক্ষা দিয়ে কী হাতিঘোড়া হবে শুনি?

—কী হাতিঘোড়া হবে সেটা যখন বোঝোই না, তখন আর এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না।

বিরক্তিতে সে মাথা নামিয়ে ফেলল। সে জানে, এবার কী হবে। মা চ্যাঁচাতে শুরু করবে। এই সময় তার এত খারাপ লাগে। বাবা আবার কেন এসব বলতে গেল? শব্দ করে ডালের হাতাটা মা রাখল বাটিতে। ঝড়ের পূর্বাভাস। কিন্তু মুখ খুলল আগে বাবা।

—সুভদ্রা, এ ব্যাপারে আমি যেটা বলছি, সেটাই ফাইনাল, এ নিয়ে আমি কোনো আলোচনা করতে চাই না।

বাবাকে এভাবে কখনো কথা বলতে সে শোনেনি। মার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, মা-ও বোধহয় শোনেনি এবং এই প্রথম মা কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে গেল।

উঠে আসবার সময় মাকে সে বলে এসেছিল, তার মাথা ধরেছে সে এক্ষুনি শুয়ে পড়বে।

আজ রাত তাকে এত সহজে ঘুমোতে দেবে না! সে যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে। ঠিক জানে না, হঠাৎ বাবাকে কেন এতগুলো কথা বলতে গেল। এমিলি আর মিলির মধ্যে ফারাক কতটা আর কেউ না জানুক, সে তো জানে। এমিলির মতো মেয়েরা তো প্রায় উপন্যাসের চরিত্রের মতো, বাস্তবে কি এসব হয়? আর এমিলি কি আপনা থেকে তৈরি হয়? তার পরিবার, তার দেশ, তার সময়—এগুলোর কোনো ভূমিকা নেই? তার কী আছে? বাবার কিছু ভাসাভাসা কথা, যেন দূরের কোনো স্বপ্নলোকের গল্প, ব্যাস ওইটুকুই। আর তার চারদিকটা। অসহ্য এই টাউনটা, তার মানুষজন, কলেজের মেয়েগুলো। এখানে কিছু হয় না। খবরের কাগজে কখনো কখনো যুদ্ধের খবর ভেসে আসে, কিন্তু সেও তো বহু দূরের। সুরো মরে যাবার পর খবরের কাগজ দেখে আশা হচ্ছিল, কিছু বোধহয় এবার হবে। কই, কিছুই তো হল না। মাসিমা, সুরোর বাড়ির লোকজন আর তার মতো কয়েকজন ছাড়া আর বাকিরা তো সুরোর কথা ভুলে যাবে। তা হলে সুরো মরতে গেল কেন? নাকি কোথাও, আকাশের ওপারে এ সব কিছু তিলতিল করে জমা হচ্ছে। যেদিন সময় হবে, বিদ্যুতের মতো, বজ্রপাতের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে এই মাটিতেই। কিন্তু সে কবে, কবে? কে ডেকে আনবে তাদের? সময় নাকি পাগলা ঘোড়া, কিন্তু তার সময় তো ঘড়ির মোড়ের বন্ধ ঘড়িতে আটটা বেজে দশ মিনিটে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে পড়েছে। কার অভিশাপে? কে তাকে মুক্ত করবে?

অসম্ভব ঠান্ডা, কিন্তু সে ঘরের আলো নিভিয়ে চুপ করে বসে রইল খাটের কোণে। অন্ধকারে ঠান্ডাটা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। আলো জ্বলছে দেখলেই মা চলে আসবে। আজ রাতে সে কাউকে চায় না, মা তো নয়ই এমনকী বাবাকেও তার দরকার নেই—তাকে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। ভীষণ ইচ্ছে করছে, লেপের তলায় ঢুকে যেতে, তাতে অন্তত ঠান্ডাটা কম লাগবে। কিন্তু কী ভেবে সে বসে রইল একইভাবে। তার খুব ক্লান্ত লাগছে। আজ না, যা ভাববার কাল ভাবব, বলে যদি ঘুমিয়ে পড়তে পারত তাহলে সবচেয়ে খুশি হত। কিন্তু সে জানে এটা হবে না, তার চিন্তা তাকে রেহাই দেবে না। ক্রীতদাসের মতো তাকে ভেবে যেতেই হবে, যতক্ষণ তার ভাববার ক্ষমতা আছে ততক্ষণ।

বাবাকে যা বলেছে তা যদি করতে হয়, তবে তো তাকে এই জীবনের সব কিছু ছাড়তে হবে, স্মৃতি ছাড়া কিছুই সে নিয়ে যেতে পারবে না। এই সব কিছু

ছেড়ে দেওয়া কি সম্ভব? মা, যাই হোক মা তো। দাদা-বউদি পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় চলে যাবার পর মা-র সব কিছুই তো তাকে নিয়ে। এত বড়ো শাস্তি মাকে সে দেবে? আর ইন্দ্র, তাকে কী করে ছাড়বে? ইন্দ্রকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। সে চলে গেলে ইন্দ্র মরে যাবে। না, এ কাজ করতে পারবে না। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে—ইন্দ্রর প্রতি তার যে অনুভূতি, সেটাই কি ভালোবাসা? নাকি ইন্দ্র তাকে ভালোবাসে বলে সে বাধ্য ইন্দ্রকে ভালোবাসতে। এটা সহানুভূতি, নাকি ভালোবাসা এ রকমই, সে জানে না। কিন্তু ইন্দ্রকে বাদ দিয়ে নিজের কোনো আলাদা ভবিষ্যতের কথা কখনো ভাবেনি। এতদিন পর এটা আর নতুন করে ভাবা যায় না, ইন্দ্রের প্রতি এতটা নিষ্ঠুর হতে পারবে না। না, মাথা থেকে এ সব উল্টে-পাল্টে চিন্তাভাবনা বার করে দিতে হবে। কাল সকালেই মাকে গিয়ে বলবে ইন্দ্রদের বাড়ির সঙ্গে বিয়ের তারিখ নিয়ে কথা বলতে। সে ইন্দ্রর সঙ্গেই থাকতে চায়। আলাদা করে নিজের কথা ভেবে কী লাভ, ইন্দ্র খুশি হলেই সে খুশি। বেনারসির ঘোমটার আড়ালে কী ভেবে চোখের জল ফেলছে কে জানতে যাবে? সে সব ভুলে যাবে। আস্তে আস্তে ভুলে যাবে এই টাউনে সুরো বলে কেউ ছিল। স্পেনের কথা আর ভাববে না। ধুর, জমিদার বাড়ির বউ হবে সে, কেন এই সব ভাবতে যাবে! জলপাই ঝোপের পাশে সাদা স্কার্ট পরা মিষ্টি দেখতে মেয়েটা যদি তার স্বপ্নে আসতে চায়, তবে সে ইন্দ্রকে আরো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরবে। শুভ্রা মাসিমা একদিন বলেছিল, তাদের বাড়িতে নাকি বউদের নতুন নাম দেওয়া হয়, বাপের বাড়ির নামে ডাকা হয় না। কথাটা শুনে মনে মনে সে ভীষণ রেগে গিয়েছিল, আজ মনে হচ্ছে, না সেটাই ভালো। তার নামের সঙ্গে তো মিশে আছে তার নিজের অতীত আর বাবার অতীত—কী দরকার সে-সব মনে রাখার, পুরোনো নামের সঙ্গে সে সবও হারিয়ে যাক।

কিন্তু বাবা? দাদা যেদিন চলে গেল, সেদিন রাতে বাবার ঘরে ঢুকে সে দেখেছিল, হাত দিয়ে চোখ ঢেকে বাবা কাঁদছে। বুকের ভেতর থেকে একটা তীব্র ব্যথা উঠে এসে তার নিশ্বাস বন্ধ করে দিয়েছিল। আর এ সব ভুলে সে যদি চলে যায়, বাবা তবে কী করবে? সে ভাবতে পারছে না, অসহ্য। সে পারবে না বাবাকে কাঁদাতে। হে ভগবান, আমায় বলে দাও, আমি কী করব? কিছু না ভেবেই বেরিয়ে এল বারান্দায়, শুধু লেপের তলায় রাখা কম্বলটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে।

গোটা বাড়িটাই ঘুমিয়ে। মার ঘরের বাইরে চুপ করে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। কেন? সে জানে না। অনেক ছোটোবেলায় মার কি একটা অপারেশন হয়েছিল, মা

হাসপাতালে ছিল। রাত্রিবেলায় তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ভয়ে, কেন জানি মনে হচ্ছিল, মা আর কোনোদিন আসবে না। এই ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল সে অনেকক্ষণ, এইভাবেই চুপচাপ। শেষে ভয়ে থাকতে না পেরে, ধাক্কা দিয়েছিল দরজায়। এতদিন পর তার দুটে কথাই মনে আছে। বাবার সারা গায়ে ছিল সিগারেটের মিষ্টি গন্ধ। আর বাবার পাশে শুয়ে তার মনে হয়েছিল, বাবার মতো সাহস আর কারুর নেই। বাবা সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে বহুদিন, কিন্তু আজ বন্ধ ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আবার সে সিগারেটের মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছে। কিন্তু আজ সে বাবার বুকের কাছে গিয়ে শুয়ে পড়তে পারবে না। পারলে, সে জানে, ঠিক ঘুমিয়ে পড়তে পারত।

বারান্দার শেষে দরজাটা খুললে ছাদ। এত রাতে কি কখনো সে ছাদে এসেছে? মনে পড়ছে না। ছোটোবেলায় সে জানত, সন্ধে হয়ে গেলে ছাদে যেতে হয় না। মা-ই তাদের অন্ধকার হলে ছাদে যেতে বারণ করত। ছাদ থেকে সোজা দেখা যায় শ্মশান, তারপর নদী, আর তারপর রহস্যভরা মাঠটা, যেটা দেখতে একদম ভালো না।

শ্মশান তো ভয়েরই জিনিস। কিন্তু তার থেকেও অদ্ভুত, তার থেকেও ভয়ের ওপারের মাঠ। রাত হলেই কারা সব নেমে আসে ওখানে। ছোটোবেলা থেকেই এ টাউনের সবাই জানে সেটা। তাদের কেউ যদি তাকায় কারো দিকে, সে সেই মুহূর্তেই ভয়ে পাগল হয়ে যায় ; আবার কেউ দূর থেকে ফুঁ দেয়, আর সে ফুঁ কারো গায়ে লাগলে সাতদিনের মধ্যে সে রক্তশূন্য হয়ে মরে যায় ; রাতে কারা নাকি অদ্ভুত সুর করে কাঁদে, আর সে কান্না যদি কারো কানে যায় তবে তাকে আর আটকে রাখা যায় না, যেভাবেই হোক সে নদী পার হয়ে রাতের বেলায় চলে যাবে, আর পরের দিন পাওয়া যাবে সাদা হয়ে যাওয়া মড়াটা, সব রক্ত খেয়ে নিয়েছে। যদি বিশ্বাস না হয় অমুক বা তমুককে জিজ্ঞাসা করো, কারুর মাসি বা কাকা বা পরিচিত কারো এ সব হয়েছে। এই টাউনের সব বাচ্চাকে লোহা লাগানো ঘুনসি পরানো থাকে, তেনারা লোহা পছন্দ করেন না। তাদের পাড়ার কালীমন্দিরের দেবী সাক্ষাৎ রক্ষাকালী, মাঠের বাসিন্দাদের হাত থেকে টাউনকে রক্ষা করার জন্য যার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিন্তু রাতে শেয়ালের ডাকে ঘুম ভেঙে গেলে সবাই রামনাম করে, সবাই জানে শেয়ালের ডাক আসলে তেনাদের আগমন বার্তা।

দিনের বেলায় মাঠটা দেখে বোঝার উপায় থাকে না, রাতে এত সব ঘটনা ঘটে যায় সেখানে। যত দূর দেখা যায়, পাথুরে জমির ওপর এখানে-ওখানে

ঝোপঝাড় ছাড়া কিছু নেই। দু-চারটে বড়ো গাছও আছে। একদম কাছের দুটো গাছে পাতা বিশেষ নেই, কেমন জানি সাদা সাদা ডাল-সর্বস্ব। দুটো গাছই শকুনের আড্ডা। শ্মশানের পাশেই টাউনের ভাগাড়, তার লোভেই শকুনের দল জড়ো হয়। এই মাঠের আকাশে দিনের বেলায় সব সময়ই শকুন ওড়ে। বহু দূরে ধোঁয়াধোঁয়া পাহাড়ের সারি।

এই মাঠ দিয়ে কেউ কোনোদিন কাউকে হেঁটে আসতে দেখেনি। পাহাড়ের ওপারে নাকি সাঁওতাল পরগনা। যখন ব্রিজটা তৈরি হচ্ছিল, তখন কাজটা ঠিক হচ্ছে কিনা এই নিয়ে গোটা টাউন জুড়ে খুবই তর্ক হয়েছিল। মা বলেছিল, এই ব্রিজ হলে নাকি মা রক্ষাকালীও এই টাউনকে বাঁচাতে পারবে না। বাবার মত ছিল ঠিক উল্টো, 'এত দিনে নিত্যজ্যাঠা একটা কাজের কাজ করছেন'। পাহাড়ের ওপারে নাকি কোথায় কয়লার খনি হয়েছে, নতুন রেললাইন বসেছে। এই ব্রিজ আর রাস্তা নাকি টাউনের নতুন দরজা খুলে দেবে। তারপর বর্ষাকালে নদীর জল যখন ফুলেফেঁপে রাস্তাটাকে ছুঁয়েছে, একদিন রাতে অর্ধেক তৈরি ব্রিজটা ভেঙে পড়ল। রাতে কেউই টের পায়নি। সকালে জানবার পর গোটা টাউন ভেঙে পরল ভাঙা ব্রিজ দেখতে, সে ভিড় প্রায় তিন চার-দিন ধরে ছিল। তারপর আস্তে আস্তে টাউন এই ভাঙা ব্রিজেই অভ্যস্ত হয়ে গেল। তারই যেমন মনে হয়, এই ধ্বংসস্তূপটা সে জন্ম থেকে দেখছে।

অনেকদিন আগে বোধহয় ভয় ভাঙাবার জন্যই বাবা তাকে আর দাদাকে গরমকালে রাতে জোর করে ছাদে নিয়ে গিয়েছিল তারা চেনাতে। দাদার অতটা ভয়ডর ছিল না, সে তারা দেখবে কি, বাবার জামাতে মুখ ঢেকে বাবাকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। বাবা তাকে কোলে তুলে নিয়ে বলল,

—তাকা একবার, দ্যাখ কিচ্ছু হবে না। কত জোনাকি দ্যাখ।

ভয়ে ভয়ে সে চোখ খুলেছিল। সত্যি, একসঙ্গে এত জোনাকি সে কোনোদিন দেখেনি। একটা নীচু অর্ধেক চাঁদের তলায় মাঠটাকে অন্য রকম লাগছে। হঠাৎই মাঠ থেকে ভেসে এল পরিষ্কার একটা বাচ্চার কান্নার আওয়াজ। সে জানে, এই কান্নার অর্থ কী। বাবাকে জড়িয়ে ধরে সে তখন সে কাঁদতে শুরু করেছে, এমনকী দাদাও একছুটে ঘরে। চ্যাঁচামেচিতে মা-ও চলে এসেছে। এসেই তো বাবাকে তুমুল বকাবকি।

—নিজে সারাদিন মড়া ঘাঁটো, তোমার কী। কিন্তু এই দুধের শিশুগুলো তো তোমার মতো পাষণ্ড হয়ে যায়নি।

জোর করে বাবার কোলে থেকে তাকে কেড়ে নিয়ে মা সোজা ঘরে। কিন্তু

তার কান্না থামে না। আর তার সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে মা-র বকাবকি। কান্না থামার পর, বাবা আবার তাকে নিয়ে পড়ল, 'বোকা, ওটা শকুনের বাচ্চার কান্না। তুই ওর কান্না শুনে ভয় পেয়েছিস, আর ও তোর কান্না শুনে ভয় পেয়েছে। দুটোই বোকা।'

তারপর বয়স বেড়েছে, মাঠের ভয়টাও কেটে গেছে। কিন্তু মাঠটাকে কোনোদিনই তার ভালো লাগেনি।

বাবা বলত, অনেক সময় উত্তর বা পশ্চিম দিক থেকে জোর হাওয়া দিলে অনেক রাতে নাকি মাদলের আওয়াজ ভেসে আসে, পাহাড়ের নীচের সাঁওতালদের গ্রাম থেকে। সে কোনোদিন অবশ্য শোনেনি, তবে শুনতে খুব ইচ্ছে করে। ভাবতেও ভালো লাগে, ঠান্ডা ঝড়ের মতো হাওয়া দিচ্ছে, আর দূরে পাহাড়ের নীচে মশাল জ্বালিয়ে কুচকুচে কালো কতগুলো মানুষ দল বেঁধে মাদল বাজিয়ে নাচছে। আর তাদের মেয়েরা হাসতে হাসতে এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ছে, চোখে তাদের উপচে পড়ছে মদের নেশা। কেউ তাকে একবার নিয়ে যাবে ওদের কাছে? সে কথা দিচ্ছে, কোনোদিন আর এই টাউনে ফিরে আসবে না।

দুনিয়ার অদ্ভুত সব খবর নিয়ে আসত সুরো। সাঁওতালরা নাকি আগে মাঠ পার হয়ে আসত টাউনে, শতমূল আর খরগোশের চামড়া বিক্রি করত। ওর দাদু ওকে বলেছে। বহু দিন আগে ইংরেজদের সঙ্গে সাঁওতালদের খুব যুদ্ধ হয়েছিল। মার খেয়ে কয়েকজন সাঁওতাল পালিয়ে চলে আসে টাউনে। কিন্তু টাউনের লোকেরা ইংরেজদের ডেকে তাদের ধরিয়ে দেয়। তারপর থেকে আর সাঁওতালরা এই টাউনে আসে না। আর সুরোর বক্তব্য ছিল, প্রতিহিংসা নিতে সাঁওতালরা একদিন এসে টাউনের সবাইকে মেরে ফেলবে। বাবাকে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল, বাবা কিছু বলতে পারেনি।

কিন্তু দিনের বেলায় মাঠটা প্রাণহীন, পাতাহীন গাছে শকুনের ভিড়, পাথুরে জমি দেখলেই কেমন মন খারাপ করে। কেন মাঠটা এ রকম? কবিতাটা কার ভুলে গেছে, কিন্তু মাঠটা দেখলেই লাইনদুটো মনে পড়ে,

*ভালোবাসা যদি ছেড়ে চলে যায় তা হলে কে-কার? সব মরুভূমি।*
*ভালোবাসো। দ্যাখো, চোখ মেললেই সতেজ শস্যে ঢেকেছ তুমি।*

কেউ কোনোদিন মাঠটার দিকে ভালোবেসে তাকায়নি? কেউ কোনোদিন কি তাকাবে ভালোবাসা নিয়ে মাঠটার দিকে? কে জানে? কিন্তু সে অন্তত নয়, কারণ ভালোবাসা কাকে বলে, সে জানে না।

আজ রাতে মাঠটাকে কেমন অদ্ভুত লাগছে। নাকি রাতটাই অদ্ভুত। এ রকম ঠান্ডা তার কোনোদিন লাগেনি। নাক-মুখ ঠান্ডায় অসাড় হয়ে আসছে। তার যেন

তাকাতেও কষ্ট হচ্ছে। এত ঠান্ডা অথচ এক ফোঁটাও হাওয়া তো নেই, ঠান্ডাটা যেন উঠে আসছে মাটির নীচ থেকে। আকাশে চাঁদ দূরে থাক একটা তারাও দেখা যাচ্ছে না। আকাশ যেন একটা কালো চাদরে ঢাকা। মাঠের দিকে তাকিয়ে তার প্রথমে মনে হল, সে বোধহয় অন্ধ হয়ে গেছে, কারণ সে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না। না, একটাও জোনাকি নেই। কিছুক্ষণ পরে চোখটা কিছুটা সয়ে আসতে দূরে ঝাপসা ভাঙা ব্রিজটা সে আন্দাজ করতে পারল, ব্যাস ওই পর্যন্ত।

এ রকম সে ভেবে আসেনি। তার আশা ছিল, ঠান্ডা থাকলেও আকাশে চাঁদ থাকবে, অনেক দূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাবে মাঠটা। সে তাকিয়ে থাকবে একদৃষ্টিতে—তন্নতন্ন করে সে খুঁজবে পথের কোনো নিশানা পাওয়া যায় কিনা। কোন পথে গেলে পৌঁছে যাওয়া যাবে সাঁওতালদের গ্রামে, যেখানে মাতাল মানুষগুলো পাহাড় আর নদীর তালে মাদল বাজায়। ওদের মেয়েদের কানে নীল রঙের পারিজাতের দুল। সেখানে গিয়ে সে সব ভুলে যাবে, একদম ওদের মতো হয়ে যাবে। এই টাউনটাকে ভুলে যাবে, পারলে ভুলে যাবে নিজেকেও।

কিন্তু সে-পথ এখন অন্ধকারে ঢাকা। তার কাছে ঘর আর ছাদ এখন এক। কষ্ট করে এই ঠান্ডায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে কী লাভ। ভাবল, না, ঘরেই ফিরে যাই।

আওয়াজটা সে তখনই পেল। তাদের গলি দিয়ে একটা রিকশ ঢুকছে। এত রাতে কে? নির্ঘাত বাবার কোনো পেশেন্ট পার্টি। হে ভগবান, এত রাতে এই ঠান্ডায় বাবাকে এখন বেরোতে হবে! ঠিক যা ভেবেছে। রিকশটা দাঁড়াল তাদের বাড়ির সামনেই। এবার বাইরের কড়া নাড়ার আওয়াজটা হবে। না, কেউ কড়া নাড়ছে না। তা হলে অন্য কারো বাড়িতে কেউ এল? আর সেই মুহূর্তে ভয়ংকর চিৎকার—বাঁচান, দিদিমণি বাঁচান। আর সঙ্গে প্রাণপণ দরজা ধাক্কানোর আওয়াজ।

চিৎকারটা এতই আচমকা আর এত তীব্র, কয়েক মুহূর্ত ভয়ে তার যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু সম্বিত ফিরতে সে ছুটে গেল মার ঘরের সামনে, দরজা ধাক্কা দিতে চ্যাঁচাল, বাবা শিগগিরই ওঠো, বাইরে কী যেন হয়েছে।

## ॥ আঠারো ॥

এ রকম বোধহয় কোনোদিন হয়নি, বিষ্ণুর মা অনেকক্ষণ থেকে কড়া নেড়ে যাচ্ছে, আর তার ঘুমই ভাঙেনি। ধড়মড় করে উঠে প্রথমেই চোখে পড়ল প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। ছি ছি, এ রকম তার কোনোদিন হয়নি।

ঠান্ডাটা খুবই, কিন্তু আকাশ পরিষ্কার, ভারি সুন্দর রোদ উঠেছে। বাইরের দিকে তাকালে মনটা খুশি হয়ে যায়। আর কী কাণ্ড এতদিন পরে তারও যেন ভালো লাগছে! মনে হচ্ছে তার কোনো অতীত নেই, তার জীবন এই শুরু হল। বিষ্ণুর মা জানতে চাইছিল, কী রান্না করবে। এ সব নিয়ে ভাবতে একদম ভালো লাগছে না, বলে দিল, যা আছে দেখে যা ভালো বোঝো করো।

হঠাৎই মনে পড়ল কাল রাতের কথা। সত্যি কী অদ্ভুত কাণ্ড। বাবা! কী ভয় পেয়েছিল! ও রকম একটা জোয়ান, চোখ ঠিকরে বেরচ্ছে, মুখে গ্যাঁজলা, আর 'ভূত ভূত' বলে চ্যাঁচাচ্ছে। পাশের বাড়ির মাসিমা দুধ গরম করে এনেছিলেন, আর ডাক্তারবাবু বোধহয় তাতে ব্র্যান্ডি মিশিয়ে খাইয়েছিলেন। তারপর লোকটা উঠে বসেছিল। তবে সব কিছুর মধ্যে কেলেঙ্কারি করেছিল নিত্যবাবুর দারোয়ান, কোথা থেকে কিছুটা ঠান্ডা জল লোকটার মুখেচোখে ঢালতে গিয়ে সারা গায়ে ঢেলেছিল। ওই ঠান্ডায় লোকটা উঠে বসে ঠকঠক করে কাঁপছিল।

মুখে আলো পড়ায় মুখটা চেনাচেনা লাগছিল, টাউনে রিকশ চালায়। পাশের বাড়ির মাসিমা লোকটার নামও জানে, নব বলে ডাকছিলেন। জেরা শুরু করলেন নিত্যবাবু। লোকটার হতভম্ব ভাবটা তখনো যায়নি, আর নিত্যবাবুর ধমকে আরো ঘাবড়ে গিয়ে প্রায় কিছুই বলতে পারছিল না। দু-একবার শুধু বিড়বিড় করে কী সব বলল, তার থেকে 'ভূত' ছাড়া কিছুই বোঝা গেল না। এতে নিত্যবাবু গেলেন আরো চটে, প্রচণ্ড ধমকে উঠলেন,

—তোকে আমি জেলে দেব, বল এত রাতে মদ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলি কেন?

কাঁদো কাঁদো হয়ে কিন্তু স্পষ্টভাবেই লোকটা বলল,

—বাবু, আমি মদ খাইনি।

—কী, তুই মদ খাসনি? দাঁড়া দেখছি। লখন দেখ তো গন্ধ শুঁকে।

নিত্যবাবুর দারোয়ান লোকটার মুখের কাছে মুখ নিয়ে অনেকক্ষণ শুঁকেটুকে ঘাড় নাড়ল। তাতে অবশ্য নিত্যবাবুর রাগ কমল না,

—নিজে শালা মদ গিলে আছ, অন্যের মুখে মদের গন্ধ পাবে কী করে।

এবার এগিয়ে এলেন ডাক্তারবাবু। গোটা ঘটনাটা ঘটেছে তার বাইরের ঘরের দরজার সামনেই, কাজেই তাকে লক্ষ্য করেই বললেন,

—লোকটা ঠান্ডায় কাঁপছে, গায়ে দেবার কিছু একটা দিতে পারেন?

তার কাছে কোনো জেন্টস চাদর নেই, বাধ্য হয়েই একটা পুরোনো বেডকভার এনে দিতে হল। নিজের হাতেই বেডকভার দিয়ে লোকটাকে ভালো করে জড়িয়ে দিয়ে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন,

—বল তো, কি হয়েছিল?

লোকটা হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে ডাক্তারবাবুর হাত জড়িয়ে ধরল,

—আমার ভীষণ ভয় করছে।

আশ্বস্ত করে ডাক্তারবাবু বললেন,

—তোর কোনো ভয় নেই, আমরা এতগুলো লোক আছি, কেউ তোর কিচ্ছু করতে পারবে না। তুই শুধু বল, কী হয়েছে?

তারপর লোকটা যা বলল তা অদ্ভুত। ও নাকি স্টেশন থেকে প্যাসেঞ্জার নিয়েছিল, বলেছিল নতুনপল্লি যাবে। লোকটা নাকি এখানে এসে দাঁড়াতে বলে, তারপর রিকশ থেকে নেমে ওর চোখের সামনে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। লোকটা কেমন জানতে চাওয়ায় খুব একটা পরিষ্কার জবাব পাওয়া গেল না। কালো টুপি পরা আর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কোট পরা ছিল, অন্ধকারে মুখটা দেখতে পায়নি। শুধু একটা কথাই স্পষ্ট করে বলতে পারল, লোকটা ভীষণ ঢ্যাঙা। কিছুক্ষণ কারোর মুখে কোনো কথা নেই। অবশেষে ডাক্তারবাবুই বললেন,

—না রে বাবা, কেউ আসেনি তোর রিকশয়। এত রাতে এ পাড়ায় কে আসবে? এক আসতে পারে রোগীর বাড়ির লোকজন আমার কাছে। আর পাড়ার সব লোকই এখানে। কারুর বাড়িতে কেউ এলে তো জানতেই পারতাম। খালি পেটে ছিলি গ্যাস হয়েছে, আর ঠান্ডায় অন্ধকারে তোর খেয়াল নেই। দাঁড়া আমি একটা ওষুধ দিচ্ছি, খেয়ে সোজা বাড়ি চলে যা।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ গলায় লোকটা বলে উঠল,

—আমি যদি সব ভুল দেখে থাকি, তবে এটা কী?

লোকটা তার ডান হাতটা সোজা বাড়িয়ে দিল, হাতে জলে ভেজা দোমড়ানো একটা এক টাকার নোট। প্যাসেঞ্জারের দেওয়া ভাড়া। এই ঠান্ডায় জড়ো হওয়া ভিড়টায় একটা গুঞ্জন, কেউ কেউ কপালে হাত ঠেকাচ্ছে, আর কে যেন বেশ জোরে জোরে রামনাম করে উঠল।

লোকটা একা একা যেতে কিছুতেই রাজি না, শেষে পাড়ারই কয়েকজন তাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গেল। সবাই আস্তে আস্তে চলে যেতে দরজাটা বন্ধ করা গেল। শুধু পাশের বাড়ির মাসিমা তখনো দাঁড়িয়ে। বৃন্দা অন্ধকারে একদৃষ্টিতে নদীর দিকে তাকিয়ে, আর পাশের দরজায় দাঁড়িয়ে ওনার স্বামী নীচু গলায় ডাকছেন,

—কী পাগলামো করছ, ঠান্ডা লাগবে তো! ঘরে এসো।

যাকে বলা কথাটা, তার কানে গেল বলে মনে হল না।

টিচার্সরুমে গিয়ে প্রথম বোঝা গেল, কাল রাতের ঘটনা নিয়ে গোটা টাউনে হইচই এবং সবাই তার জন্যই অপেক্ষা করছিল, কারণ 'ভাগ্যবান' কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর মধ্যে সে একজন। এখন বুঝতে পারল, আজ সকালে তাঁদের পাড়ার রাস্তায় এত লোক কেন। সবাই কালকের রাতের ঘটনার খোঁজ নিতে ভিড় জমিয়েছে।

হেডমিস্ট্রেস থেকে চা করে যে হাবুর মা সবাই হাজির, এমনকী উঁচু ক্লাসের মেয়েগুলোও দরজা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। ঘটনাটা বলার পর দেখা গেল যারা শুনছিল তাদের মধ্যে স্পষ্ট দুটো ভাগ, একদলের কথা কাল নতুনপল্লিতে নব, নামটাও সবাই জেনে গেছে, ভূত দেখেছে। কার ভূত তা নিয়ে অবশ্য নানা মত। অধিকাংশের বক্তব্য অনন্তবাবুই কাল রাতে ফিরে এসেছিলেন। এদের কাছ থেকেই জানা গেল, নব নাকি অনন্তবাবুর বাঁধা রিকশওয়ালা ছিল, আর নাকি নবকে খুব ভালোবাসতেন। ক্লাসের ঘণ্টা পড়ে গেছে তাও কারো খেয়াল নেই।

কাল আসলে কে এসেছিল, নব আসলে কী দেখেছিল, তা নিয়ে নিজেই একটা ধন্দের মধ্যে আছে। আর সবার মতো ছোটোবেলায় সেও খুব ভূতের ভয় পেত। কিন্তু পরে সে সব ভয় কেটে গেছে। আর সে ভয় না কাটিয়ে তার উপায়ই-বা কী। অফিসের কাজে কখনো সখনো সমরকে বাইরে যেতে হত দু একদিনের জন্য। প্রথম প্রথম ভয় ভয় লাগত, তারপর গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল। আর এখন বদ মতলবে ঘুরে বেড়ানো পুরুষমানুষ ছাড়া আর কিছুতেই তার ভয় হয় না।

কাল রাতে জড়ো হওয়া ভিড়েই অনন্তবাবুর কথাটা শোনা গিয়েছিল। কথাটা একদমই তার ভালো লাগেনি। অনন্তবাবুর সঙ্গে তার ভালোই আলাপ ছিল, লোকটা একটু রগচটা ছিল, এছাড়া কোনো দোষই কোনোদিন চোখে পড়েনি। লোকটার ওপর ভয়ংকর অন্যায় হয়েছিল। এত পণ্ডিত মানুষটা অভাবে অনটনে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হল, কেউ কোনো কথা বলল না গোটা টাউনে। যদি ভূত হয়ে ঘাড়ে ওঠে তবে রিকশওয়ালার কেন, ওই বুড়ো চেয়ারম্যানের ঘাড়ে উঠবে। কে জানে কাল কী হয়েছিল, ওই নব কী দেখতে কী দেখেছে?

ফার্স্ট পিরিয়ডটা নমো নমো করেই শেষ হল। ক্লাস টেনের টেস্ট হয়ে গেছে তাই সেকেন্ড পিরিয়ড তার অফ। টিচার্সরুম ফাঁকাই, এক সাধনাদি ছাড়া কেউই নেই। সাধনাদি এখন তাদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়ার, রিটায়ার করবেন সামনের বছরে। স্কুলের মধ্যে সবচেয়ে চুপচাপ। স্বামী মারা গেছেন বছর দুয়েক, অনেক বড়ো সংসার, কষ্ট করে চালান একার হাতে। সকালের ভিড়ে সাধনাদি ছিলেন কি না খেয়াল হচ্ছে না।

তাকে দেখে পাশে এসে বসলেন,

—লীলা, বলো তো ঠিক কী হয়েছিল কাল রাতে?

সকাল থেকে একই কথা বলতে বলতে বিরক্তিই লাগছে, তাও সে গোটাটাই আবার বলল। সাধনাদি গলাটা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

—তোমার কী মনে হয়? কে এসেছিল?

—সে আমি জানি না, সবাই তো নানা কথা বলছে। কেউ বলছে ভূত, কেউ বলছে চোর-ডাকাত।

—না লীলা, ভূতও না, চোর-ডাকাতও না। এই টাউনের লোকের বুদ্ধিশুদ্ধি কোনোদিনই হবে না—আজকের যুগে ওই সব ভূতপেতনি হয় নাকি? আর কোনো ডাকাত রাতের ট্রেন থেকে নেমে রিকশয় চড়ে ডাকাতি করতে আসবে, বলো?

সে আর কী বলবে? সাধনাদিও চুপ। তারপর হঠাৎ গলা নামিয়ে বললেন,

—আমার কী মনে হয় জান, চোর ডাকাত না, কিন্তু যে এসেছে, সে এমন কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে যে, সে সবার চোখের সামনে আসতে চায় না। রিকশওয়ালাটা কী দেখতে কী দেখেছে, কিন্তু চ্যাঁচামেচি করে লোক ডেকে সব গন্ডগোল করে দিয়েছে। যে এসেছে, সে আর লোকজনের সামনে বেরোয়নি। কিন্তু সে এখনো এই টাউনেই কোথাও আছে, সময় মতো সে আসবে তার কাজ করতে। সাবধানে থেকো, ভালো না মন্দ কী উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে, তা তো কেউ জানে না।

সাধনাদির কোনো কথাই তার আর কানে যাচ্ছে না।

আজ তার সাতখুন মাফ। শরীরটা ভালো লাগছে না বলা মাত্র হেডমিস্ট্রেস কোনো কিছু জিজ্ঞাসা না করেই ছেড়ে দিলেন।

স্কুলের উল্টোদিকে তিনটে রিকশ দাঁড়িয়ে, না তার মধ্যে নব নেই। বড়ো ঘড়ির মোড় পায়ে হেঁটে মিনিট দশেক। অন্য দিনের তুলনায় বড়ো ঘড়ির মোড়ে রিকশ কিছু কমই মনে হল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ভালো করে দেখল, না নব নেই।

লোকটার অসুখবিসুখ কিছু হল? কাউকে জিজ্ঞাসা করবে নবর বাড়ি কোথায়? কিন্তু কেউ যদি পাল্টা জিজ্ঞাসা করে, সে কেন নবর বাড়ি খুঁজছে, কী বলবে? কিন্তু নবকে তার দরকার, যেভাবেই হোক, নবকে খুঁজে বার করতে হবে।

পাড়ার মোড়ে বটতলায় বরং অনেক রিকশ। এই প্রথম সে খেয়াল করল, রিকশওয়ালারা দুপুরবেলায় বটতলার ছাতুওয়ালার কাছ থেকে ছাতু কিনে খায়। তাকে কাছে আসতে দেখে ছোকরা মতো একজন এগিয়ে এল রিকশ নিয়ে। বাধ্য হয়েই তাকে বলতে হল, সে কোথাও যাবে না, সে নবকে খুঁজছে। নবর নামটা শুনেই ছেলেটা অদ্ভুতভাবে হাসল,

—লে হালুয়া, লব যে আজ টাউনের হিরো, সবাই লবকে খুঁজছে।

তারপর ভিড়টার দিকে গলা তুলে জিজ্ঞাসা করল, নব কোথায় কেউ জানে কিনা। ভিড় থেকে কে একজন বলল, নব প্যাসেঞ্জার নিয়ে ঘোষপাড়ার দিকে গেছে।

যাক এটা অন্তত জানা গেল নব বেরিয়েছে। কিন্তু নবকে পাবে কী করে? রিকশওয়ালাটাকে বলবে, আমাকে ঘোষপাড়ায় নবর কাছে নিয়ে চলো? না না, সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

কিন্তু ছেলেটাই নিজের থেকে বলল,

—আপনি বাড়ি যান দিদিমণি, আমরা খবর দিয়ে দেব লবকে।

## ॥ উনিশ ॥

প্রথম জলটা গায়ে পড়লেই কাঁপুনিটা ওঠে একদম ভেতর থেকে, তারপর থেকে ঠিক। বাইরে তখনো ভালো করে আলো ফোটেনি। তাঁর স্নানের জন্য আগের রাত থেকে জল আলাদা করে তুলে রাখা হয়। এই অভ্যাস তাঁর আজন্মের। বছরের অন্য সময়ে কোনো সমস্যা নেই। অসুবিধা হয় এই হাঁড় কাঁপানো ঠান্ডায়, এই অসুবিধাটুকু তাঁকে অভ্যাসের স্বার্থেই মেনে নিতে হয়। সপ্তাহের ছ দিন তিনি তেল মাখেন না, রবিবার সকালে লখন ভালো করে তেল দিয়ে দলাইমালাই করে দেয়, প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় ধরে। এটা প্রায় নেশার মতো। তার পিতামহ পশ্চিম থেকে পালোয়ান ভাড়া করে এনেছিলেন কেবল এই দলাইমালাই করার জন্য। লখন সে-রকম বিশেষজ্ঞ না হলেও দলাইমালাইয়ের হাতটা চমৎকার। লোকটার হাজারটা দোষ ক্ষমা করে দেন এই একটা গুণের জন্যই।

সূর্যোদয় না হলেও স্নানের পরই সূর্যপ্রণামের রীতি, আর তিনি সূর্যস্তব পড়েন উচ্চৈঃস্বরে, মনটা প্রসন্ন হয় তাতে। এন্ডির ভারী চাদরটা জড়িয়ে নিলেন, ঠান্ডাটা খুবই পড়েছে।

ভুলেই গিয়েছিলেন প্রায়, বাইরের গেটে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকাতেই হঠাৎ কাল রাতের ঘটনা মনে পড়ে গেল। অদ্ভুত সব কাণ্ড!

কী মনে করে দাঁড়ালেন একটু, তারপর লখনকে অবাক করে তাকে সঙ্গে আসতে বললেন। কোনোদিন এই প্রাতঃভ্রমণের সময় কাউকে তিনি সঙ্গে নেন না, এই সময়টা তার একান্ত নিজস্ব। আজই প্রথম এই নিয়মের অন্যথা করলেন।

রাস্তায় নেমেই প্রথম যেটা খেয়াল হল, যা ভেবেছিলেন সে রকম কুয়াশা নেই, বরং চারধারটা অদ্ভুত পরিষ্কার, পুবদিকটায় পুরোপুরি আলো ফুটেছে, আকাশ একদম নিষ্কলঙ্ক নীল, মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। এই ভোরে রাস্তায় কোনো জনপ্রাণী নেই। কে বলবে কাল মাঝরাতে এই রাস্তায় এত নাটক হয়েছে।

শ্মশানেও কোনো লোকজন নেই। নদীর পাড়ও বিলকুল সুনসান। কিন্তু কালরাতের ব্যাপারটা ঠান্ডা মাথায় ভাবা দরকার। নানা ঘাটের নানা অভিজ্ঞতাই তাকে বুঝিয়েছে সব বিষয় হালকা করে দেখা অনুচিত। একটা মূর্খ রিকশওয়ালা চ্যাঁচালেই ভূত এসেছে বলে নাচতে শুরু করার মতো ভীমরতি তার এখনো হয়নি। কিন্তু স্বদেশডাক্তার যা বলছে, সবটাই কল্পনা, এটাও মানা যাচ্ছে না। ব্যাটা কিছু-একটা নির্ঘাত দেখেছিল। কিন্তু কী দেখেছিল? সত্যি সত্যি কি কেউ এসেছিল কাল রাতে? মনটা খচখচ করছে, দিনকাল ভালো না। যদি কেউ এসে থাকে, তবে বিনা উদ্দেশ্যে সে আসেনি। মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের রাত, ঠান্ডায় বাঘ-ভালুকও বেরোতে চায় না, তখন মধ্যরাতে রিকশয় চেপে তো আর হাওয়া খেতে কেউ আসে না। ওই হারামজাদা রিকশওয়ালার পেট থেকে তো নতুন কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। সে যা বলার বলে দিয়েছে—খুব ঢ্যাঙা, কালো টুপি পরা। এমন অপদার্থ, লোকটার চেহারা কেমন, রোগা না ভারী, তাও বলতে পারছে না। কখনো নাকি মনে হয়েছে পাথরের মতো ভারী, কখনো নাকি খুব হালকা। যে যাই বলুক, ব্যাটা নির্ঘাত মদ খেয়েছিল।

একটু এগোলেই নদীর থেকে টাউনটা অনেকটা সরে গেছে, টাউনের বাড়িঘর অনেকটা দূরে। মাঝখানের মাঠে কারা যেন সরষের চাষ করেছে। এ টাউনের সবকিছু তার নখদর্পণে, এই মাঝখানের জমির সবটাই মিউনিসিপ্যালিটির, এ বিষয়টায় তিনি নিশ্চিত। কিন্তু এই চাষবাসটা হচ্ছে তাকে কিছু না জানিয়েই। রোজ সকালেই ভাবেন ব্যাপারটা খোঁজ নিতে হবে, ধরতে হবে। মজা দেখাবেন। কী অসুবিধা, এসে একবার বললে, সামান্য ক পয়সা খাজনা ঠিক করে পারমিশন দিয়ে দিতেন। কিন্তু সে পথে যাবে না, লুকিয়েচুরিয়ে করবে, আর এটাই তিনি সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু এই শীতের সকালের রোদে, সরষের ফুলগুলো লাগছে চমৎকার। এখানে নদীটা একটা ছোটো বাঁক নিয়েছে, আর নদীটার ওপর ঝুঁকে পড়েছে একটা কালোজাম গাছ। গাছটার নীচে চাতালের মতো একটা কালো পাথর। গরমকালে লোকজনকে ওখানে বসে হাওয়া খেতে দেখেছেন। কাল রাতের কথা ভাবতে ভাবতে বোধহয় পা-টা তাড়াতাড়ি চালিয়েছেন, হঠাৎ মনে হল, হাঁপিয়ে গেছেন। জীবনে এই প্রথম বসলেন পাথরটায়।

রাতের ট্রেনে লোকটা এসেছিল, মানে এসেছে কলকাতার দিক থেকে। রিকশয় উঠেছে কিছু না বলে এবং উঠে বলেছে নতুনপল্লি যাবে। মানে এই টাউন তার জানা, কিছু খোঁজখবর করার দরকার নেই। হতেই পারে, এই

টাউনেরই লোক। কিন্তু চেনাজানা কেউ যদি আসে, তবে তাকে আর দেখা গেল না কেন। যখন রিকশওয়ালাটা চ্যাঁচামেচি করে পাড়া মাথায় করছে, সে তো নিজেই এসে বলতে পারত, ও মিছিমিছি ভয় পেয়েছে, আসলে আমি এসেছি। না, কিছু একটা গন্ডগোল আছে। এর একটাই কারণ হতে পারে, লোকটা কাউকে জানাতে চায় না সে এসেছে। কোনো গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে এলেই একজন এ রকম করবে, কোনো ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি। কিন্তু কার কাছে এসেছিল? রিকশটাকে যেখানে দাঁড়াতে বলেছিল যদি রিকশটাকে সেখানেই রেখেই রিকশওয়ালাটা চ্যাঁচামেচি করে থাকে তবে এই আশপাশের চার পাঁচটা বাড়ির মধ্যে কোনো একটা বাড়ি ছিল লোকটার গন্তব্য।

আচ্ছা, পশ্চিম দিক থেকে যদি শুরু করা যায়। প্রথম বাড়িটা সুদামের, বটতলার মোড়ে মুদির দোকান। ছাপোষা, নির্বিরোধী মানুষ, সাতে-পাঁচে বিশেষ থাকে না, কষ্ট করে বড়ো সংসারটা চালায়। দোকানের মাল দেবার সময় ওজনে ঠকায়, এ ছাড়া কোনো বদনাম সুদামের নেই। তবে এই কাজ তো দুনিয়ার সব দোকানদারই করে। শুধু একটাই অস্বাভাবিক ব্যাপার, সুদামের মেজো ছেলেটা। ছেলেটা লেখাপড়ায় ভালো ছিল, কিন্তু কলকাতায় পড়তে গিয়ে কমিউনিস্টদের পাল্লায় পড়ে পুলিশের হাতে মার খেয়ে মরে গেল। কিন্তু অত রাতে কে আসবে সুদামের বাড়িতে, কেন আসবে?

তারপর মেয়েদের স্কুলের বাংলার দিদিমণির বাসা। কলকাতায় বাড়ি, স্বামী উন্মাদ। কেউ কি তবে লুকিয়ে দিদিমণির কাছে এসেছিল? তবে এই দিদিমণির সেরকম কোনো দুর্নাম কখনো শোনেননি। আগে ছুটিছাটায় কলকাতায় যেত, এখন নাকি তাও যায় না। আজ পর্যন্ত কেউ তার সঙ্গে দেখা করতেও আসেনি। মনে হয় না, এই শীতের মাঝরাতে কেউ আসবে।

তারপর? ভাবতে এখনো তার মাথা গরম হয়ে যায়। এই হল আজকালকার পুলিশ, এত উদ্ধত, ইংরেজ আমলেও এরকম ছিল না। তার সঙ্গে কোনো কথাবার্তা ছাড়াই দুম করে একটা কমিউনিস্ট ছোঁড়াকে তার নাকের সামনে এনে বসিয়ে দিল! এমনিতে নীরেনদারোগা করিতকর্মা অফিসার, দাপট আছে। তার কথা খুব একটা অমান্য করে, তাও না। কিন্তু এ ব্যাপারটায় একটু পরামর্শের প্রয়োজন বলেও মনে করল না! হোক প্রিজনার, হোক সারাক্ষণ একটা কনস্টেবল তার সঙ্গে থাকে, কিন্তু একটা কমিউনিস্ট তো। দূর থেকে দেখেছেন, এমনিতে দেখলে ভয়ংকর কিছু মনে হয় না, কিন্তু সারাক্ষণ একটা কমিউনিস্ট ঘরের ঠিক উলটোদিকে। না, নীরেনদারোগা কাজটা ঠিক করেনি।

একজন বন্দি কমিউনিস্টের কাছে মাঝরাতে একজন গোপনে আসছে, এ সম্ভাবনা কখনো উড়িয়ে দেওয়া যায় না, ওদের হাজার মতলব। নীরেনদারোগা যতই আশ্বস্ত করুক, কমিউনিস্টদের বিশ্বাস নেই। শুধু একটাই খটকা লাগছে, রাত্রিবেলায় যখন কনস্টেবলটা সঙ্গে রয়েছে, তখন কেন আসবে? দিনের বেলা লোকটা একা থাকে। কনস্টেবলটা তখন থানায় ডিউটিতে যায়। বাইরের থেকে তালা দিয়ে যাওয়ার কথা, অনেক দিন নাকি তালা না দিয়েই চলে যায়। লোকটার সঙ্গে দেখা করার ওটাই তো প্রকৃষ্ট সময়। দিনের বেলায় পাড়ায় কে ঢুকছে, কে খেয়াল করতে যাবে। দিনের বেলায় না এসে রাতে আসবে কেন?

তারপর অনন্তমাস্টারের পরিত্যক্ত বাসা। লোকটা মরার পর পুলিশ সেই যে তালা বন্ধ করে দিয়ে গেছে, আজও সেই তালা কেউ খোলেনি। এমনকী মাস্টারের স্ত্রীও একদিনের জন্য আসেনি। সে ঘরের তালায় প্রায় বছর খানেক হল কারো হাত পড়েনি, শীতের মাঝরাতে সেখানে কেউ আসবে না।

এবার রাস্তার পূব দিক। প্রথম কালীবাড়ি, ওটার হিসাব করা আর না করা একই ব্যাপার। বৃদ্ধ পুরুতমশাই আর পরিষ্কার-টরিষ্কার করার একটা বুড়ি ছাড়া রাতে কেউ ওখানে থাকে না, তাদের দুজনের হাল এমনই, কাল রাতে চ্যাঁচামেচিতে যখন গোটা পাড়া তোলপাড় তখনো তেনারা বেরোতে পারেননি—ওদের কাছে কেউ আসবে না। মা কালী আছেন, কিন্তু তাঁর গায়ে এখন কোনো গয়না নেই। বছর চারেক আগে একবার গয়না চুরি হবার পর মায়ের সামান্য যেটুকু সোনাদানা আছে, সেটা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হিসাবে তাঁর সিন্দুকেই থাকে। তা নিয়ে নানা লোকে নানা কথা বলে, সে-সব কথাকে গুরুত্ব দেবার কোনো প্রয়োজনীয়তা অন্তত তিনি বোধ করেন না। মূল্যবান কিছু নেই, কাজেই চোর-ডাকাত আসার কোনো সম্ভাবনাও নেই।

পরের বাড়ি স্বদেশডাক্তারের। মাঝরাতে রোগীর বাড়ির লোকজন তাকে ডাকতেই আসে হরবখত। কিন্তু কাল রাতে কেউ আসেনি, সে তো স্বদেশ নিজেই বলল। স্বদেশের কাছে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ আসবে কেন? এককথায় স্বদেশ এই টাউনে অজাতশত্রু। ভালো ডাক্তার, আর গরিবদুখিদের বিনাপয়সায় চিকিৎসা করে। টাউনের লোকের স্বদেশডাক্তারকে নিয়ে এক ধরনের গর্ববোধই আছে—এত বড়ো বিলেত ফেরত ডাক্তার অথচ কলকাতায় না গিয়ে এই টাউনেই পড়ে রইল। একদিক থেকে ডাক্তারকে নিয়ে তার একটু ভয়ই আছে, কেউ যদি ভোটে দাঁড় করিয়ে দেয়, তা হলে তাঁর পক্ষেও ঠেকানো মুশকিল। না ডাক্তারের কাছে এভাবে কেউ আসবে না।

বাকি রইলেন নিজে। জীবনে তাঁর আর যা কিছুর অভাব থাক শত্রুর অন্তত অভাব নেই। তিনি তার জন্য প্রস্তুতও থাকেন। হতে পারে, কাল রাতে তাঁর জন্যই কেউ এসেছিল। বোধহয় রিকশওয়ালাটার চ্যাঁচামেচিতে এ যাত্রায় ফাঁড়াটা কেটে গেল। পণ্ডিতমশাইয়ের কথাটা তাঁর আজকাল সবসময় কানে বাজে, 'বাবা, সামনের সময়টা তোমার খারাপ যাবে। শুক্রের মহাদশা আর মঙ্গলের অন্তর্দশা শুরু হয়েছে। শুক্রের মহাদশা এই লগ্নের জন্য মারক এবং অন্তর্দশা মঙ্গল দ্বিদশ সম্পর্কে আবদ্ধ, এই সময় জাতকের বিপদের সম্ভাবনা। মন্ত্রেশ্বরের কথা যদি মানতে হয়, তবে সতর্ক হও। বিপদে আসবে অকস্মাৎ, বজ্রপাতের মতো'। এই ভবিষ্যদ্‌বাণীই এখন তাঁর সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা। সময় অসময়ে তাঁকে ভয় পাইয়ে দিয়ে যায়। আজকাল মনে হয়, এর থেকে নাস্তিক হলেই বোধহয় ভালো হত। নিয়তির অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করে বেঁচে থাকতেন, যা হবার হবে, আগের থেকে দুশ্চিন্তা করে কী লাভ। কিন্তু নাস্তিক হবার পক্ষে তাঁর বয়সটা একটু বেশিই হয়ে গেছে।

কথাটা মাথায় এল হঠাৎই, তিনি কেন ভাবছেন, বিপদ কেটে গেছে? হতেই পারে, যে এসেছিল গতরাতে সে কিছু করতে পারেনি, কিন্তু এখনও রয়ে গেছে এখানেই, সুযোগের অপেক্ষায়। কথাটা ভাবামাত্র উঠে দাঁড়ালেন, এই নির্জন নদীর পারে। তিনি প্রায় একাই, একটু দূরে দাঁতের মাজন হাতে লখন। তিনি দ্রুত পায়ে হাঁটা লাগালেন বাড়ির দিকে। মাথাটা এখন তাঁর পরিষ্কার কাজ করছে, সন্দেহটা দু একবার উঁকি মেরেছিল, এখন মনে হচ্ছে তিনি যা ভেবেছিলেন তাই। শুধু দু-একটা খটকা থাকছে, এত বড়ো বেইমানি করবে? ফাঁকা নদীর পাড় ছেড়ে রাস্তায় পরে কিছুটা আশ্বস্ত হলেন, রাস্তায় অন্য লোক আছে। টাউনের অন্য রাস্তায় ঝাঁটা পড়ুক বা না পড়ুক তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তায় রোজ ঝাঁট দেওয়া হয়। রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটির জমাদার। শুধু অদ্ভুত বিষয় হল, সুদামের বউ এই ভোর বেলায় হনহন করে নদীর দিকে কী করতে যাচ্ছে? এতটাই ব্যস্ত, তাঁকে দেখেও ঘোমটাটা টানল না, তাকে খেয়ালই করেনি। এই বিষয়ে মাথা ঘামানোর সময় তারও নেই, অনেক কাজ তার।

বাড়িতে ঢোকবার মুখে লখনকে বলে গেলেন, 'কালুকে খবর কর, বল আমি ডাকছি, এক্ষুনি যেন এসে দেখা করে।'

বহুদিন পর নিজের হাতে নিজের বাড়ির দরজা বন্ধ করলেন।

## ॥ কুড়ি ॥

মেয়েমানুষ হয়ে জন্মানো মানে সারাটা জীবন দুঃখকষ্টের সাথে ঘর করা এটা তো জানা কথাই, এ নিয়ে কোনো আপশোশ নেই। মেয়েমানুষ মানে, সংসারের কষ্টের ভাগ তার। দুঃখ এই নিয়ে না, দুঃখ এটা—তার কথা, তার চোখের জলের কোনো দাম নেই। কষ্ট পাওয়া তার কপালে লেখা। এই কষ্ট পাওয়াকেই এখন হাতিয়ার করে চেষ্টা করা, যাতে তার কথায় অন্যরা কান দেয়। দেখি, নিজেকে কষ্ট দিয়ে মেরে ফেললে, এদের টনক নড়ে কিনা। সারা রাত এই ঠান্ডায় পড়ে থাকব, অসুখবিসুখ হলে হোক, মরে গেলে মরে যাই।

সব গন্ডগোল করল ওই নব। নবর বউ কিছু দিন তার এখানে তোলা কাজ করত, তার থেকে চেনা। এত বড়ো একটা মদ্দ জোয়ান, বাচ্চাদের মতো ভূত ভূত বলে চিল্লিয়ে দুনিয়ার লোক জড়ো করে বসল। ভগবান জানেন, মায়ের মন কখনও মিথ্যা বলে না। তার সুরোই এসেছে। সন্ধে থেকেই মনটা আনচান করছিল। হে বাবা ভোলানাথ, মায়ের ডাকে সাড়া দিয়েছ, একবার এনে আবার তাকে ফিরিয়ে নিয়ো না।

কিন্তু মানুষটা তার কথা বিশ্বাস করছে না, মা কালীর কিরে কেটে কত বোঝালাম। বলো, এত রাতে বাড়ির সামনে রিকশ করে কে আসবে, শুনলে না, অনেক ঢ্যাঙা—এ আমাদের সুরো ছাড়া কে? উত্তরে একটাই কথা, পাগলামো কোরো না। পাগলামো করছি? ঠাকুরের পা ছুঁয়ে বলো, তুমি চাও না ছেলে ফিরে আসুক? তোমার মন আকুলি-ব্যাকুলি করে না? দুনিয়ার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে, কিন্তু ধর্ম সাক্ষী করা নিজের ছেলের মা-র চোখে ফাঁকি দিতে পারবে না। তা হলে যখন ডেকে তুললাম তখন উঠে বসেই কেন বললে, কই, আমার বাবা কই? আমার মতো তোমার মনও কাঁদে, আমি মেয়েমানুষ সবার সামনে

বুক চাপড়ে কাঁদি, আর তুমি পুরুষমানুষ তাই আড়ালে চোখের জল ফ্যালো। চলো, আমি দেখেছি রাস্তায় আর কেউ নেই। বুড়োবুড়ি মিলে লণ্ঠনটা নিয়ে বেরলে কেউ টের পাবে না। সুরো আড়ালে কোথাও লুকিয়ে পড়েছে, ভয়ে বেরোতে পারছে না। আমাদের দেখলে চলে আসবে। কারোর ঘুম ভাঙবে না, আমি একটু গরম ভাতেভাত করে দেব, খাইয়েদাইয়ে লেপ দিয়ে ওপরের কারের ওপর তুলে দেব, কেউ টের পাবে না। বাকি ব্যবস্থা কাল সকালে দেখা যাবে।

মানুষটা চুপ করে তাকিয়ে রইল, যেন সং দেখছে। হাবভাব দেখলে মাথায় রক্ত উঠে যায়। না, মাথা গরম করা যাবে না। বোঝাতে হবে, সুরোর কত বড়ো বিপদ, বিশু তাকে বুঝিয়েছে।

হ্যাঁ গো, ছেলের আমার খুব বিপদ। পুলিশ তো বলে দিয়েছে, মরে গেছে, এখন যদি দেখে সে মরেনি, তবে ধরে নিয়ে মেরে তো ফেলবেই, লাশও গুম করে দেবে, যেন সুরো বলে কেউ ছিলই না।

—পাগলামো কোরো না, আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ো।

ঠিক আছে, তুমি যখন যাবে না, আমি একাই বেরচ্ছি। ছেলেটা এই অন্ধকারে শীতে জমে যাচ্ছে, বাপ হয়ে তুমি লেপের তলায় শুয়ে আরাম করো, আমি চললাম আমার ছেলেকে খুঁজতে।

—বাড়াবাড়ি কোরো না, আমি দরজায় ভেতর থেকে তালা দিয়ে দেব।

পায়ে পড়ে কাঁদলাম কত, পাষাণ মন কিছুতেই গলল না। ঠিক আছে, আমি পড়ে থাকব এই ঠান্ডা মেঝেতে, দেখি কী করতে পারো? কষ্ট হবে? কষ্টের তোমরা কী জানো? একটা ছেলের জন্ম দেবার কষ্ট, প্রসবযন্ত্রণা—তোমরা পুরুষ মানুষ বুঝবে না। ছেলেটা আমার এই ঠান্ডায় কোথায় পড়ে রইল। ভালোমন্দ যদি কিছু হয়ে যায়, যদি পুলিশ ধরে ফেলে? তবে এত রাতে পুলিশ বোধহয় আসবে না। কাল সকালে আলো ফোটবার আগেই ছেলেটাকে যেভাবে হোক নিয়ে আসতে হবে, পুলিশ বেরোবার আগে।

কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে কখন চোখটা লেগে এসেছিল খেয়াল নেই। আর ঘুমোতে দেখে কখন যেন বুড়োমানুষটা লেপটা গায়ের ওপর দিয়ে গেছে। আর তাতেই এত বড়ো সর্বনাশটা হয়ে গেল, লেপের আরামেই ঘুমটা তাড়াতাড়ি ভাঙল না। যখন চোখ খুললাম, তখন আলো ফুটে গেছে।

মানুষটা তখনো অঘোরে ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক গে। তাকে এখন আর কেউ আটকাবার নেই। চাদরটা গায়ে দিয়ে বাইরে বেরোতেই গায়ে লাগল ঠান্ডা

হাওয়াটা, কিন্তু আজ আকাশ পরিষ্কার, গত দু দিনের মতো মেঘলা না। কেন যেন মনে হল শ্মশানের দিকটা ফাঁকা, ওদিকেই যাই খুঁজতে। তাড়াতাড়ি যেতে হবে, পুলিশের আসবার আগেই। রাস্তায় কেউই নেই, একমাত্র জমাদার রাস্তা পরিষ্কার করছে। একবার জিজ্ঞাসা করব লোকটাকে, কাউকে দেখেছে কি না? না কিছু জিজ্ঞাসা করা যাবে না, উলটোদিক থেকে কারা আসছে। তাড়াতাড়ি পা চালাতে হবে।

শ্মশানটা একদম সুনসান, কেউ নেই। মনে হয় গত কয়েক দিন কেউ আসেনি, ডোমপাড়ারও কেউ নেই। একটা চালার নীচে মা কালীর মূর্তিটার রং কেমন চটে গেছে, দেখলে ভয় লাগে। কিন্তু এবার কোথায় যাই? ডানদিকে ভাঙা ব্রিজটা, ওই ভাঙাচোরা লোহালক্কড়ের পেছনে কোথাও থাকতে পারে লুকিয়ে। ইশ মাগো কী নোংরা, পা ফেলার জায়গা নেই। ডোমপাড়ার লোকেদের কাজ। আজ আর ওসবের দিকে তাকালে চলে? তন্নতন্ন করে খুঁজেও কাউকে পাওয়া গেল না। কেউ কোথাও নেই, সাহস করে ছেলেটার নাম ধরে ডাকলাম, প্রথমে আস্তে আস্তে তারপর গলা তুলে। না, কোনো সাড়া নেই। ডাকতেও পারছি না আর, গলাটা বুজে আসছে। বোধহয় তার ডাকাডাকি শুনে ডোমপাড়ার অল্পবয়সি একটা মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে উঁচু পাড়টায়। অবাক হয়ে তাকিয়ে, বোধহয় তাকে পাগলি ভাবছে।

হ্যাঁরে মা, একটা ছেলেকে দেখেছিস, খুব লম্বা? ঘাড় নেড়ে মেয়েটা চলে গেল উলটো দিকে।

এবার কোথায় যাই? কোথায় খুঁজি ছেলেকে? কোনো বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে? কলকাতায় চলে যাবার পর তো টাউনের বন্ধুদের সঙ্গে আর বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। আর পুলিশের খাতায় মরা যে ছেলে, তাকে ঘরে তুলে বিপদ ডাকবে কে এই টাউনে? এক বিশু যদি কিছু হদিশ দিতে পারে, ও তো পার্টি করে। হয়তো ওদের আলাদা কোনো ব্যাপারস্যাপার আছে। কিন্তু বিশুকে ধরব কী করে? এখন তো ওই পালোয়ান পুলিশটা থাকবে। তাও একবার গিয়ে দেখি, যদি ধরা যায়।

বিশুদের ঘরের [illegible] বন্ধ। নিত্যবাবুদের ছাড়া পাড়ার কোনো বাড়ির দরজাই এখনো খোলেনি। বিশুদের ঘরের বাইরে দাঁড়ালাম চুপ করে, যদি ভেতরে বিশুর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায়। না, কোনো আওয়াজ নেই। একবার বিশু বলে ডেকে দেখব? না, দরকার নেই, বিশুই বলেছিল, ওর সাথে কাউকে কথা বলতে

যদি পুলিশ দেখে, তবে বিশুর খুব বিপদ হবে। না বাবা, বিশুকে বিপদে ফেলে লাভ নেই। বিশুকে আজকে বড়ো দরকার। থাক, পুলিশটা থানায় চলে যাক, তারপর দেখা যাবে।

তার নিজের বাড়িরও কেউ ঘুম থেকে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে না। যাই পাড়ার উল্টো দিকটা একবার দেখি। বটতলার মোড়ে চায়ের দোকানটায় সবে চুলোয় আঁচ দিয়েছে, দাঁড়িয়ে দুটো রিকশ। এদিক-ওদিক কিছু লোকজনও দেখা যাচ্ছে। কাকে জিজ্ঞাসা করব? যাকে তাকে জিজ্ঞাসা করার বিপদও আছে, সন্দেহ করে কেউ যদি আবার পুলিশের কাছে খবর দিয়ে দেয়। সুরোর ব্যাপারটা তো টাউনের সবাই জানে। যাই, ঘরে ফিরে যাই। ভগবানের যদি দয়া হয়, আজই ছেলে তার কাছে ফিরে আসবে।

কালীবাড়ির দরজাটা খুলেছে, যাওয়ার সময়ও বন্ধ ছিল। হঠাৎই মনে হল, কালীবাড়িটা রাত্রিবেলায় লুকিয়ে থাকার ভালো জায়গা। ধর্মেকর্মে ছেলের কোনোদিনই মতি নেই, কিন্তু বুদ্ধি করে রাতে কালীবাড়িতে ঢুকে পড়তে পারে। মন্দির ফাঁকা, একমাত্র পুরুতমশাই মায়ের মূর্তির নীচে বসে কী সব করছেন। সবসময় থাকে যে বুড়িটা, তাকে কোথাও চোখে পড়ছে না। এদিক-ওদিক ভালো করে দেখেও কিছু নজর পড়ল না। না, ঠাকুরমশাইকে জিজ্ঞাসা করি, লোকটা ভালোমানুষ গোছের, কোনো ক্ষতি করবে না।

—না মা, এই তো সবে দরজা খুললাম, আপনিই প্রথম এলেন।

—কাল রাতে?

—না, না, রাতে কী করে আসবে? দরজা তো সন্ধ্যা-আরতির পরই বন্ধ হয়ে যায়।

পুরুতমশাই আবার নিজের কাজ নিয়ে পড়লেন। কেউ নেই, প্রথমে মন্দিরের পেছনটা, তারপর পুরুতমশাইয়ের ঘরটা ভালো করে দেখলাম। পাশের ছোটো ফাঁকা জায়গায় দু-তিনটে লংকাজবা আর শিউলিগাছ. তার পেছনে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে না।

কী করি এখন? ঘরে ফিরেই-বা কী লাভ? তার থেকে মায়ের পায়ের তলায় হত্যে দিয়ে পড়ে থাকি, মা যদি একবার মুখ তুলে তাকান। বসে রইলাম মন্দিরের সিঁড়িতে। ভালো করে মূর্তির দিকে দেখলাম, এত ভালো করে বোধহয় আগে কখনো দেখিনি। মায়ের গলায় মুণ্ডমালা, কিন্তু মুখখানি বড়ো প্রসন্ন, যেন সবার মা।

মা গো, ছেলেটাকে ফিরিয়ে দাও মা। তুমি নিজে তো মা, তুমি তো বোঝো মায়ের কষ্ট। হয় আমার ছেলেটাকে ফিরিয়ে দাও, তা না হলে এই মেয়েটাকে তোমার কাছে টেনে নাও। আমি আর সইতে পারছি না। কী হবে আজ আমি মরলে? বুড়োমানুষটা কষ্ট পাবে, আর সুবোধটা বড়ো হয়নি এখনো, ওর একটু অসুবিধা হবে। দেখবে, বড়ো বউমা সবাইকে দেখবে। মেয়েটা মুখরা, কিন্তু মনটা ভালো। আমি যাই আমার সুরোর কাছে। যদি সত্যি পুলিশে মেরে থাকে, কী কষ্ট পেয়েছে ছেলেটা! লাঠির বাড়িতে তরতাজা ছেলেটা ছটফট করতে করতে মরেছে। গিয়ে সুরোকে কোলে শুইয়ে ওর ব্যথার জায়গায় হাত বুলিয়ে দেব, ওর সব ব্যথা কমে যাবে। জলে চোখটা ঝাপসা হয়ে আসছে, মূর্তির মুখটাও স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে, মা কালীর চোখেও জল। না, জল কই? এখন তো মনে হচ্ছে মা হাসছে। তা হলে কি মা মুখ তুলে তাকাল? হয়তো ছেলেটা সত্যি ফিরে এসেছে। আমি একদিক দিয়ে বেরিয়েছি, অন্যদিক দিয়ে সুরো এসেছে। একটা প্রণাম ঠুকে ছুটলাম বাড়ির দিকে।

মন্দিরের দরজায় দাঁড়াতেই নিজের বাড়ির দরজায় চোখ পড়ল।

মা, তোর মনে এই ছিল! বাড়ির দরজায় পুলিশ। কে যেন আঠা দিয়ে আমায় কালী মন্দিরের দরজায় সেঁটে দিল, নড়বার ক্ষমতাও নেই। নীরেনদারোগা আর তার সাথে আরো দুটো পুলিশ। দরজায় দাঁড়িয়ে বড়ো ছেলে সুকু, হাত-পা নেড়ে সুকু কী সব বলছে পুলিশকে। সুকুর কথা শেষ হতে নীরেনদারোগা আঙুল তুলে কী সব বলল, বোধহয় ধমকাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে দলবল নিয়ে দারোগা চলে গেল। ওরা জেনে গেছে সুরোর কথা, সর্বনাশ হয়ে গেল। সুকুকে ধরলাম উঠোনের মাঝখানে।

—পুলিশ কী বলছিল?

—ওই, কাল রাতে কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করছিল।

—তুই কী বললি?

—কী আর বলব, বললাম যা হয়েছে। একটা রিকশওয়ালা ভূত ভূত বলে চ্যাচাচ্ছিল।

—সত্যি কথা বল, পুলিশ আর কী বলছিল?

—বোঝো ঠ্যালা, এর মধ্যে আবার সত্যি-মিথ্যে এল কোত্থেকে?

সুকু তার কাছে কথা লুকোচ্ছে।

—মা কালীর দিব্যি করে বল, ওরা সুরোর ব্যাপার কী জিজ্ঞাসা করছিল? কখন বউমা এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করিনি। ঝনঝন করে উঠল তার কথা,

—মা, পেটে ন মাসের বাচ্ছা, সারাক্ষণ মরা ঠাকুরপোর নাম করে তার অমঙ্গল করবেন না।

শোনো কথা, আমি অমঙ্গলের জন্য বলছি? কথার ফাঁকে সুকু ঢুকে গেল তার ঘরে। এ মেয়েকে কী বলব, কিছু বললেই অশান্তি, চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করবে। ক্লান্ত হয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার শ্বশুরমশাই কোথায়?

'দোকানে চলে গেছে', বলে সেও ঘরে ঢুকে গেল।

এই বিপদের মধ্যে কেবল একটা কথাই মনে হল, সুরোর খোঁজ করছে মানে সুরোকে এখনো ধরতে পারেনি। ওরা ওকে ধরবার আগে সুরোকে খুঁজে বার করতে হবে। কিন্তু সুরো কোথায়?

## ॥ একুশ ॥

একটা পূর্ণবয়স্ক মানুষ এতটা ভয় পেতে পারে, নিজের চোখে না দেখলে সে বিশ্বাস করতে পারত না। ভূতের ভয় তো অনেকেই পায়, তাই বলে এতটা! ভূত, প্রেত, দেও, এসবে পবন ভয় পায় সেটা জানাই ছিল। চারদিকে নাকি নানা রকম ভূতপেতনি, অপদেবতা ঘুরে বেড়ায় এ ধারণাটা পবনের বদ্ধমূল। তাকেও নানা রকম গল্প বলত। সুযোগ পেলে রামনাম করার অভ্যাসটা কতটা রামের প্রতি ভক্তিতে আর কতটা ভূতের ভয়ে এটা তার সন্দেহ হতই। কিন্তু এতদিনকার এই সব ভূত তো দূরের ভূত, অন্যের কাছে শোনা গল্পের ভূত। এ একদম জলজ্যান্ত একটা লোক ভূত দেখে ঘরের দরজায় অজ্ঞান হয়ে পড়ল, মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে, ভূতের এত কাছে পবন কখনো আসেনি। ভিড়ের মধ্যে পবন কোথায় ছিল, সেটা সে খেয়াল করেনি। আদপেও বাইরে বেরিয়েছিল কিনা তাও সে জানে না। কিন্তু সব কিছু মিটে যাবার পর ঘরে ঢুকে পবনকে দেখে তার মনে হল, এর থেকে বাইরের ঝামেলাটা অনেক ভালো ছিল। এক কথায় হিস্টিরিয়া। তাকে শান্ত করা, তাকে আশ্বস্ত করা তার কম্মো না। একবার ভাবলও যাই ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনি। এ সব ভূতটুত কিছু নেই, সব ওই রিকশওয়ালাটার মনের ভুল বলে বোঝাতে গিয়ে বিপদ আরো বাড়ল। লোকটা এবার ডাক ছেড়ে কাঁদতে শুরু করল, এ সব বললে নাকি 'দেও'দের আরো 'গুসসা' হবে এবং তারা দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়বে তাদের ওপর।

বোঝা গেল, এই লাইনে গেলে বিশেষ সুবিধা হবে না। তাই গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কান্না থামিয়ে পরামর্শ দিল, এক মনে রামনাম করলে কেউ কিছু করতে পারবে না। এতে বরং কিছুটা কাজ হল। কিছুটা শীতে আর বাকিটা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পবন চৌকিতে বসে কান্না বোজা হেঁড়ে গলায় রামনাম শুরু করল।

এ তো ভালো আপদ হল, ঘুম পেলেও তার আজ আরো কাজ আছে। মাথা

ঠান্ডা করে এক্ষুনি তার ভাবা দরকার। রাতের ঘটনা থেকে যা বোঝবার, তা সে বুঝে নিয়েছে। এবার তাকে ঠিক করতে হবে পরবর্তী পদক্ষেপ। কিন্তু কানের কাছে এই ভয়ে কাদা হয়ে থাকা পুলিশের বাচ্চার রামনাম চললে তো কিছু করা যাবে না। কিছুক্ষণ পর একটু শান্ত হতে সে প্রস্তাব দিল, এবার লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়া যাক। এতে আরো এক প্রস্থ কাকুতিমিনতি শুরু হল। প্রথম আবদার, আলাদা চৌকিতে শুতে পারবে না, তার চৌকির এক কোণে শুয়ে থাকবে। পাগল! এ ব্যাপারটায় নিরস্ত করা গেল। শেষমেশ রফা হল, ঘরের আলো নেভানো হবে না, আর সে-রকম কিছু হলে তাকে ডাকবে পবন।

যাক আপাতত রেহাই। সে দ্রুত গত আধঘণ্টার ঘটনাগুলো ভাবার চেষ্টা করল। ভূতফুত বোগাস, কেউ একজন এসেছে, কিন্তু রিকশওয়ালাটা ভূত ভেবে চ্যাঁচামেচি করায় সে কোথাও লুকিয়ে পড়েছে। এই টাউনের কেউ না, কিন্তু সে জায়গাটা চেনে, কারণ সে রিকশয় উঠে পরিষ্কার বলেছে, নতুনপল্লিতে নিয়ে চলো। কে হতে পারে, তার থেকে বড়ো প্রশ্ন হল, কার কাছে এসেছে। সে নিশ্চিত লোকটা এসেছে তার কাছেই।

কাতর গলায় পবনের ডাক

—বিশু ভাইয়া।

—কি হল?

—পিসাব পেয়েছে।

বোঝো ঠ্যালা।

—ঠিক আছে আমি এখান থেকে দেখছি, তুমি যাও।

না, তাতে হবে না। সঙ্গে সঙ্গে বাথরুম পর্যন্ত যেতে হবে। মাঝখানের অন্ধকার উঠোন একা একা কিছুতেই পার হতে পারবে না, আর অবস্থা নাকি এতটাই সঙ্গিন যে কোনো মুহূর্তে বিছানাতেই হয়ে যেতে পারে। আরো বড়ো কেলেঙ্কারি ঠেকাতে, মনে মনে 'শুয়োরের বাচ্চা' বলে গালাগাল দিতে দিতে তাকে উঠতেই হল। ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে সে অন্ধকার উঠোনে দাঁড়িয়ে রইল, আর সরকারের আইনরক্ষকটি বাথরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে সশব্দে পেচ্ছাপ করলেন।

সকালবেলায় লোকটি এসে তার ঘরটা চিনে গেছে, অন্য লোক চলে না আসলে হয়তো তার সঙ্গে কথাও বলত। কিন্তু পরের লোকের কাছে ঠিক খবর পৌঁছে দিয়েছে। পরের লোকটি ভুল করেছে সময় বাছতে। রিকশওয়ালাটা একদিক থেকে ভালো কাজই করেছে। এই রাতে যদি যোগাযোগ করার চেষ্টা

করত, তবে পবন জেনে যেত, তার থেকে ভালো হয়েছে, রাতে কিছু করতে পারেনি। এত কাণ্ডের পর এই ঠান্ডায় আজ রাতে নিশ্চয়ই আর একবার চেষ্টা করবে না। কিন্তু এও তো হতে পারে সে যা ভাবছে তা নয়, অন্য কেউ এসেছে, অন্যের কাছে, অন্য উদ্দেশ্যে। কিন্তু দোলার চিঠি, সকালের লোকটা আর রাতের আগন্তুক, সব কিছু ইঙ্গিত করছে এক দিকেই। অবশেষে তার জন্য মুকুলদির লোক, পার্টির লোক এসেছে—তার অসম্ভব হালকা লাগছে। ঘুমে চোখটা জড়িয়ে আসছে, তার মনে হল, আজ রাতে মিলিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারলে বড়ো ভালো হয়।

ঘুমটা ভাঙল পবনের ধাক্কাধাক্কিতে। ঘুমটা ভাঙতে ভাঙতেই মনে হল, অনেক বেলা হয়ে গেছে। কিন্তু চোখ খুলতেই থানার বড়োবাবু, এটা অপ্রত্যাশিত। বড়োবাবু তার পুলিশের পোশাকে, অর্থাৎ 'অন ডিউটি'। সে ধড়মড় করে উঠে বসল একটা বিপদের আশঙ্কা নিয়ে, তা হলে কি পুলিশ সবটা জেনে গেছে?

—আপনারা কলকাতার লোকেরা বড়ো বেলা পর্যন্ত ঘুমোন, আমরা গাঁয়ের লোকেরা অনেক ভোর ভোর উঠে পড়ি। কাজেই সরি, আপনার ঘুম ভাঙালাম।

নীরেনদারোগার গলায় প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ। মাথা গরম করলে চলবে না। পবনের বড়োসাহেব পবনের মতো নিরেট নয়, যথেষ্ট ধূর্ত। কথা বলতে হবে ন্যাকার মতো, যেন কিছু হয়নি।

—যান, ভালো করে চোখে মুখে জল দিয়ে আসুন, আপনার সাথে কিছু কথা আছে।

—না না, বলুন আমার কিছু লাগবে না এখন।

কেমন ভয় লাগছে। হঠাৎ মনে হল, লোকটা কি পবনকে আজকেও চা আনতে বলবে? সে সব দিকে না গিয়ে, সরাসরি প্রসঙ্গে চলে এল,

—কাল রাতে ঠিক কী হয়েছিল বলুন তো।

গলাকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে সে উত্তেজনাহীন ভঙ্গিতে আগের রাতের ঘটনার বিবরণ দিল।

—আচ্ছা বিশুবাবু, আপনার কী মনে হয়?

—কী আর মনে হবে, রিকশওয়ালাটা অন্ধকারে শীতে কী দেখতে কী দেখেছে, ভয় পেয়ে চেঁচিয়েছে।

—কী দেখে চেঁচিয়েছে?

লোকটা এখন পুরোদস্তুর জেরা করছে।

—ওই তো কী বলল, স্টেশন থেকে প্যাসেঞ্জার নিয়েছিল, সেই প্যাসেঞ্জার এখানে  নেমে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

—আরে, রিকশওয়ালা কী বলেছে আমি জানি, আমি আপনার কাছে জানতে চাই, লোকটা কে?

—কোন লোকের কথা বলছেন?

অদ্ভুত একটা হাসি দিয়ে বলল,

—আপনার জায়গায় আমি থাকলেও প্রথমে এই উত্তরটাই দিতাম। কিন্তু শেষমেশ আপনাকে আসল কথাটা তো বলতেই হবে।

কোর্টে প্রডিউস করার আগেও থানায় নিয়ে অনেকক্ষণ জেরা করেছিল, কিন্তু তখনো এতটা নার্ভাস লাগেনি।

—বলুন বিশুবাবু, আপনি তো বুদ্ধিমান মানুষ, আপনার কী মনে হয় কে এসেছিল কাল রাতে?

—আচ্ছা অদ্ভুত, আমি কী করে বলব? আমি তো কাউকে দেখিনি। আর আমি তো এখানের কাউকে চিনিও না, যে আন্দাজ করব।

—ঠিকই, আপনি এখানকার কাউকে চেনেন না। কিন্তু আমি এখানকার সবাইকে চিনি। এদের নাড়ি-নক্ষত্র সব জানি। এদের অতীত, বর্তমান এমনকী ভবিষ্যৎও জানি। আমি এখানকার ভগবান।

লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল লোকটা সিরিয়াসলি কথাটা বলছে।

—এদের কারো কাছে কেউ আসেনি। আসলে এই টাউনে এমন কিছু হয় না, যা হওয়ার কথা নয়। কাল রাতে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে।

লোকটা এরপর চুপ করে গেল। হঠাৎ গলা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল,

—আপনার ঘনিষ্ঠ কমরেডদের মধ্যে কে খুব লম্বা?

না, মুখোমুখি সংঘাত ছাড়া কোনো আর রাস্তা নেই। গলা তুলেই সে বলল,

—ক-জনের নাম বলব?

লোকটা ধুপ করে উঠে পড়ল, তারপর পবনের দিকে তাকিয়ে বলল, চলো। এই ফাঁকে কখন যেন পবন তার ড্রেস-ট্রেস পরে রেডি হয়ে গেছে। তারপর তার দিকে তাকিয়ে বলল,

—আর অর্ডার না দেওয়া পর্যন্ত আপনাকে আর থানায় গিয়ে হাজিরা দিতে হবে না। থানার কেউ এসে আপনার হাজিরা নিয়ে যাবে রোজ। আর যদি নিজের ভালো চেয়ে কোঅপারেট করতে রাজি থাকেন, তা হলে অবশ্য অন্য কথা।

বাইরের তালা দেবার আওয়াজ বুঝিয়ে দিল, আসল বন্দিদশা এবার থেকে শুরু হল। কিন্তু তার অতটা খারাপ লাগছে না। যাক এবার কিছু একটা হবে। এই অসহ্য অবস্থাটা ভাঙবে।

তা হলে পার্টি তার জন্য চলে এসেছে, থ্যাংক ইউ মুকুলদি। তার গলা খুলে গান গাইতে ইচ্ছে করছে। দারোগার জেরা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, ঘটনাটা আন্দাজ করলেও নির্দিষ্ট কিছু এখনো জানতে পারেনি। তার জন্য যে কমরেড এসেছে, সে নিশ্চয়ই সাবধানে কাজ করবে। তবে দারোগার বুদ্ধির প্রশংসা করতে হবে। ঠিক আছে শ্রীযুক্ত নীরেন মাইতি, এবার দেখা যাবে কার বুদ্ধি বেশি। রাষ্ট্রের, না বিপ্লবী পার্টির। বাইরের দরজায় যত খুশি তালা লাগাও। শুধু একটা সিগনালের অপেক্ষা, উঠোনের ওই প্রাচীর টপকাতে তার এক সেকেন্ডও লাগবে না। আর পবন? ভূতের ভয় দেখিয়ে দেব। সে একা একাই কিছুক্ষণ হো হো করে হাসল।

## ॥ বাইশ ॥

ঘুম থেকে উঠেই প্রথম যেটা মনে হল, শরীরটা ভালো নেই। রাতেও ঘুম ভালো হয়নি, বার বার ভেঙে যাচ্ছিল। এখন মনে হচ্ছে জ্বরজ্বর। কী করবে? মাকে বললেই এমন হইচই লাগিয়ে দেবে। তার থেকে এখন কিছু বলার দরকার নেই, যদি জ্বর খুব বেড়ে যায়, তখন দেখা যাবে। অবশ্য শরীরের কোনো দোষ নেই, কাল রাতে ঠান্ডাটা বাড়াবাড়ি রকমের লাগিয়েছে। প্রথমে ছাদে, তারপর বারান্দায়, প্রায় ঘণ্টা খানেক। আর যা ঠান্ডা পড়েছে!

সত্যি কাল রাতে অদ্ভুত কাণ্ড হল, জীবনে এ রকম সে দেখেনি! রিকশওয়ালাটা যেভাবে চেঁচিয়েছিল, ভাবতে এখনো বুকটা ধক করে উঠছে। প্রথমে তো সে ভেবেছিল নিজেই ছুটে নেমে যাবে নীচে। অবশ্য যায়নি ভালোই, এই অবস্থায় নীচে নামলে মা তাকে আস্ত রাখত না। তার ডাকাডাকিতে মা-ও উঠে এসেছিল, মা তো তাকে বারান্দায়ও দাঁড়াতে দিচ্ছিল না। সেটা কোনোভাবে ম্যানেজ হয়েছিল, কিন্তু যতক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, মা সারাক্ষণ ঠাকুর দেবতার নাম করছিল আর এত রাতে নীচে নেমেছে বলে বাবাকে গালমন্দ করছিল। ঠিক কী হয়েছে এই ব্যাপারে মার মনে কোনো সন্দেহ নেই, মা একশো ভাগ নিশ্চিত অনন্তবাবুর আত্মা এসেছে। অপঘাতে মৃত্যু হলে এ হতে বাধ্য, এখন এ রকম নাকি রোজই হবে। আজকাল মার কথায় হাসিই পায়।

রাতে ফিরে বাবা বলছিল, এই রকম ভূত দেখা নাকি এক ধরনের মানসিক অসুখ। রিকশওয়ালাটা কোনো কারণে ভয় পেয়েই ছিল, আর ছিল সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত। এ রকম সময় নাকি মানুষ নানা কাল্পনিক জিনিস দেখে, বাবা ইংরেজিতে বলেছিল, হ্যালুসিনেশন। এই সব শুনে মা গেল আরো রেগে, আর রেগে গেলেই মা চ্যাঁচামেচি করে। বাবার এই 'দু পৃষ্ঠার বিলিতি বিদ্যার' জন্যই নাকি বাবার নিজের আর বাড়ির সবার একদিন ভয়ংকর বিপদ হবে। মায়ের

পরিষ্কার মত, এ সব বাবার মতো ডাক্তারের কাজ না, ডাকতে হবে ওঝা, আর সবচেয়ে ভালো হবে, যদি কেউ গয়ায় গিয়ে অনন্তস্যারের পিন্ডি দিয়ে আসে।

কলের জলটা বরফের মতো ঠান্ডা, কিন্তু ওই জলে হাত-মুখ ধোবাব পর ভালোই লাগছিল। তখনই কালীদি খবর দিয়ে গেল, ইন্দ্র এসেছে। কিছুটা অবাক হবার মতোই ঘটনা। ছুটির দিন না হলে ইন্দ্র সকালে আসে না। কী হল আবার? ইন্দ্রকে বসানো হয়েছে তার ঘরেই। মা খুব উত্তেজিত হয়ে কাল রাতের ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছে এবং ইন্দ্রও খুব উৎসাহের সঙ্গে সেই বর্ণনা শুনছে। কথাবার্তায় বোঝা গেল, সাত সকালে ইন্দ্রের আগমন কাল রাতের ঘটনার খোঁজখবর নিতেই। গোটা কথোপকথনে সে নীরব শ্রোতা। 'দাঁড়াও তোমাদের চা পাঠাই', বলে মা চলে যাবার পরই সে কথা বলার সুযোগ পেল,

—তোমার আজ অফিস নেই?

ঘাড় নেড়ে ইন্দ্র সম্মতি জানাল।

—যাবে না?

—যাব, কিন্তু তোমাদের খোঁজ নিতে এলাম, কী হল কাল রাতে?

—তোমাকে খবর দিল কে?

—খবর? গোটা টাউন জুড়ে তোলপাড় হচ্ছে। তুমি ঘুম থেকে দেরি করে উঠেছ বলে কিছু টের পাওনি। বাইরের রাস্তায় তাকিয়ে দ্যাখো, তোমাদের গলিতে গোটা টাউন ভেঙে পড়েছে। সবাই ভূত দেখতে এসেছে।

এবার তার অবাক হবার পালা। ইন্দ্র যা বলল, ভোর থেকে গোটা টাউনে একটাই আলোচনা, এখন দলে দলে লোক আসছে নতুনপল্লি দেখতে। তারপর ইন্দ্রর জিজ্ঞাসা,

—তুমি তো ছিলে, কী হল বলো তো কাল?

—শুনলে তো মার কাছে।

—কিন্তু নীচে আসবার সময় ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা হল, উনি তো বললেন, কিছুই হয়নি, সবটাই ওই রিকশওয়ালার মনের ভুল।

—ভূত-ফুত বাজে কথা, তবে কেন জানি আমার মনে হচ্ছে, লোকটা একদম বাজে কথা বলছে না, কেউ একজন সত্যি এসেছিল।

—কে এসেছিল?

—সেটাই তো কেউ বলতে পারছে না। তবে মনে হয়, জানা যাবে।

—কী করে জানা যাবে, কেউ তো কিছু বলতে পারছে না?

—অন্য কেউ বলবে কেন, যে এসেছে সে নিজে এসেই বলবে।

—না, না। ব্যাপারটা এ রকম হালকা করে দেখা উচিত না।

—এতে হালকা বা ভারীর কী আছে, কেউ আসতে পারবে না?

কালীদি লুচি আর বেগুনভাজা দিয়ে গেছে। লুচি ইন্দ্রর প্রিয় খাবার। সে নিশ্চিত, ইন্দ্র বাড়ি থেকে বেরোবার সময় খেয়েই বেড়িয়েছে, কিন্তু পরম তৃপ্তির সঙ্গে লুচি খাওয়া দেখে তা বোঝার উপায় নেই। কিন্তু সেই প্রিয় খাবার খেতে খেতে ইন্দ্র রেগে গেল,

—কেউ না ডাকলে একটা অপরিচিত লোক এই টাউনে কেন আসবে? আর যদি আসে, বুঝতে হবে, কোনো বদ মতলব নিয়ে এসেছে।

—আচ্ছা, হতেই তো পারে, কেউ ডাকেনি, কিন্তু লোকটা এসেছে আমাদের ভালো করার জন্য।

—না, তা হতেই পারে না।

ইন্দ্রকে রাগাবার মতো করে সে বলল,

—ধরে নাও লোকটাকে আমিই ডেকেছি?

ইন্দ্র রাগল না, উল্টে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করল,

—তুমি ডেকেছ? কিসের জন্য?

সে-ও হাসিমুখে জবাব দিল,

—অনেক কাজ আছে।

—কী কাজ শুনি?

—ঘড়ির মোড়ের বন্ধ ঘড়িটা আবার চালিয়ে দেবে।

—শুধু এই?

—আমাদের নদীর ওপর ভাঙা ব্রিজটা তৈরি করে দেবে।

—আর?

—আমাকে ঘোড়ায় চড়তে শেখাবে, মুখে লাগাম লাগিয়ে আমি ইচ্ছে মতো তাকে যেদিকে চাই সেদিকে নিয়ে যাব।

ইন্দ্র এখন হো হো করে হাসছে,

—আর কিছু না?

ইন্দ্রর চোখে চোখ রেখে সে বলল,

—যাবার আগে সে এই টাউনটাতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে যাবে।

—আগুন?

—হ্যাঁ, আগুন, গোটা টাউনটা জ্বলে খাক হয়ে যাবে। কিচ্ছু থাকবে না, একটা বেড়াল-কুকুরও থাকবে না।

ইন্দ্রর মুখে হাসি নেই, উল্টে উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল,

—কী হয়েছে তোমার?

—কিছু হয়নি।

—না না বলো, কী হয়েছে?

শুধু শুধু বেচারাকে ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই। এবার সে হাসিমুখেই বলল,

—সত্যি কিছু হয়নি।

—তুমি বলছ না।

—এই একটু শরীরটা খারাপ, বোধহয় ঠান্ডা লেগেছে।

—বাবাকে দেখিয়েছ? ওষুধ খেয়েছ?

—আরে, ওষুধ খাবার মতো কিছু না।

একটু ভয়ে ভয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে ইন্দ্র তার কাছে এগিয়ে এসে হাতটা ধরে বলল,

—দেখি, জ্বর এসেছে নাকি?

ইন্দ্রর হাতটা ঠান্ডা আর বাচ্চাদের মতো নরম। ছুটন্ত ঘোড়ার লাগাম দূরে থাক কোনো দিন কোনো কিছুকে এ হাত জোরের সঙ্গে ধরেছে বলে মনে হয় না। ইন্দ্র তার হাত ধরে আছে, ভালো লাগছে তার। কেমন অসহায় ভাবে ইন্দ্র বলল,

—তোমার কিছু হলে আমার ভীষণ কষ্ট হয় সোনা।

সে তার হাতটা রাখল ইন্দ্রর গালে। কেমন যেন মনে হল ইন্দ্রর গোটা শরীরটা কেঁপে উঠল। সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ইন্দ্রর দিকে। ইন্দ্র কী সুন্দর! একটা গোল গলার সোয়েটার পরে আছে, শার্টের কলারের ফাঁক দিয়ে কাঁধের একটা অংশ দেখা যাচ্ছে, যেন শ্বেতপাথরে তৈরি। হঠাৎ বাচ্চাদের মতো চোখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল ইন্দ্রর।

—তোমার শরীর খারাপ, তুমি শুয়ে থাকো, আমি অফিসে মুখটা দেখিয়েই চলে আসছি। তারপর আমরা সারা দুপুর গল্প করব, আমার যে কত কথা বলা দরকার তোমার সঙ্গে!

সে শুধু মাথা নেড়েছিল, আর কান্নাকান্না মুখ করে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করল,

—আসব না আমি?

—আসতে পারো, যদি আমাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাও।

—কোথায়?

—নদীর ওপারের মাঠে।

—ধ্যাত, ওখানে কেউ যায় নাকি?

—আমি যাব।

—কাঁটাঝোপে ভর্তি।

—তাতে কী হয়েছে?

—সাপ আছে।

—শীতকালে সাপেরা ঘুমোয়।

—ওখানে নাকি বুনো কুকুর আছে।

—ওরা মানুষকে কিছু করে না।

—আচ্ছা, ওপারে গিয়ে কী করবে?

—সাঁওতালদের গ্রামে যাব।

—সাঁওতালদের গ্রাম? সে কোথায়?

—অনেক দূরে, পাহাড়ের নীচে।

—আমি চিনি না।

—সে তো আমিও চিনি না।

—তা হলে চিনিয়ে দেবে কে?

—লোক আছে।

—কে?

—ধরো, কাল রাতে যে এসেছে।

কেমন হাল ছেড়ে দেবার মতো করে ইন্দ্র বলল,

—তোমার আজ কী হয়েছে? তোমার শরীরটা সত্যিই খারাপ।

হাসতে হাসতে সে জবাব দিল,

—উল্টো, আমার আজ ভালো লাগছে।

—ভালো লাগছে?

—হ্যাঁ, ভালো লাগছে। দ্যাখো, কাল রাতে এখানে কেউ একজন এসেছে যাকে আমরা কেউ চিনি না। সে কেন এসেছে, আমরা জানি না। ভালো না?

—এতে ভালোর কী দেখলে?

—আচ্ছা, এ রকম আগে কখনো হয়েছে? দ্যাখো, এই টাউনে প্রত্যেকটা দিন এক রকম। আমরা সবাই জানি কী হবে, কে আসবে, কে যাবে। এখানে নতুন কিচ্ছু হয় না। যাই হোক, একটা কিছু তো নতুন হচ্ছে। দ্যাখো, এবার সব কেমন পাল্টে যাচ্ছে।

—পাল্টে যাচ্ছে?

—পাল্টাচ্ছে না? তুমিই তো বললে, গোটা টাউন জুড়ে তোলপাড় হচ্ছে, সবাই এই একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছে, গোটা টাউন নতুনপল্লিতে সেই লোককে খুঁজতে আসছে। এই যে তুমি, কোনোদিন সকাল বেলায় আসো না, ওই লোকটার জন্য আজ সাতসকালে আমার কাছে চলে এসেছ।

—তোমার কথার কোনো মাথামুন্ডু আমি বুঝছি না। যাই বলো ভাই, এই একটা অচেনা অজানা লোক গভীর রাতে টাউনে ঢুকল, ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছে না।

—ঠিক আছে বাবা, অফিস আছে। এবার যাও।

কেমন ইতস্তত করে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করল,

—যাব?

—হ্যাঁ যাও, তুমিই তো বলেছিলে, ভালো করে কাজ করলে তোমার একটা বড়ো প্রোমোশন হতে পারে।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল ইন্দ্রর মুখ,

—হ্যাঁ গো, অনেক বড়ো প্রোমোশন। তবে বড়ো পিশেমশাইকে আমি বলে রেখেছি, আমার প্রোমোশন চাই, কিন্তু ট্রান্সফার না। এই টাউন ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না, সবে আমার ক্লাবের টিমটা দাঁড়াচ্ছে। আমি চলে গেলে এ সব সামলাবার কেউ নেই। তবে প্রোমোশনটা হয়ে গেলে, অনেক মাইনে বাড়বে।

তারপর হঠাৎ গলা নামিয়ে বলল,

—তোমাকে একটা কথা বলব? আমি না ভেবেছি, প্রোমোশনটা হয়ে গেলে একটা ল্যান্ডমাস্টার কিনব, কালো। তোমাকে পাশে বসিয়ে আমি ড্রাইভ করব। অনেক টাকা, তুমি যা বলবে, আমি তাই করব। যত টাকা লাগুক, আমি ঘড়ির মোড়ের বড়ো ঘড়ি সারিয়ে আনব। তোমাকে নিয়ে ড্রাইভ করে দূরের কোনো সাঁওতালদের গ্রামে নিয়ে যাব, তুমি সাঁওতাল মেয়েদের কাছ থেকে লম্বা লম্বা কানের দুল কিনবে।

—সে দেখা যাবে, তুমি যাও, অফিসে লেট হয়ে যাবে।

ইন্দ্র চলে যাবার এক মিনিটের মধ্যে হুড়মুড় করে ছুটে এল মা,

—হ্যাঁ রে, তোর নাকি জ্বর এসেছে? আমায় বলিসনি তো কিছু?

সত্যি ইন্দ্রর পেটে কোনো কথা থাকে না।

## ॥ তেইশ ॥

রাত্রিবেলায় ডাক্তারবাবু যে ওষুধটা দিয়েছিল সেটা বোধহয় ঘুমের ওষুধ, তা না হলে এ রকম মড়ার মতো ঘুম হবে কেন? বাইরের আলো দেখে মনে হচ্ছে অনেক বেলা হয়ে গেছে। উঠতে গিয়ে মনে হল, আর একটু শুয়ে থাকতে পারলে ভালো হত, কিন্তু এত বেলা পর্যন্ত শুয়ে থাকা, কোনোদিন হয়নি। তবে হ্যাঁ, ঘুমের ওষুধও সে কোনোদিন খায়নি।

উঠে বসামাত্র কাল রাতের কথা মনে পড়ে গেল, ওষুধের ঘুমে ওসব কথা সে বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। রাতের কথা মনে পড়তেই চমকে উঠল ভয়ে এবং খেয়াল হল চম্পা ঘরে নেই, সে একা। কোথায় গেল চম্পা? কিন্তু দিনের আলো দেখা যাচ্ছে, বাইরে লোকজনের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, এখন কিছু ভয় নেই। তবুও সে ধড়মড় করে উঠে বসল। বেরিয়ে এল বাইরে, কাঁথাটা গায়ে দিয়েই। বাঃ, চড়া রোদ উঠেছে! কিন্তু চম্পা কই? হঠাৎ মনে পড়ল, সকালবেলা তাকে ধাক্কা দিয়ে তুলে চম্পা কী সব বলছিল, হালকা মনে পড়ছে, কী সব বলে যেন কিরে কাটাচ্ছিল তাকে দিয়ে। কিন্তু মুশকিল হল, চম্পা কী বলেছিল, কী কিরে কাটিয়েছিল, এখন ঘুম থেকে উঠে কিচ্ছু মনে পড়ছে না।

কাল রাতে তার থেকেও হাল খারাপ হয়েছিল চম্পার। নতুনপল্লির ছেলেরা তাকে পৌঁছে দিয়েছিল দল বেঁধে। ওরা না আসলে নব একা ওই রাতে ঘরে এসে পৌঁছোতে পারত না। মনে হচ্ছিল, চারদিকের অন্ধকার থেকে কারা যেন বেরিয়ে আসছে তাব দিকে। এমনিতে ওই ঠান্ডা, তার মধ্যে শালা লখন গায়ে ঠান্ডা জল ঢেলে দিয়েছিল। কাঁপতে কাঁপতে তার পাঁজরার ভেতর পর্যন্ত ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। নতুনপল্লির ছেলেদের চ্যাঁচামেচিতে তাদের বস্তির লোকেরাও উঠে এসেছিল। চম্পার এমনিতেই ভীষণ ভূতের ভয়, আর সব শুনে তার তো প্রায় নাড়ি ছেড়ে যায়। ডাক ছেড়ে মড়াকান্না শুরু করে দিল। তাকে ছেড়ে লোকজন চম্পাকে নিয়ে ব্যস্ত। কারা সব শিবের প্রসাদি বেলপাতা নিয়ে এল।

ওই রাতে পাড়ার লোকেরা কালীথানের ওখান থেকে গুনিনকে তুলে আনল। তার ওসব কিছু ভালো লাগছিল না, ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। শুধু মনে হল, মাস্টারমশাই তো হিন্দু, কিন্তু গুনিনটা মুসলমানদের দোয়া পড়ছে, এতে কি কোনো লাভ হবে? নানা লোকের নানা কথার মধ্যে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়ল তার নিজেরও খেয়াল নেই, শুধু মনে হল এত লোকের জন্য ভাতটাও খেতে পারছে না। অবশ্য তার খিদেও পাচ্ছিল না।

চম্পা ঘরে নেই, মানে কাজে গেছে। মাথাটা কেমন যেন ভার-ভার হয়ে আছে, একটু চা খেলে ছাড়বে মনে হয়। ঘরে পয়সা নিতে ঢুকে চোখে পড়ল, খাওয়ার জন্য কিছু একটা ঢাকা দিয়ে রেখে গেছে চম্পা চৌকির নীচে।

বাইরে বেরিয়েই সামনে পড়ল দিনুর বাচ্চা মেয়েটা। মেয়েটা তাকে দেখে অন্যদিন কাকু-কাকু করে, আজ তাকে দেখে এক ছুটে ঘরের ভেতরে। লে হালুয়া, লোকে কী তাকেই ভূত ভাবছে? বাচ্চাটার ছুট দেখে তার হাসিই পেল। চায়ের দোকানে তাদের বস্তির লোকজনেরই ভিড়। গোটা ভিড়টাই তার দিকে তাকিয়ে। যা শালা, তাকে সবাই কি মাদারিওয়ালার বাঁদর ভাবছে নাকি? কে যেন উঠে গিয়ে বেঞ্চে তাকে বসার জায়গা করে দিল। গরম চায়ে চুমুক দিয়ে ভালোই লাগছে। প্রথম কথা বলল পঞ্চা।

—কী রে নব, শরীরটরির ঠিক আছে তো?

পঞ্চা পুরোনো কাঁসা-পিতলের ব্যাবসা করে। কিন্তু নানা কারণে লোকটার বদনাম আছে। নবরও পছন্দ হয় না পঞ্চাকে, মেয়েছেলেদের মতো গায়ে পড়ার অভ্যাসের জন্য। কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু ঘাড় নাড়ল।

—যাই বল বাবা, কাল তোর একটা বড়ো ফাঁড়া গেছে।

কিছু না বলে নব চায়ে চুমুক দিল। এবার একটু তার গা ঘেঁষে এসে পঞ্চা জিজ্ঞাসা করল,

—কাল ঠিক কী হয়েছিল রে নব?

নব বুঝতে পারছে গোটা ভিড়টা কানখাড়া করে আছে তার কথা শোনবার জন্য। কেন জানি, হঠাৎ তার মেজাজটা গেল খাট্টা হয়ে—সে শালা মরছে তার জ্বালায় আর বাকিরা ফর্তি করছে! গলা তুলে বলল,

—এখন যা, আমার মেজাজ খিঁচড়ে আছে।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে' বলে পঞ্চা তাড়াতাড়ি উঠে গেল।

ঘরে ফিরতে ফিরতে সে নিজেই ভাবছিল, সত্যি কাল কি হল? ডাক্তারবাবু যাই বলুক, গোটাটা তার মনের ভুল না, সে কি পুরোপুরি খ্যাপা নাকি? কেউ

একটা তার গাড়িতে উঠেছিল, তা না হলে টাকাটা তার হাতে এল কী করে? তবে যে-ই হোক, পার্টি মালদার। তা না হলে যে ভাড়া আট আনার বেশি হয় না, গোটা একটা টাকা দিয়ে দিল কোনো ফেরত না চেয়েই। তবে সে ঠিক করেছে, ওই টাকা ছোঁবে না, টাউনের কোনো মন্দিরে ঠাকুরের কাছে দিয়ে দেবে। কাল ঠাকুরই তাকে বাঁচিয়েছে। কাল সত্যিই তার ফাঁড়া গেছে।

কিন্তু কে সওয়ারি হয়েছিল, কাল তার গাড়িতে। ভূত? না কোনো দেও? নাকি কোনো মানুষ? কিন্তু যে-ই হোক তার কোনো ক্ষতি করেনি। চাইলে তো করতেই পারত। যদি চোখের সামনে লোকটাকে হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে না দেখত, তবে তো অন্য কিছু ভাববার দরকারই পড়ত না।

কাল রাতে সে ভাত খায়নি, সেই ভাতই জল ঢেলে রেখে গেছে চম্পা। এমনিতে পয়সাকড়ির খুব টানাটানি না থাকলে চম্পা সকালবেলা রুটি করে আর রাতে ভাত। মাঝখানে অবশ্য ভাতের মুখ দেখা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এখন যাই হোক, অবস্থা আগের মতো অতটা খারাপ না। তবে রেশনের দোকান থেকে যে লাল লাল মাইলোগুলো দেয়, সেগুলো মুখে দেওয়া যায় না। কিন্তু আমদানি কম হলে ওই অখাদ্যই খেতে হয়। বাইরের দেশে নাকি গোরু-ছাগল এই সব খায়।

খেতে খেতে তার মনে হল, ভূত যদি হয় তবে রিকশ চড়ে এল কেন? তেনারা তো যখন খুশি চলে যেতে পারেন। রিকশয় উঠেছে মানে, তার কাছ থেকে কিছু চাইবার জন্য উঠেছিল। কী চায় তার কাছে? মাস্টারমশাই কি এ রকম করবে তার সাথে? সারা জীবন সে লোকটার জন্য করেছে, এ কথা পরপারে গেলেও মাস্টারমশাইয়ের মনে থাকবে। আর কিছু করতে হলে মরবার এতদিন পরে করবে কেন? আর মাস্টারমশাই তো এতটা ঢ্যাঙা ছিল না। কাল রাতে যে তার সওয়ারি হয়েছিল, এত লম্বা লোক সে খুব বেশি দেখেনি।

ঘরে বসে থেকে কী লাভ. গাড়ি নিয়ে বেরোই. নব ভাবল। শুধু মনে হচ্ছে সে আজ বেরোবে না, চম্পা বোধ হয় ঘুমের মধ্যে এই কিরেই কাটিয়েছিল। সে পরে দেখা যাবেখন। এই শীতের মধ্যে একা একা ঘরে বসে থাকতে ভালোও লাগছে না। এখন খেয়েছে, দুপুরে আর ঘরে আসবার দরকার নেই, বরং বিকেলে তাড়াতাড়ি গাড়ি তুলে দেবে। তা ছাড়া কালুমাস্টারকে কালকের রোজ দেওয়া হয়নি, দু দিনেরটা একবারে দিয়ে আসবে।

স্টেশন রোডের রাস্তা থেকে একটা পুরোনো গরম প্যান্ট কিনেছিল, শীতকালে গাড়ি চালানোর সময় ওই প্যান্টটাই পরে, গরমকালে লুঙি। ধোকড়ার

একটা ভারী চাদর আছে, সেটা ওপরে ভালো করে বেঁধে নেয়। তবে গাড়িটা চলতে শুরু করলে ঠান্ডা হাওয়াটা লাগে, সেটা কিছু করবার নেই। ঠান্ডা থাকলেও ভালো রোদ উঠেছে, আস্তে আস্তে চালাতে খারাপ লাগছে না। বেলা হয়ে গেছে, অফিস, স্কুল সবই শুরু হয়ে গেছে; এই সময় প্যাসেঞ্জার একটু কম থাকে। তবে আজ শনিবার, একটু পর থেকে আবার প্যাসেঞ্জার আসতে শুরু করবে। মাঝ রাস্তায় প্যাসেঞ্জার না পেলে সে প্রথম গাড়ি লাগায় বড়ো ঘড়ির মোড়ে, আজও তাই হল। গোটা বড়ো ঘড়ির মোড় ভেঙে পড়ল তাকে দেখে। তাদের লাইনের লোকেরা তো বটেই, আশেপাশের সবাই। সবাই জানতে চায়, কাল রাতে তার কী হয়েছিল। একই কথা যে তাকে কতবার বলতে হল, তার কোনো ঠিক নেই। জীবনে এই প্রথম এত লোক সবাই তার কথা শুনতে চাইছে, এমন কী ভিড় ঠেলে তাকে দেখেও যাচ্ছে কত লোক। কে একজন তাকে চা-ও খাওয়াল, সব মিলিয়ে তার খারাপ লাগছে না।

প্রথম প্যাসেঞ্জার সে পেল ঘোষপাড়ার, লম্বা সফর। দিনের প্রথম আমদানি তার খারাপ হবে না। সকালবেলার রোদ, এত লোকজন, এত কথা। মাঝেমাঝে মনে হচ্ছে, কাল রাতে সত্যি কি এ রকম হয়েছিল? সে কেন ভূতের নজরে পড়বে? ভূত যদি তার ঘাড়ে উঠতে চাইত, তবে তো কবেই উঠতে পারত। পেটের জ্বালায় সে কী না করেছে? শ্মশানে মড়া পোড়াতে এসে লোকে মরা মানুষের নামে মাটির সরায় ভিজে আধপোড়া চাল রেখে যায়, শ্মশান ফাঁকা হলে সেই চাল তুলে খেয়েছে। রেলে কাটা পড়া বডি, কাঁধে করে হাসপাতালের মর্গে পৌঁছে দিয়েছে পয়সার জন্য। কোনো দিন কিছু হয়নি, আজ হঠাৎ ভূতের নজর তার ওপর পড়বে কেন?

ঘোষপাড়ার রিকশস্ট্যান্ড ছোটো রিকশস্ট্যান্ড, কিন্তু সেখানেই সে লাইনের পেছনে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্যাড্‌ল টানতে গিয়েই বুঝছিল, শরীরটা আজ জুত নেই, কেমন হাঁফ ধরছিল। সেখানে আবার কাল রাতের গল্প বলতে হল। এ চলবে কয়েক দিন, এ মরা টাউনে নতুন কিছু হয় না, তার ভূত দেখা—সবাই নতুন একটা কিছু পেয়েছে।

কিন্তু লোকটা অন্ধকারে চোখের সামনে মিলিয়ে গেল, খটকা লাগছে সেখানে। একটা জ্বলজ্যান্ত লোক ও রকম হাওয়ায় মিলিয়ে যায়? তবে এ কথা ঠিক ঘুটঘুটে আঁধার ছিল, এক হাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু একটা লোক অত রাতে ট্রেন থেকে নেমে নতুনপল্লিতে এল, তারপর বেমালুম হারিয়ে গেল, তাকে আর দেখাই গেল না। কাল রাতেই ও পাড়ার কথাবার্তাতে

বোঝা যাচ্ছিল, ওদের কারোর বাড়িতে কেউ আসবার নেই। এক বাকি থাকে মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি। যে বাড়িতে গত এগারো মাস হল কেউ থাকে না।

লোকটা যখন তাকে দাঁড়াতে বলল, তার মনে হয়েছিল লোকটা মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে যাবে। কেন? তা হলে কি সত্যিই কেউ কাল রাতে মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে এসেছিল? যে এসেছিল, সে চায়নি কেউ তাকে দেখুক। তাহলে সে গন্ডগোল শুনে বেরিয়ে আসত। কে এ রকম হতে পারে? কলকাতা থেকে রাতের ট্রেনে? একটাই বিষয়ই কেবল পরিষ্কার, লোকটা খুব ঢ্যাঙা। কথাটা তার মাথায় খেলে গেল বিজলির মতো, তার আপশোশ হচ্ছে কথাটা কেন আগে মাথায় আসেনি। শালা নিকুচি করেছে ভূতের বাপের। লাইনের থেকে একটানে [illegible] টেনে বার করে সে লাফিয়ে উঠল সিটে, আর তারপর প্যাড্‌লে পা-টা নামাল এত জোরে, হাঁটুটা মট করে উঠল।

[illegible] তার উড়ছে। বড়ো ঘড়ির মোড়ে বেশ ভিড়ভাট্টা, পাগলের মতো [illegible] সে গাড়িটা বার করে নিল স্পিড একটু কমিয়ে। স্ট্যান্ড থেকে [illegible] আওয়াজ দিল, এই রে আবার ভূত দেখেছে বোধহয়। কোনো দিকে না তাকিয়ে সে গাড়ি ঘোরাল বটতলার দিকে। ব্রেকে হাত দিল নতুনপল্লির মুখে এসে। এই ঠান্ডায়ও তখন ঘামছে, ব্যথায় হাঁটুদুটো টনটন করছে। সে আজ এসবের পরোয়া করে না।

নতুনপল্লির ভেতরে সে ঢুকল আস্তে আস্তে, কেউ কিছু সন্দেহ না করে, যেন ফাঁকা রিকশ প্যাসেঞ্জার খুঁজছে। স্ট্যান্ডে শুনেছিল, গোটা টাউন নাকি ভোর থেকে নতুনপল্লিতে ভিড় করেছে। না সে রকম কিছু নেই এখন। তার একটাই ভয়, কাল রাতে পাড়ার যারা বেরিয়েছিল, তাদের কারুর সাথে যেন মুখোমুখি দেখা না হয়ে যায়, তা হলে কেন এসেছে, তা নিয়ে হাজারটা জবাবদিহি করতে হবে। কপাল ভালো রাস্তায় সে রকম কেউ নেই। যারা আছে. তারা আলাদা করে কেউ তাকে নজরও করল না। মাস্টারমশাইয়ের বাড়িটার কাছে রাস্তার ধার ঘেঁসে গাড়িটার স্পিড একদম কমিয়ে দেবার পর পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে চেনটা আস্তে করে ফেলে দিল। না, কেউ খেয়াল করেনি। নামল যেখানে, সেখান থেকে হাত বাড়িয়ে বাড়িটার রোয়াকটা সে চাইলে ছুঁতে পারে। চেন ঠিক করবার মতো করে বসে আড়চোখে সে ভালো করে দেখল বাড়ির দরজাটা। না বন্ধ, ওপরের শিকলিটা সেই জং ধরা তালা দিয়ে আটকানো। কিন্তু দরজার সামনে ওগুলো কী? জুতোর ছাপ। পুলিশের টিকটিকি হবার দরকার নেই, তার মতো আনপড় লোকও বুঝতে পারবে, কেউ একটা এসে দাঁড়িয়েছিল দরজার সামনে। এই

বাড়ির রোয়াকেও কেউ ভয়ে বসে না, এ বাড়িতে একটা লোক বিষ খেয়ে মরেছিল বলে। বৃষ্টি হয়নি বহু দিন, গোটা রোয়াকটায় এই মোটা হয়ে ধুলো পড়েছে। ঠিক দরজার সামনে জুতোর দাগগুলো একদম টাটকা। কে এসেছিল? কী করতে এসেছিল? এখান থেকে যা দেখা যাচ্ছে, শিকলিটাতে তালা আটকানো আছে। তালাটা ভালো করে দেখতে পারলে ভালো হত, কিন্তু এতটা তার সাহস হল না। ওই তালা ধরে টানাটানি করলেই কারোর নজরে পড়ে যাবে, তারপর কী বলবে? একটা গরিব রিকশওয়ালা একটা বন্ধ ঘরের তালা ধরে টানছে, নির্ঘাত ভাববে চোর, আর ধোলাই দিতে শুরু করলে কে বাঁচাবে? কাল রাতে এই পাড়ায় সে ভূত দেখে ভিরমি খেয়ে পড়েছিল বলে এ পাড়ার লোক তো তাকে আর রেয়াত করবে না। কাজেই এদিক-ওদিক দেখে সে গাড়ি ঘুরিয়ে বটতলার মোড়ের দিকে রওনা হল।

কাল রাতে কে এসেছে তা নিয়ে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। আর কে এসেছে, এই টাউনে সে ছাড়া আর কেউ জানে না। কী ভেবে ফাঁকায় সে আবার গাড়িটা দাঁড় করাল। সিটটা তুলে হাতড়ে জিনিসটা বার করল। এ তার বহু দিনের সাথি, বহু দিনের দোস্ত। যখন রাস্তাই ছিল তার ঠিকানা, চালচুলো ছিল না, তখন থেকে এ জিনিস তার সাথে। অনেক বার তাকে জানে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ঠিকই, রিকশর লাইনে আসবার পর আর সেভাবে কোনোদিন লাগেনি, কিন্তু এই লাইনও খতরনাক, জিনিসটা সে হাতছাড়া করেনি। পকেটে রেখে প্যাড্‌ল মারলে একটু খোঁচা লাগছে, লাগুক গে, সে পরোয়া করে না। আধ হাত লম্বা কানপুরিটায় গত মাসেই একবার শান-পাথরে ঘষে ফলাটা চকচকে করে নিয়েছিল। আজ এসপার-ওসপার হয়ে যাবে। তলপেটে ঢুকিয়ে দিয়ে একবার ডান-বাঁ, তারপর ওপর-নীচে টেনে দেবে, ছেলে এসে চোখে তুলসী পাতা দিয়ে 'বলো হরি' বলে নিয়ে যাবে। তার মটকা গরম হচ্ছে।

শেষ দিন মাস্টারমশাই যা-যা বলেছিল তার সব কিছু মনে আছে। মাস্টারমশাই যা বলেছিল, তার সব কথার মানে সে বোঝেনি, কিন্তু ভোলেনি কিছু। টুকাই দূরসম্পর্কের খুড়তুতো ভাই, গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে ঢ্যাঙা, মুখচোখ পাথরে খোদাই করা মূর্তির মতো। মাস্টারমশাই আরো বলেছিল, অপরাধী অপরাধের জায়গায় ঠিক ফিরে আসে। আসলে তো, মাস্টারমশাইকে খুন করা হয়েছে। লোকটাকে গদ্দারি করে বাধ্য করেছে বিষ খেতে। ও তো আসবেই, আসল কাগজ মাস্টারমশাই নিয়ে এসেছিল। এ কথাও তাকে বলেছিল মাস্টারমশাই। শেয়ারবাজার ব্যাপারটা সে বোঝেনি, কিন্তু এটুকু বোঝার মতো

বুদ্ধি তার আছে ওই কাগজ থেকেই টাকা আসবে। শুয়োরের বাচ্চা এসেছে ওই কাগজ খুঁজতে। আয়, তোকে কাগজ দিচ্ছি। তুই জানিস না, এই টাউনে অনন্তমাস্টারের ছোটো ভাইও আছে। সে মাস্টারমশাইয়ের মতো লেখাপড়া জানে না, কিন্তু তাকেই নিজের ছোটো ভাই মনে করে মাস্টারমশাই সব কথা বলে গেছে। নবর চোখে জল। গদ্দারি! শুধু মাস্টারমশাই না। কী হল বউদি আর তার খুকুর? না খেতে পেয়ে মরে গেছে, নাকি দালালেরা তুলে নিয়ে বেচে দিয়েছে কোথাও। নব গাড়ি টানতে পারছে না, জলে তার চোখ ঢেকে গেছে। একবার ধরে নিই, এক-একটা কোপ বসাব আর জিজ্ঞাসা করব, 'বল, আমার নতুন গাড়ির কি হল'।

এখনো মাল সরাতে পারেনি, তা হলে ঘরের দরজা খোলা থাকত। দিনের বেলায় চেষ্টা করবে না, ধরা পড়ে যাবে, ও রাস্তায় সারাদিন লোক থাকে। চেষ্টা করবে অন্ধকারে। কলকাতায় ফেরার ট্রেন সন্ধ্যা সাড়ে ছ-টায়। এখন তো পাঁচটায় অন্ধকার, আর এই ঠান্ডায় নতুনপল্লিতে সন্ধ্যাতেই মাঝরাত। পাঁচটা থেকে ছ-টা, এই এক ঘণ্টার মধ্যে ওকে আসতে হবে। নব থাকবে। বাঞ্চোত, তোকে যদি কোপাতে না পারি, তবে এই নব দাসের নামে নেড়ি কুত্তা পুষিস।

বটতলায় গাড়ি লাগাতেই কে একটা বলল, 'নব, নতুনপল্লির দিদিমণি তোকে খুঁজে খুঁজে হ্যাদিয়ে গেল, বলেছে খুব দরকার।'

## ॥ চব্বিশ ॥

—কালু বলল, একটু ব্যস্ত আছে, হাতের কাজ শেষ হলে আসবে।

মাথাটা গরমই ছিল,

—কী বলেছে হারামজাদা? হাতের কাজ শেষ হলে আসবে? বল, এক্ষুনি আসতে, তা না হলে জুতো মারতে মারতে নিয়ে আয়।

মনে মনে ভাবলেন, ছোটোলোকদের মাথায় তুললে এই হয়। কিন্তু লখনের হাবভাব দেখে আর একবার কালুর কাছে যেতে আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে না। তাঁর দারোয়ানও এখন কালুকে ভয় পায়। দাঁত খিঁচোলেন,

—হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কি? যাঃ।

লখন দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এল,

—স্যার, দারোগাবাবু আসছে।

—দারোগাবাবু?

গলা নামিয়ে বললেন,

—কালুকে গিয়ে বল, এক্ষুনি আসতে হবে না, যেন ঘণ্টাখানেক পরে আসে।

নীরেনদারোগাই এই টাউনে একমাত্র লোক, যার সঙ্গে মনে মনে একটা টক্কর তার সব সময় চলে। আগের দারোগাগুলো এ রকম ছিল না। তাঁকে ওপরওয়ালা বলে মনে না করলেও তারা তাকে মেনেই চলত। এই টাউনের গার্জিয়ান তিনি, সবার থেকে এই সামান্য স্বীকৃতিটুকু দাবি করতেই পারেন। এই জায়গাটাতেই নীরেনদারোগাতে তাঁর আপত্তি। কলকাতায় দু-একবার লোকটাকে বদলি করার কথা বলেও ছিলেন। কিন্তু কলকাতায় এখন তার কথা শোনবার মতো লোক বড়ো কম। তবে ব্যাপারটা নিয়ে খুব জোরাজোরি করেননি, যাই হোক লোকটা করিতকর্মা আছে, টাউনটাকে সামলে রেখেছে। দিনকাল খারাপ,

এটুকু যে করতে পারে, তা-ই অনেক। তবে আজ নীরেনদারোগার আসার খবরটা ভালোই লাগল, কেমন একটু ভরসাও হল।

—তা হলে স্যার, আপনাদের পাড়ায় ভূতের উপদ্রব।

হাসতে হাসতে বললেন,

—আপনার মতো বাঘে গোরুকে এক ঘাটে জল খাওয়ানো দারোগাবাবু থাকতেও আমাদের দুদর্শা দেখুন।

লোকটা অনেকক্ষণ হাসল,

—তবে যাই বলুন, আমার কিন্তু খারাপ লাগছে না। এ টাউনে শালা কিছুই হয় না, অন্তত একটা ভূত এসে একটু হইচই ফেলে দিয়েছে।

তারপর হাসি থামিয়ে বলল,

—কাল কী হয়েছিল বলুন তো?

কী হয়েছিল, সে খবর আপনি এখনো পাননি?

—না না সে খবর পেয়েছি, আসলে জানতে চাইছি, কে এসেছে সে খবরটা পেলেন কী?

—সবাই তো বলছে ভূত।

খুব ইচ্ছে করছিল, আসল খবরটা নীরেনদারোগাকে খোলাখুলি বলে, একদম হাত ধরে অনুরোধ করবেন—ছোটোভাই আপনি, এই বিপদ থেকে আমায় রক্ষা করুন। কিন্তু দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতাই তাকে আটকাল। তিনি জানেন, যদি সব শুনে দারোগা তাঁকেও সাহায্যও করে, তা হলেও সারা জীবন এই লোকটার পায়ের নীচে অনুগত হয়ে থাকতে হবে না! না, এটা হতে দেওয়া যাবে না।

—আচ্ছা নিত্যবাবু আপনি তো অভিজ্ঞ মানুষ, আমি যদি রিপোর্টে লিখি 'ভূত', কালই ওপরওয়ালারা আমাকে চাকরি থেকে বিদায় করে রাঁচি পাঠিয়ে দেবে না?

এবার তার হাসার পালা।

—দেখুন, কাল রাতে পাড়ার লোকেদের সঙ্গে কথা বলে যা বুঝলাম, এ পাড়ায় কারোর বাড়িতে কেউ আসেনি, কারোর আসার কথাও ছিল না। আর তারা কেউ মিথ্যা ভাষণ করছে বলে আমার মনে হয় না।

—না, একজন মিথ্যা কথা বলছে।

কেমন নাটকীয়ভাবে বলে উঠল নীরেনদারোগা। কথাটা শুনে চমকে উঠলেন, জেনে গেছে সব?

—কী করে বুঝলেন?

—সেই ভোর থেকে আমি এ পাড়ায়, সবার সঙ্গে কথা বলেছি। আমি প্রায় স্যাঙ্গুইন।

—কে?

বুকটা ধুকধুক করছে, কী বলবে লোকটা?

—লোক এসেছে ওই ছোঁড়ার কাছে।

আশ্বস্ত হলেন, তিনি যাই হোন, ছোঁড়া নন।

—কোন ছোঁড়া?

—কে আবার, ওই কমিউনিস্ট ছোঁড়া।

যাক, এবার নীরেনদারোগাকে বাগে পাওয়া গেছে।

—এই তো, আপনাদের বয়স অল্প, রক্ত গরম। একটা ভদ্রলোকের পাড়ায় ও রকম বিপজ্জনক একটা প্রিজনারকে এনে তুললেন। একবারও কারোর সঙ্গে পরামর্শ করারও প্রয়োজন বোধ করলেন না।

নীরেনদারোগা চুপ।

—তবে আপনার সন্দেহের সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না।

—একমত হতে পারছেন না? কেন শুনি?

—একটা জ্বলজ্যান্ত কমিউনিস্টকে পাহারা দেবার দায়িত্ব দিয়েছেন একটা হাবাগোবা কনস্টেবলকে। আপনাদের বুদ্ধির বলিহারি! আর সে ছোঁড়া গোটা সকাল আর দুপুর টইটই করে গোটা টাউন ঘুরে বেড়ায়। আপনি ছাড়া সেই খবর টাউনের সবাই জানে।

—ঠিকই এটা আমাদের বড়ো একটা গাফিলতি হয়ে গেছে। খবরটা আমি আজ সকালেই পেয়েছি, এখন আমি কিচ্ছু বলছি না, ঝামেলাটা মিটুক, আমি ওকে চাকরি থেকে তাড়াব।

—চাকরি থেকে তাড়িয়ে এ বাজারে বড়ো জোর একজন শত্রু বাড়াবেন। পুলিশের এখন এই হালই হয়েছে। কিন্তু আসল কথাটা শুনুন। আমার ধারণা কমিউনিস্টদের বুদ্ধিশুদ্ধি আপনার পুলিশের থেকে বেশি। এ কি গোয়েন্দা গল্প নাকি, রাত বারোটায় কালো টুপি পরে ছদ্মবেশে আসবে? আসবে সাধারণ লোকের মতো যাতে আপনার পুলিশ ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। ওদের কাছে এ খবরটুকু নিশ্চয়ই আছে, আপনার মোস্ট ডেঞ্জারাস প্রিজনার দিনের বেলায় মুক্তপুরুষ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। আর রাতে যাই হোক, কনস্টেবলটা সঙ্গে থাকে।

কমিউনিস্টরা অন্তত এতটা গাড়ল না, দিনের বেলায় না এসে রাতের বেলায় আসবে।

নীরেনদারোগা কিছু না বলে এমনভাবে এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল যে, অস্বস্তি লাগছিল। তারপর আস্তে আস্তে বলল,

—আপনি যা বললেন তাতে যুক্তি আছে, কিন্তু আপনি কমিউনিস্টদের চেনেন না। যেটাকে আমি আপনি মনে করব কেউ করবে না, ওরা ঠিক সেটাই করবে।

—যদি আপনার বন্দি এখনো না পালিয়ে থাকে, তবে জিজ্ঞাসা করব, সেই মধ্যরাতের আগন্তুকটি এখন কোথায়?

—সেই খোঁজটাই তো করছি। সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে আছে। এ পাড়াটা তো ভালো করে দেখলাম, এক ওই অনন্তমাস্টারের ফাঁকা বাড়িটাই লুকোনোর একমাত্র জায়গা। না, শেকল-টেকল ভালো করে নেড়ে চেড়ে দেখলাম, ওখানে কারোর হাত পড়েনি।

মনে মনে বললেন, বুদ্ধির ঢেঁকি। চেনাশোনা কারুর বাড়িতে না উঠে ফাঁকা বাড়িতে উঠবে! ওই আনন্দেই থাকো। কিন্তু বললেন,

—তা যে-ই হোক, যে এসেছে সে তো আর কোনো সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি, এদিকে একটু নজর রাখবেন।

এই দুশ্চিন্তার মধ্যেও একটা কথা ভেবে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন, এই নাকউঁচু দারোগাটিকে আজ বুঝিয়ে দেওয়া গেছে, তুমি যত বড়োই পুলিশ হও, নিত্য ঘোষালের কাছে এখনো শিশু। সেটা বোধহয় দারোগাটিও বুঝেছে, তা না হলে লখন মাঝখানে এসে চা দিয়ে গিয়েছিল, ওঠবার সময় সেই চায়ের কাপটি হাত থেকে ফেলে ভেঙে দিয়ে যেত না। মুখে অবশ্য 'সরি' বলে গেল।

কালু এসে হাজির হল আরো আধঘণ্টা পর।

—কী স্যার, হঠাৎ এত জরুরি এত্তেলা।

একটা জিনিস দেখে ভালো লাগল, সামনের চেয়ারে বসবে ভেবে এগিয়ে এসেও কালু চেয়ারে না বসে দাঁড়িয়ে রইল। ওপরওয়ালার ভঙ্গিতে বললেন,

—বোসো।

কালুকে দেখছিলেন আর ভাবছিলেন, কালুকে দেখে কে কালুর 'গুণাবলি' বুঝবে। প্রথম দিনে যা দেখেছিলেন এখনো প্রায় তাই, শুধু সামান্য কয়েকটি চুলে পাক ধরেছে। সেই হাড়জিরজিরে চেহারা, কণ্ঠার হাড়টা অদ্ভুত উঁচু হয়ে

আছে। ধুতি আর হাফহাতা শার্ট। বহু দিন ভেবেছেন, কালুকে জিজ্ঞাসা করবেন তার কালু নামটা বাপ-মায়ের দেওয়া, না কি আবলুশ কাঠের মতো গায়ের রঙের জন্য লোকমুখে নামটা কালু হয়ে গেছে।

এই সকালবেলায় নিজের অফিস ঘরে নিভৃতে কালুর সঙ্গে আলোচনা করছেন, এই দৃশ্য বাইরের কেউ দেখলে তাঁর ভাবমূর্তি খুব উজ্জ্বল হবে না, কিন্তু তিনি নিরুপায়। শুধু নিখিলকে বললেন, কেউ যেন এখন ঘরে না আসে। কথাটা কীভাবে শুরু করবেন ভাবছিলেন, কালুই জিজ্ঞাসা করল,

—কিছু গন্ডগোল হয়েছে নাকি?

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে, কালু বলল,

—বান্দা হাজির, অর্ডার করুন, কী করতে হবে।

আজকাল সকালবেলায় গলায় বড়ো শ্লেষ্মা জমে, সবই বয়সের লক্ষণ। কথা বলার আগে গলাটা ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হল,

—দ্যাখো কালু, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। মনে মনে ঠাকুরের পা ছুঁয়ে বলো, তুমি আমার সঙ্গে বেইমানি করোনি তো?

কালু বসা থেকে লাফিয়ে উঠল,

—এ আপনি কী বলছেন! কালু আপনার সাথে বেইমানি করবে! এতদিন ধরে আমাকে দেখে শেষে আপনার এই মনে হল? আমার একমাত্র ব্যাটার নামে কসম খেয়ে বলছি, আপনার সাথে সারা জিন্দেগিতে কালু কখনো বেইমানি করেনি, আর করবেও না।

কালুকে রীতিমতো উত্তেজিত দেখাচ্ছে। তিনি অবশ্য জানেন, গোটাটা কালুর অভিনয়ও হতে পারে। হঠাৎ গলাটা স্বাভাবিক করে কালু জিজ্ঞাসা করল,

—কী হয়েছে সোজাসুজি বলুন তো?

—গত বছর তোমাকে একটা বড়ো কাজ দিয়েছিলাম। তার জন্য একগাদা টাকাও তোমাকে দিয়েছিলাম। কাজটা ঠিকঠাক করেছিলে?

—আলবত।

—কাজটা করেছিলে, তার কোনো প্রমাণ দেখাতে পারবে?

—লে মজা, এক বছর পর কী প্রমাণ আপনাকে দেখাব?

—এক বছর আগেও কোনো প্রমাণ দেখাওনি।

—স্যার, এ কি রাজাবাদশার যুগ, কাটা মুন্ডু এনে দেখাব?

চাপা গলাতে ধমকে উঠলেন,

—বাজে বোকো না, সে ছেলে ফিরে এসেছে।

—কী বলছেন কী, আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?

—সব জিনিস চোখে দেখার দরকার হয় না।

—কে আপনাকে কী বুঝিয়েছে জানি না। এ সবে কান দেবেন না, সব বকোয়াস। আমার লোকেরা হান্ড্রেড পারসেন্ট কাজটা হাসিল করেছে। ও রকম একটা জোয়ান ছেলে, গলায় দুটো পোঁচ পড়ার পরও লাথি মেরে আমার একটা লোকের কোমর প্রায় ভেঙে দিয়েছিল। আমাকে বিশ টাকার ওষুধ কিনে দিতে হয়েছিল। আর আপনাকে কে কী বলল, আপনি সেটা ধরে নিয়ে হইচই শুরু করে দিলেন।

—তোমার সঙ্গে তর্ক করব বলে তোমায় সাতসকালে ডেকে আনিনি। শুধু এটা জেনে রাখো, কাজটা তোমার লোকেরা করতে পারেনি।

—আপনিও জেনে রাখুন, কালুমাস্টার এই সব কাজে কোনোদিন ফেল করে না। আর সে ছেলে যদি বেঁচে থাকে তবে আগে না এসে এতদিন পরে আসবে কেন?

—এতদিন আসেনি তোমার ভয়ে, পেলে তুমি মারবে বলে।

মুখটা বাঁকিয়ে অদ্ভুত করে হেসে কালু বলল,

—আমি মারব বলে?

রেখেঢেকে না, কালু এখন তাঁকে বুক ফুলিয়েই ব্যঙ্গ করছে।

—বলুন, কোথায় এসেছে? কবে এসেছে?

—কাল রাতে এসেছে, এই পাড়াতে এসেছে।

দাঁতে দাঁত চেপে তিনি উত্তর দিলেন। কালু অদ্ভুতভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর হাসতে শুরু করল, প্রথমে আস্তে আস্তে তারপর বাড়তে লাগল হাসির দমক। তার এখন ইচ্ছে করছে পা থেকে খড়মটা খুলে লোকটাকে মারতে শুরু করবেন। শুয়োরের বাচ্চার এত দূর সাহস তাঁর সামনে বসে তাঁকে ব্যঙ্গ করছে! কিন্তু তিনি কিছুই করতে পারলেন না, শুধু আগুনের মতো দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলেন। এবার হাসতে হাসতেই কালু বলল,

—কাল রাতে আপনাদের পাড়ার কথা বলছেন? স্যার, আপনাকে এই কালু চিরকাল ওপরওয়ালা বলে মেনেছে। অন্য কেউ এই সব বললে বলতাম, লোকটার মাথায় গন্ডগোল হয়ে গেছে।

না, কালু এবার তার সীমা ছাড়িয়েছে। চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি,

—উজবুকের মতো কথা বোলো না।

তাঁর চোখের দিকে চোখ রেখে কালু উঠে দাঁড়াল। তারপর মুখে হাসি এনে বলল,

—কেশুতি পাতা বেটে মাথায় মাখলে মাথা ঠান্ডা থাকে। আমি পাঠিয়ে দেব, বউদিকে ভালো করে মাখিয়ে দিতে বলবেন।

কথাটা বলেই কালু বেরিয়ে গেল। তিনি শুধু বলতে পারলেন, 'বেজন্মা'; তাও কালু বেরিয়ে যাবার পর।

তিনি হাঁফাচ্ছেন, কিন্তু হাঁফাতে হাঁফাতেই মনে হল, কালুকে কিচ্ছু করার ক্ষমতা তাঁর আজ নেই। শরীরটা কেমন অস্থির-অস্থির লাগছে, এই শীতেও গরম লাগছে। ভাবলেন, হঠাৎ খুব শরীর খারাপ হলে খাবার জন্য স্বদেশডাক্তার যে ওষুধটা দিয়েছে, ওপরে উঠে সে-ওষুধটা খেয়ে আসবেন। কিন্তু সে-সব কিছু না করে বসে রইলেন তিনি। অনঙ্গ পণ্ডিতমশাইয়ের ভবিষ্যদ্‌বাণীটা যেন কানে বাজছে।

## ॥ পঁচিশ ॥

এত বয়স হল, কিন্তু কখনো এরকম হয়নি। তার কেমন লাগছে, কেন ভাষায় সে বর্ণনা করবে? রাগ হচ্ছে নিজের ওপরই। সাধনাদির মতো একজন যেটা বুঝতে পারল, সে এতটাই মুর্খ, তার একবারও বিষয়টা মনে হল না। একটা অদ্ভুত আশায় বুকটা ধুকধুক করছে। তা হলে কি ভগবান তার কথা শুনল, সমর ফিরে এল? এ যে কী এক উত্তেজনা, সে তো কাউকে বোঝাতে পারবে না। আবার মনের ভেতরে একটা দ্বিধাও তৈরি হচ্ছে, এটা কি উচিত কাজ করছে? আজ যদি সমর এসে সামনে দাঁড়ায় সে সব কথা ভুলে যাবে? যাই হোক, সে এখন নিখিলবাবুর ধর্ম সাক্ষী করা স্ত্রী। আর এই কথা বাদ দিলেও সেদিনকার অপমান, সেদিনের লজ্জা?

নিজের কাছে তো লুকোতে পারবে না; না, সেদিনের সেই জোর আর তার নেই। এই একটা প্রাণহীন টাউনে একা একা একটা প্রাণহীন জীবন টানতে টানতে সেই জোর তার চলে গেছে। সমর সামনে এসে দাঁড়ালে একটিও কথা না বলে সে চলে যাবে। পেছনের দিকে তাকাবে না, কোথায় যাচ্ছে তাও ভাববে না। মাঝখানের এতগুলো বছর সমর কোথায় ছিল, কার সঙ্গে ছিল, জানতেও চাইবে না।

কিন্তু সে যদি সমরকে এতটাই চায়, তবে সেদিন সমরকে ছেড়ে এল কেন। নিজের কাছে সে কী জবাবদিহি করবে? বউদি আজ বেঁচে থাকলে কী বলত? তাকে এই অবস্থায় দেখলে কবিতার কী মনে হবে?

কাল রাতেই তার আন্দাজ করা উচিত ছিল। রিকশওয়ালাটাকে নিয়ে অত গন্ডগোল না হলে ঠিক খেয়াল হত। এই শীতের রাতে কলকাতার ট্রেন থেকে নেমে একজন খুব লম্বা মানুষ রিকশা নিয়ে তার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল, এখন মনে হচ্ছে কী বোকামো করেছি! বাকিদের কথা থেকেই তো বোঝা যাচ্ছিল অন্য কারোর বাড়িতে কেউ আসেনি।

কিন্তু কী করে নিশ্চিত হবে? ওই নব বলে রিকশওয়ালাটাই একমাত্র দেখেছে। ও-ই একমাত্র বলতে পারবে, যে এসেছে সে কেমন দেখতে। কাল রাতে অবশ্য বলছিল, কিছুই নাকি বুঝতে পারেনি। কাল রাতে তো ভয় পেয়ে লোকটা কেমন হয়ে গিয়েছিল, হতে পারে আজ সকালে মাথা ঠান্ডা হয়েছে, নতুন কিছু মনে পড়বে। না, লোকটাকে লাগবেই।

কিন্তু সমর যদি এসে থাকে, এল না কেন সামনে? পর মুহূর্তেই মনে হল, কী করে আসবে, অতগুলো লোকের সামনে। সমরকে দেখে তার কী প্রতিক্রিয়া হবে সমর তো সেটা জানে না। হয়তো সেই ভয়েই আর সামনে আসেনি। কিন্তু অত রাতে গেল কোথায়? এখানের কাউকে কি সমর চেনে? মনে হয় না। স্টেশন রোডে কী যেন একটা হোটেল আছে, অত রাতে খোলা পাবে? ভয়ঙ্কর ঠান্ডাটা না থাকলে, পুরুষ মানুষ কোথাও একটা রাত কাটিয়ে দিতেই পারত। আবার অন্য কোনো বিপদ আপদ হল না তো? চিন্তাই হচ্ছে।

রাতটা না হয় কাটাল, কিন্তু সকালবেলা তো আসা উচিত। কই এল না তো। হঠাৎ মনে পড়ল, সমর কোনো কালেই খুব ভোরে উঠতে পারে না। ডেকে দেবার কেউ নেই, নিশ্চয়ই উঠতে দেরি করেছে, আর যখন এসেছে, সে স্কুলে চলে গেছে। তা হলে কী হবে? তার কেমন হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। না না, তার জন্য এতদূর থেকে এসেছে সমর। এত সহজে চলে যাবে না, তার সঙ্গে দেখা না করে। বেচারাকে কত কষ্ট করে তার এখানকার ঠিকানা জোগাড় করতে হয়েছে। দাদা নেই, বউদি নেই, বুলবুলি বাইরে, নিখিলবাবুদের বাড়িতে সমর যাবে না নিশ্চয়ই; কার কাছ থেকে তার ঠিকানা পেল কে জানে? সে যখন স্কুলে তখন যদি সমর আসে, কড়া নাড়লে পাশের বাড়ির মাসিমা টের পেতে পারেন, যদি কিছু বলে গিয়ে থাকে।

কড়া নাড়া মাত্র মাসিমা বেরিয়ে এলেন, যেন তার কড়া নাড়ার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন।

—মাসিমা, আমি যখন স্কুলে গিয়েছিলাম কেউ কি আমার কাছে এসেছিল? কড়া নেড়েছিল?

চোখ দুটো বড়োবড়ো করে, গলাটা নামিয়ে মাসিমা অদ্ভুতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,

—কড়া নেড়েছিল না? তুমি দেখেছ?

কী অদ্ভুত কথা, সেই তো জানতে চাইছে, কেউ কড়া নেড়েছিল কিনা।

—না, আমি তো ছিলাম না। আপনি কি কাউকে আমার ঘরের কড়া নাড়তে শুনেছেন?

ভদ্রমহিলা বোধহয় এতক্ষণে তার কথাটা বুঝতে পারলেন। মুখটা অদ্ভুত কঠিন করে বললেন,

—না বাপু, আমি কিছু শুনিনি।

ঘরে ফিরে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া কোনো কাজ নেই, কোথায় যাবে সমরকে খুঁজতে? কেমন অস্থির লাগছে। মাঝে দু-একবার দরজা খুলে তাকিয়ে রইল বাইরে। না, কেউ নেই, নতুন কিচ্ছু নেই। বাইরের রাস্তা আদি অনন্তকালের মতো একই রকম। সেই পরিচিত রাস্তা, সেই পরিচিত কিছু মুখ। খাটে চুপচাপ বসে সে ভালো করে দেখছিল ঘরটাকে, এই ঘরটাতেই তো কাটিয়ে দিল প্রায় বিশ বছর। প্রথম প্রথম একটু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করত। বিশেষ কিছু না, ওই একটা ঘরে থাকতে গেলে যেটুকু মানুষ করে, সেটুকুই। যখন সমরের সঙ্গে তার সংসার ছিল, গরমকালে ওখানে ভারি সুন্দর বেলফুল বিক্রি হত সন্ধেবেলায়। একটা কাচের প্লেটে একটু জল দিয়ে রেখে দিলে, গোটা ঘরটায় সুন্দর গন্ধ হয়ে থাকত। এই টাউনে কালীমন্দিরের জন্য জবা আর পেতি টগরের মালা ছাড়া আর কোনো ফুল বিক্রি হতে দেখেনি।

এখন আর ঘরের দিকে কোনো নজরও দেয় না, একটা ঘরে থাকতে গেলে অভ্যাসবশত যেটুকু জিনিসপত্র হাতে হাতে গোছগাছ করতে হয়, ব্যাস। আজ যদি সত্যিই সমরের সঙ্গে চলে যেতে হয়, তবে এই ঘরের জন্য একটুকুও মায়া হবে না। হঠাৎ কী মনে করে বড়ো ট্রাংকটা খুলে বসল। ঘরে খুলে ফেলে রাখা যায় না যে জিনিসগুলো, সেগুলোই ট্রাংকের ভেতরে থাকে। তালা দেওয়া থাকে ওতে। জানা, তাও অবাক হয়ে সে দেখল, একদম নীচে ভাজ করে রাখা আছে বিয়ের বেনারসিটা। সেজোপিসি দিয়েছিল, ঠিক টকটেকে লাল না, একটু মেটে মেটে, সুন্দর রংটা। কেন রেখে দিয়েছে যত্ন করে? এক কোণে রুপোর সিঁদুরের কৌটোটা, না খুললেও জানে, ওটাতে এখনও সিঁদুর আছে। নিখিলবাবুদের বাড়িতে এ রকম সব জিনিস সে রেখে এসেছিল শাশুড়ির খাটের নীচে একটা সুটকেসে, ওটা সে আনেওনি।

আগে কলকাতায় যাবার সময় একটা ছোটো সুটকেস নিয়ে যেত। ওটা ব্যবহার হয় না বহুদিন। আলনার নীচে পড়ে আছে। সেটা বার করে একটু ধুলো ঝাড়তে হল। ভেতরে কিছু পুরোনো কাপড় ছাড়া বিশেষ কিছু ছিল না। সেগুলো আলনার ওপর ফেলে, সাবধানে দু-তিনটে যে ভালো শাড়ি আছে সেগুলো ভালো করে ভাঁজ করে রাখল সুটকেসে। আরো টুকটাক দুয়েকটা জিনিস। একটা ব্রাউন পেপারের বড়ো খামে, সার্টিফিকেট আর মার্কশিটগুলো—ওগুলোও

সাবধানে রাখল। একটা বটুয়ায় কিছু টাকা। ব্যাংকে সে কখনো টাকা রাখেনি—সমর ব্যাংকে চাকরি করত, সেটা থেকেই ব্যাংকে যাবার ব্যাপারে কেমন একটা অস্বস্তি লাগে। বটুয়াটা তুলে রাখল সুটকেসে। আর কী নেবে ভাবছে, এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ। মনে হল, তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নব।

—দিদিমণি আমায় খোঁজ করছিলেন?

—হ্যাঁ ভাই, তোমার সঙ্গে আমার খুব দরকার। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, এসো না, ভেতরে এসে বোসো।

—না দিদিমণি, গাড়ি রাস্তায় খোলা রাখা আছে, চোখ রাখতে হবে, আমি এখানেই দাঁড়াচ্ছি, আপনি বলুন।

দরজার চৌকাঠেই দাঁড়িয়ে রইল লোকটা। তবে কাল রাতে যে রকম চেহারা দেখেছিল, আজ একটু স্বাভাবিক লাগছে।

—আচ্ছা কাল রাতে যা হল, মানে যে তোমার গাড়িতে এল, তাকে ভালো করে দেখতে পেয়েছিলে? একটু ভেবেচিন্তে বলবে, কেমন দেখতে?

—কালকেই তো আপনাদের বললাম, আমি কিছু দেখতে পাইনি।

উত্তর দেবার ভঙ্গি শুনে মনে হল, লোকটা কিছুটা বিরক্ত হয়েছে। অবশ্য সে-সব ভাববার সময় তার নেই।

—না ভাই, একটু ভেবে বলো না, কিছু একটা।

—বললাম তো, আমি কিছু দেখতে পাইনি।

বিরক্তিটা এখন প্রকাশ্য।

—আচ্ছা, আমিই জিজ্ঞাসা করছি, লোকটার কি সরু গোঁফ ছিল?

বলেই মনে হল, বোকার মতো প্রশ্ন হয়ে গেল। তিরিশ বছর আগে সমরের সরু গোঁফ এখনো থাকবে তার গ্যারান্টি কী? সমরেরও তো বয়স হয়েছে, বয়স্ক লোকেরা বোধহয় সরু গোঁফ রাখে না।

—দিদিমণি অন্ধকারে আমি লোকটার মুখ কিচ্ছু দেখতে পাইনি, গোঁফ দাড়ি কিচ্ছু না।

—আচ্ছা, লোকটা কি খুব সিগারেট খাচ্ছিল?

—না।

বলেই লোকটা রোয়াক থেকে রাস্তায় নেমে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে বলল,

—কাজ আছে দিদিমণি, আমি চললাম।

লোকটা বোধহয় তাকে পাগল ভাবল।

চুপচাপ বসে রইল বিছানায়। আর এই চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া তার কোনো কাজও নেই। মনের মধ্যে যে কী চলছে, তা সে কেবল নিজেই জানে। বাইরের প্রত্যেকটা আওয়াজে তার মনে হচ্ছে, এইবার। দু-একবার মনে হল, দরজার সামনে কারোর পায়ের শব্দ, উঠে গিয়ে ভেতর থেকে বাইরের দরজার সামনে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল। না, সবটাই মনের ভুল।

একবার মনে হল, বেরোই। খোঁজ করে দেখি। কিন্তু কোথায় খুঁজতে যাবে? যদি তাকে খুঁজতে স্কুলে চলে যায়। স্কুলে গেলে তো জানতে পারবে, সে বাড়িতে চলে এসেছে।

আচ্ছা সমর কি ভয় পাচ্ছে আসতে? তার ভয়ে আসছে না। রাগ করে তো সে-ই চলে এসেছিল। তার সেই রাগের ভয়ে সামনে আসতে চাইছে না। সমর তো বুদ্ধিমান, আঠাশ বছর ধরে কেউ কি রাগ করে থাকে, এটুকু বুঝবে না? কিন্তু কী করে জানাবে যে, সমরের জন্যই সে অপেক্ষা করে আছে?

না, এভাবে বসে থাকা যায় না। স্কুল থেকে এসে শাড়িটা ছাড়েনি, চুলে একটু চিরুনি দিয়ে ব্যাগটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল। দরজায় তালাটা লাগাতে লাগাতে খেয়াল হল কথাটা। আবার ভেতরে এল। টেবিল থেকে পুরোনো একটা খাতার খালি পৃষ্ঠা ছিঁড়ে বড়ো বড়ো করে লিখল, 'আমি একটু বেরিয়েছি। অপেক্ষা কোরো, আমি এক্ষুনি ফিরব'। কাগজটার এক কোণ ছিঁড়ে দরজার কড়ার সঙ্গে লাগিয়ে তালাটা বন্ধ করার পর একটু নিশ্চিন্ত লাগছে। অন্তত তালা বন্ধ দেখে ফিরে যাবে না. দূর থেকেও কাগজটা দেখা যাচ্ছে।

বটতলার মোড়ে যে রিকশটায় উঠল সেটা চালাচ্ছে বুড়ো মতো একটা লোক। স্টেশন যাবে বলে সে উঠেছিল। স্ট্যান্ড ছেড়ে রিকশটা একটু এগোতে সে রিকশওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল,

—ভাই একটু বলতে পারেন, এই টাউনে হোটেল কোথায় আছে?

লোকটা অদ্ভুত ভাঙা গলায় উত্তর দিল, মনে হয় গলায় কিছু অসুখবিসুখ আছে।

—হোটেল বলতে তো ওই স্টেশনের কাছের আদর্শ লজ।

—আর কোনো হোটেল নেই।

—না মা, আর একটা ছিল উকিলপাড়ার মোড়ে রয়্যাল হোটেল, সেটা তো উঠে গেছে বহু দিন।

যাক বেশি ছোটাছুটি করতে হবে না। ওই এক জায়গায় খোঁজ করলেই হবে।

—আমাকে ওই আদর্শ লজে একটু নিয়ে চলুন।

স্টেশন রোডের ঠিক মুখে লজটা। যাতায়াতের পথে চোখে পড়েছে, কিন্তু এই প্রথম ভালো করে দেখল। কেমন একটা ভাঙাচোরা বাড়ি। ঠিক গেটের পাশে একটা টিউবওয়েল, সেখানে চান করছে লোকজন, সামনে খোলা নর্দমা। দরজার ওপরে পুরোনো সবুজ একটা সাইনবোর্ডে লজের নাম লেখা। সব মিলিয়ে দেখলেই কেমন একটা বিতৃষ্ণা হয়। সে মনে মনে ভাবল, যেমন টাউন তেমন তার একমাত্র হোটেল। এখন একটাই চিন্তা, ভেতরে গিয়ে কী করে সমরকে খুঁজবে। কী ভেবে সে রিকশওয়ালাকে বলে গেল, বাইরে তার জন্য অপেক্ষা করতে।

দরজার পরে প্রায়-অন্ধকার গলির শেষে একটা টেবিলের পেছনে কালো চাদর গায়ে দেওয়া একটা লোক রেডিয়োতে হিন্দি গান শুনছে। রেডিয়োতে গানের থেকে ঘড়ঘড় আওয়াজ বেশি হচ্ছে। গানের জন্যই অনেকটা চেঁচিয়ে বলতে হল,

—একটা খবর দিতে পারেন?

তার দিকে না তাকিয়ে রেডিয়োর চাবি নাড়াচাড়া করতে করতে লোকটা বলল,

—বলুন।

—আপনাদের হোটেলে কাল বেশি রাতে কিংবা আজ ভোরে কি কেউ এসেছে?

লোকটা অদ্ভুত একটা উদ্ধত ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল,

—আপনি কে?

মাথা গরম করা যাবে না, দরকারটা তার। গলাটাকে স্বাভাবিক রেখেই সে বলল,

—আমি নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের বাংলার দিদিমণি।

মনে হল কথাটায় কাজ হল। লোকটা একটু নরম গলায় বলল,

—হ্যাঁ দিদিমণি, কী জিজ্ঞাসা করছিলেন?

আবার একই প্রশ্ন তাকে করতে হল,

—দেখুন দিদিমণি আমার ডিউটি সকাল আটটা থেকে রাত আটটা। কাল রাত আটটা পর্যন্ত কেউ আসেনি। মাঝখানের ডিউটি নিতাইয়ের। ও আমাকে বলে গেছে ভোরে একজন বোর্ডার এসেছে।

—কী নাম বোর্ডারের একটু বলবেন ভাই।

ড্রয়ার থেকে একটা পুরোনো লম্বা বাঁধানো খাতা বার করে লোকটা পৃষ্ঠা ওলটাতে শুরু করল। তার মনে হচ্ছে তার জীবনের পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবে

এক্ষুনি। সে প্রায় দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে লোকটা জিজ্ঞাসা করল,

—চেনাশোনা কারো আসার কথা?

সে কোনো উত্তর দিল না। উত্তর দেবার মতো অবস্থা তার নেই। লোকটা পৃষ্ঠা উল্টেই যাচ্ছে, আর প্রতিটা মুহূর্তকে তার মনে হচ্ছে, এক একটা যুগ। লোকটা একটা পৃষ্ঠা খুলে কী একটা পড়ছে, কষ্ট করে কিছু একটা পড়ার চেষ্টা করছে। এর মধ্যেই তার মনে হল, লোকটা ভালো করে পড়তে পারে না, না কি যে লিখেছে তার হাতের লেখা খুব খারাপ।

—এই যে, বোর্ডারের নাম অশোক হালদার।

তার মুখ-চোখ কি অন্য রকম হয়ে গেছে? তা না হলে লোকটা এ-ভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে কেন? কয়েকটা মুহূর্তের পর তার নিজেরই মনে হল, এত ভেঙে পড়ার কী আছে, হতেই পারে সমর অন্য কোথাও উঠেছে। এও তো হতে পারে, সমর ইচ্ছে করেই নিজের আসল নাম এখানে বলেনি। বোঝাই তো যাচ্ছে, সমর খুব প্রকাশ্যে আসতে চাইছে না।

—আচ্ছা একটু বলবেন, এই বোর্ডারকে ঠিক দেখতে কেমন?

তার সম্পর্কে লোকটা যা খুশি ভাবুক গিয়ে, এ সব সে এখন পরোয়া করে না।

—এই রে আপনি আমায় মুশকিলে ফেললেন। আসলে কী হয়েছে জানেন দিদি, এই ঠান্ডায় ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, ডিউটিতে আসতেও তাই দেরি হয়েছে। আমি আসার আগে বোর্ডার বেরিয়ে গেছে। তবে আবার আসবে। আমায় নিমাই বলে গেছে, বোর্ডার অ্যাডভান্স দিয়ে দিয়েছে, সন্ধের ট্রেনে বেরিয়ে যাবে। বলুন, এলে আমি কী বলব?

সন্ধের ট্রেন মানে, কলকাতায় ফেরার গাড়ি। কোনো কথা না বলে সে বেরিয়ে এল। রিকশয় বসে তার খেয়াল হল, সকাল থেকে যে রোদটা ছিল তা আর নেই, বরং মেঘ করেছে। পশ্চিমের আকাশটা কেমন কালচে হয়ে এসেছে। লজটার ভেতরটা ভীষণ ঠান্ডা ছিল, কিন্তু বাইরেটা যেন আরো ঠান্ডা। রিকশওয়ালা জিজ্ঞাসা করল,

—মা, কোথায় যাব?

—নতুনপল্লি।

ঘরে ঢুকতে গিয়েই দেখল তার লেখা কাগজটা যেভাবে লাগিয়েছিল একই ভাবে দরজার কড়াতে লাগানোই আছে।

## ॥ ছাব্বিশ ॥

নিজের চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য তিনি নিজেই জানেন। কোনো একটা ঘটনা ঘটলে কখনো কখনো ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েন, কিন্তু উত্তেজনাটা স্থায়ী হয় না। তাঁর মাথাটা গরম হয় তাড়াতাড়ি, ঠান্ডাও হয় তাড়াতাড়ি। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে থাকতে গোটা বিষয়টাকে তিনি নতুন করে ভাবছিলেন। তখনই তাঁর মনে হল, এত অধীর হবার কী আছে, উমাপতির [illegible] তো সে কী করবে? পুরোনো ফাইল দেখিয়ে কিচ্ছু করতে পা[illegible]। এই একটা বছর তো তিনি শুয়ে বসে কাটাননি। নতুন ফাইল তার তৈরি হয়ে গেছে। তবে অমূল্যর প্রশংসা করতে হবে। নাওয়া-খাওয়া ভুলে, কলকাতায় ছোটাছুটি করে, সব কিছু ঠিকঠাক করে দিয়েছে। রাইটার্স বা সি আই ডি-র কোনো অফিসারের কথা আলাদা, কিন্তু অন্য কারোর পক্ষে কিচ্ছু বোঝা সম্ভব না। কী করবে উমাপতির ছোটো ছেলে, নাক টিপলে এখনো দুধ বেরোয়। এ কেস এই টাউনের বাইরে যাবে না, কলকাতা দূর অস্ত। এত দিন রাজনীতি করে এটুকু যদি না করতে পারেন, তবে তাঁর কীসের ক্ষমতা।

উমাপতির ছেলেকে মারার চেষ্টা করা হয়েছিল, কে করেছে তিনি কী জানেন? তাঁকে কোনো ভাবে জড়াতে পারবে না কেউ। পাবলিকলি তাঁকে জড়ানো যাবে না, কিন্তু আর কেউ জানুক বা না জানুক, ছেলেটা তো জানে কে তাকে মারতে চেয়েছিল। এক বার তাকে যারা মারতে চেয়ে মারতে পারেনি, তারা আবার মারার চেষ্টা করবে, ছেলেটা নিশ্চয়ই এ রকমই ভাবছে। ছেলেটা বাঁচবার চেষ্টা করবে মরিয়া হয়ে। এতদিন পরে সে এসেছে, মনে হয় আটঘাট বেঁধেই। আর তার একটাই উপায়, যে তাকে মারতে চায়, তাকে মারতে হবে। উলটোদিকে তাকেও তো ভাবতে হবে। কিছু প্রমাণ হয়তো করতে পারবে না, কিন্তু কথাগুলো তো বলেই যাবে। মুখ বন্ধ করবেন কী করে? আর এ কথা তিনি হাড়ে হাড়ে জানেন এই টাউনের লোকেরা সে কথা বিশ্বাস করবে।

ঢিঢি পড়ে যাবে চারদিকে, চোরের মতো মাথা নীচু করে তাঁকে বাঁচতে হবে। তাঁর পার্টিতেও তো শত্রুর অভাব নেই, কোনোভাবে কথাটা নেতাদের কান পর্যন্ত চলে গেলে? যদি তদন্ত হয়? এই টাউনের রাস্তা দিয়ে তাঁর কোমরে দড়ি দিয়ে নীরেনদারোগা নিয়ে যাচ্ছে, এ তিনি হতে দিতে পারেন না। এই ছেলের মুখ বন্ধ করাতেই হবে। এই টাউনে হয় উমাপতির ছেলেটা থাকবে, অথবা তিনি মরবেন। দুজনে একসঙ্গো বাঁচতে পারবে না। এটা ছেলেটাও বুঝছে, তিনিও বুঝছেন। কে কাকে আগে মারবে? তিনি এভাবে মরতে চান না।

স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন, ১০.৩৮ ক্যালিবার, যতবার যন্ত্রটা হাতে নেন, প্রত্যেকবার নামটা ভালো করে পড়েন। ভালো লাগে। কলকাতার যে লোকটার কাছ থেকে কিনেছিলেন, সে বলেছিল যুদ্ধের পর আমেরিকান সৈন্যরা নাকি জলের দরে এ সব বিক্রি করে গিয়েছিল। পয়সা ফতুর হয়ে গেলে বেশ্যার ভাড়া না দিতে পেরে দামি রিভলভার জমা দিয়ে যাবার ঘটনাও নাকি আকছার হত। লোকটা চেয়েছিল এক হাজার টাকা, দরাদরি করে রফা হয়েছিল সাতশোতে। লোকটা বলেছিল, নতুন কিনতে গেলে নাকি পাঁচ হাজার পড়ত। আসল মালিক বেশ্যাসক্ত কিনা তিনি জানেন না, কিন্তু যন্ত্রটি চমৎকার। জমিজমা আর ফসলের ভাগ নিয়ে গ্রামের দিকে তখন গন্ডগোল শুরু হয়েছে, বন্ধুরাই পরামর্শ দিয়েছিল একটা আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গো রাখতে। জনসমক্ষে তো আর বন্দুক নিয়ে চলাফেরা করা যায় না, কিন্তু সঙ্গোর বেল্টটা দিয়ে কোমরে বেঁধে ওপরে পাঞ্জাবি ঝুলিয়ে দিলে কে আর বুঝবে গান্ধীবাদী নিত্য ঘোষাল কী নিয়ে চলাফেরা করছে। তবে ঈশ্বরের কৃপা, আজ পর্যন্ত নিজের হাতে কিছু করতে হয়নি। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত শীতকালে বন্ধুরা মিলে দল বেঁধে ভাবুর চরে শিকার করতে যেতেন, তখন চালিয়ে দেখেছেন, চমৎকার।

দিনের এই সময়টা সুধাময়ী শোয়ার ঘরে থাকে না, রান্নাঘরের বাইরে জলচৌকিতে বসে এখন গোটা সংসারের রান্নার নির্দেশ দিতে ব্যস্ত। রিভলভার থাকে শোয়ার ঘরের লোহার বড়ো আলমারিটায়। তিনি জিনিসটা নিয়ে বেরোচ্ছেন। এটা যদি সুধাময়ী দেখে, তবে জবাবদিহি করতে করতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যাবে। একটা পুরোনো ধুতিতে জিনিসটা জড়িয়ে রাখা হয়, টোটাগুলো থাকে ছোটো চামড়ার একটা বটুয়াতে।

নিজের হাতে বেলেহাঁস মারা এক জিনিস, কিন্তু মানুষ? তাঁর ভূত ভবিষ্যৎ যাঁর হাতে তিনি যদি শক্তি জোগান, তা হলে হবে। ঠাকুর দেবতা নিয়ে আদিখ্যেতা

তার কোনোদিনই নেই। ভোরের সূর্য প্রণাম. ওইটুকুই তার পুজোআচ্চা। কিন্তু আজ তিনি ঠাকুরঘরে গেলেন। এ জায়গাটা সুধাময়ীর নিজের। অষ্টধাতুর ত্রিভঙ্গমুরারি কৃষ্ণের মূর্তিই প্রধান আরাধ্য, তাঁদের কুলদেবতা। তাঁর বংশ বৈষ্ণব, ছ পুরুষ আগে গুরু রামানন্দের কাছ থেকে কণ্ঠি পেয়েছিলেন তাঁরা। মুরলীধরের প্রেমিক মূর্তি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো কেবল প্রেমের ঠাকুর নন, তিনি বীর, তিনি কূটনীতিবিদ। কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে তো তিনি পাপপুণ্যের নতুন ব্যাখ্যা করেছিলেন। আজ সেই কৃষ্ণই হবে তাঁর পথপ্রদর্শক, সেই কৃষ্ণের কৃপাই তাঁর প্রয়োজন।

কিন্তু কোথায় যাবেন? কোথায় পাবেন ছেলেটাকে? ভিড়ের মধ্যে না, পেতে হবে একা, কাকপক্ষীও যাতে টের না পায়। ছেলেটাও তো তাঁকে একা পেতে চাইবে, কাজেই ছোটাছুটি না করে নিজের জায়গায় অপেক্ষা করাই ভালো। ধরাচুড়ো খুলে বাইরের ঘরে বসলেন, রিভলভারটা অবশ্য সঙ্গেই রেখেছেন। এই দ্বৈরথে অবশ্য সুবিধাটা তারই বেশি। ছেলেটা জানে না, তার আগমন তিনি টের পেয়ে গেছেন। ছেলেটা জানে না, তিনি তৈরি হয়ে আছেন। কাল ওই শীতের রাতে নতুনপল্লিতে চলে এসেছে যে, তার উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো সন্দেহ রাখার প্রয়োজন নেই। একবার এসেছে যখন আবার আসবে। আয়, নিত্য ঘোষাল তোর জন্য অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু মনে হয়, দিনের বেলায় প্রকাশ্যে সে আসবে না, আসবে রাতের অন্ধকারে। গলা তুলে তিনি হাঁক দিলেন, 'নিখিল, চিঠিপত্র কিছু এলে নিয়ে এসো।'

দুপুরে খাবার পর একটু বিছানায় গড়িয়ে নেওয়াটা তার পুরোনো অভ্যাস, প্রায় নেশার মতো। মনের ভেতরে অস্থিরতাটা যাচ্ছে না কিছুতেই, কাজেই ঘুমটাও ঠিকঠাক হল না, আধা ঘুম আধা জাগা একটা অবস্থা। হঠাৎ মনে হল, এই যে তিনি সারা দিন ঘরে আটকে রাখলেন নিজেকে, কাজটা কি ঠিক হল। ছেলেটা যদি নেমে পড়ে? বলেছিল, ঘড়ির মোড়ে মিটিং করে তার 'অপকর্ম'র কথা টাউনের সবাইকে জানাবে। যদি শুরু করে দেয়। উঠে পরলেন সঙ্গে সঙ্গে। টাউনের রাস্তায় একা একা পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানোটা তার পুরোনো অভ্যাস। জনসংযোগে সুবিধা হয়। আজ জনসংযোগ তার মাথায় নেই। এ টাউনের সবাই তার চেনা। রাস্তায় তাকে দেখলে কেউ নমস্কার করে, কেউ কুশল জানতে চায়। আজও অন্যথা হচ্ছে না। তিনি যন্ত্রের মতো প্রত্যুত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। একটা জিনিস দেখে অবাক হলেন। সকালেও কেমন রৌদ্রোজ্জ্বল ছিল, এখন আকাশ মেঘে ঢাকা।

বড়ো ঘড়ির মোড়ে কিছু নেই। বুক থেকে যেন একটা বোঝা নামল। আশেপাশের লোকজনের মুখচোখ দেখেও মনে হল না অস্বাভাবিক কিছু এখানে হয়েছে। পরের লক্ষ্য মিউনিসিপ্যালিটির সামনেটা, ওখানে নানা কারণে বিক্ষোভ সভাটভা হয়। তবে সেখানে কিছু হলে আগেই খবর পেয়ে যেতেন। তবুও সাবধানের মার নেই। না, এখানেও কিছু নেই। শনিবার এমনিতেই হাফছুটি, জায়গাটা একদম ফাঁকা। এবার তাঁর লক্ষ্য ইটখোলা, উমাপতির বাড়ি। মোড়ের মুখেই উমাপতির বাড়িটা। পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিলেন যন্ত্রটা ঠিকঠাক আছে কিনা। তাঁর কপাল ভালো, বাড়ির দরজার সামনে উমাপতির বড়ো ছেলে কোদাল দিয়ে কী একটা পরিষ্কার করছে।

তাকে দেখে কোদাল ফেলে হাতজোড় করল ছেলেটা। প্রত্যুত্তরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

—কি বাড়ির সবাই কুশল তো?

—না, মা-র শরীরটা ভালো যাচ্ছে না।

দেখতে শুনতে ভাইয়ের মতো হলেও ছেলেটা ভাইয়ের মতো লম্বা না। এবার আসল কথা,

—কি ভাইয়ের কোনো খবর পাওয়া গেল?

—না জ্যাঠামশাই, কোনো খবর নেই। কোথায় যে গেল! তবে কলকাতার কিছু চেনাশোনা লোক খবর দিয়েছে, আজকাল নাকি অনেক ছেলে জার্মানিতে কাজের খোঁজে চলে যাচ্ছে, আমাদের অপুও নাকি এ রকম চলে গেছে। তবে সে-রকম হলেও তো এতদিনে একটা খবর দিত।

গোটা জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি তাকিয়ে ছিলেন ছেলেটার মুখের দিকে। না, ছেলেটা অভিনয় করছে না। কথাগুলো সরল বিশ্বাসেই বলছে। অর্থাৎ বাড়িতে আসেনি, গা-ঢাকা দিয়ে আছে অন্য কোথাও।

—সে দ্যাখো, যদি তাই হয়, তবে তো মন্দের ভালো।

আকাশটা আরো কালো হয়ে আসছে, বৃষ্টি নামতে পারে। বিনা উদ্দেশ্যে এভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর অর্থ হয় না। শীতকালের বৃষ্টি, কিছুই বলা যায় না। এমনিতেই এ সময় তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা হয়, আজ আবার আকাশে মেঘ, ধুপ করে হঠাৎ অন্ধকার নেমে আসবে। এ সময় বাইরে থাকা যাবে না। তাড়াতাড়ি পা বাড়ালেন বাড়ির দিকে।

আসতে আসতে ভাবছিলেন, সিংহদরজা আজ তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিতে বলবেন কিনা। তাতে তিনি নিরাপদ, কিন্তু যার সঙ্গে তিনি মোকাবিলা করার

জন্য তৈরি হচ্ছেন সেও তো তাঁর সামনে আসতে পারবে না। বরং ঝুঁকিটা তিনিই নেবেন, খোলা রাখবেন দরজা। আর তিনি বসে থাকবেন নিজের অফিস ঘরে নিজের চেয়ারে, যেখান থেকে দরজা দিয়ে একটা বেড়াল ঢুকলেও দেখতে পাবেন। তাঁর স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন, ১০.৩৮ ক্যালিবার নিয়ে তিনি অপেক্ষা করবেন।

বটতলার মোড়ে এসে খেয়াল হল, কেমন জানি হাঁপিয়ে গেছেন। হেঁটেছেন অনেকটা, কিন্তু এ রকম হাঁটার অভ্যাস তো তাঁর আছে, আজ হঠাৎ কী হল? তা হলে কি ভয়ে নিজের অজ্ঞাতেই জোরে জোরে পা চালিয়েছেন? কে জানে। বাড়ির সামনে এসে রীতিমতো পরিশ্রান্ত লাগছে। সকালে এ রাস্তায় অনেক লোক ছিল, সবাই মজা দেখতে এসেছিল। এখন অবশ্য লোকজন বিশেষ নেই।

বাড়ির সামনে দিয়ে রাস্তাটা সোজা গেছে নদীর দিকে। রাস্তাটা এখান থেকে কিছুটা উঁচু হয়ে গেছে, তারপর হঠাৎ ঢালু হয়ে নেমে গেছে। এখান থেকে ভাঙা ব্রিজটার ওপরটা কেবল দেখা যায়। লোকটা বেয়ে বেয়ে নেমে আসছে ভাঙা ব্রিজটার ওপর থেকে।

এতদূর থেকে কিছুই বোঝা না গেলেও কেউ যে একটা নেমে আসছে, বোঝা যাচ্ছে। বুড়ো হয়েছেন, চোখের জোর কমেছে, বছর দশ আগে হলেও হয়তো বুঝতে পারতেন লোকটা কে। ভাঙা ব্রিজটার ওপর থেকে নামছে মানে, নদীর ওপার থেকে আসছে। ঠান্ডা বলে জল ভেঙে নদী পার হয়নি। তা হলে এই, গা ঢাকা দিয়েছিল ওপারে! কারণ টাউনের কেউ ওপারে যায় না। গা-ঢাকা দেবার ওটাই সবচেয়ে ভালো জায়গা, এটা তাঁরও খেয়াল হয়নি। ঠিক আছে, তিনিও যা করবার এখনই করবেন।

রাস্তার উঁচু জায়গাটায় পৌঁছে আর কাউকে দেখতে পেলেন না। সোজা এলে তাঁর চোখে পড়ত। বাঁ দিকে শ্মশান। একটা মড়া পুড়ছে। একটু দূরে চার-পাঁচটা লোক বসে। মনে হয় না, ওদিকে যাবে। ডান দিকে গেছে। অসুবিধা নেই, ওদিকটা তিনি ভালো চেনেন, প্রতিদিন প্রাতঃভ্রমণে ওদিকেই যান। শুধু বাদ সাধছে শরীরটা, সেই যে হাঁফ ধরেছে, সেটা যাচ্ছে না, বরং বাড়ছে। প্রতিটা পদক্ষেপে কষ্ট বাড়ছে। পকেটে হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন বরফের মতো ঠান্ডা বাটটা। হাতটা পকেট থেকে আর বার করবেন না, তৈরি থাকতে হবে। দু পা হেঁটেই তার মনে হচ্ছে আর হাঁটতে পারছেন না। একটু জিরিয়ে নেবেন? না, অন্ধকার নেমে আসছে। সঙ্গে একটা টর্চও আনেননি। দু-একটা বড়ো গাছ আর ঝোপঝাড়, এর মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা রাস্তাটা এঁকেবেঁকে গেছে। কষ্ট করে এগোচ্ছেন, এই ঠান্ডায়

দরদর করে ঘামছেন, শরীরে ভীষণ একটা অস্বস্তি হচ্ছে। তার এতটাই দূরবস্থা, সারা জীবন মানুষের জন্য এত করেছেন, আর আজ কেউ তার পাশে নেই। একেই বোধহয় কর্মফল বলে।

সামনের তেঁতুলগাছটার পেছনে কি কেউ লুকিয়ে আছে? কেন জানি, মনে হচ্ছে। এক পা পিছিয়ে দাঁড়ালেন আকন্দ ঝোপটার পেছনে। না, কিছু দেখা যাচ্ছে না। আলো কমে আসছে। ফিরে যাবেন? কিন্তু শরীরের যা হাল, একা এতটা হেঁটে ফিরতে পারবেন বলেও মনে হচ্ছে না। বাধ্য হয়েই কষ্ট করে এগোলেন। সামনের বাঁকটা পেরোলেন। সকালে যে পাথরটায় বসেছিলেন, সেটা এখন সামনে দেখা যাচ্ছে। যা হবার হোক, ওই পাথরটায় একটু বসে বিশ্রাম করবেন, আর পারছেন না।

পাথরটা বড়ো জোর দু পা সামনে, তার চোখ পড়ল নদীর দিকে। নদীর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। আলো কম। কিন্তু তিন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। রিকশওয়ালাটা যে-রকম বলেছিল সে-রকম, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কালো কোট, মাথায় টুপি। তাঁর দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে আছে। যা করবার, তাঁকে এখনই করতে হবে। রিভলভারটা পকেট থেকে বার করার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলেন, তাঁর হাতে ওটুকু জোরও নেই। দাঁতে দাঁত চেপে সর্বশক্তি দিয়ে রিভলভারটা বার করলেন, কিন্তু এই অবস্থায় কি ঠিকঠাক গুলিটা ছুঁড়তে পারবেন? চেষ্টা করতেই হবে, এ রকম সুযোগ আর আসবে না। টিপ ফসকে যেতে পারে, সব ক-টা গুলিই ছুঁড়বেন, অন্তত একটা যাতে লাগে। দু হাতে ভালো করে রিভলভারটা ধরে তাকালেন তাঁর লক্ষ্যের দিকে। আর ঠিক তখনই অদ্ভুত কাণ্ডটা ঘটল। লোকটা তার চোখের সামনে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। যেখানে লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে কেউ এখন নেই। তা হলে রিকশওয়ালাটা যা বলেছিল, তা সত্যি? ধুত, তা কখনো হয় নাকি!

ব্যাথাটা উঠল বাঁ দিকে পাঁজরাটার নীচ থেকে। ওঃ, কী ভয়ানক যন্ত্রণা! নিজের অজ্ঞাতেই অস্ফুটভাবে 'মা' ডাকটা বেড়িয়ে এল গলা থেকে। কোনো উপায় নেই, পাথরটার ওপর গিয়ে বসতেই হবে। তিনি পা বাড়ালেন, কিন্তু এক বিন্দুও এগোতে পারলেন না। শুধু বুঝতে পারলেন, তিনি পড়ে যাচ্ছেন মাটিতে। রিভলভারটা হাত থেকে খসে গেল, সেটাও বুঝলেন। কিন্তু সেটা কোথায় পড়ল, বুঝতে পারলেন না। তিনি আর নিশ্বাস নিতে পারছেন না। আর তখনই সে ফিরে এল, একদম তাঁর সামনে। মাটিতে পড়ে আকাশের দিকে মুখ করে তিনি তাকে দেখলেন। কোনো মানুষ কি এরকম হয়? মুখ-চোখ সব অন্ধকার, শুধু দুটো চোখ

জ্বলজ্বল করছে। সেই চোখ, তাঁর অফিসে ঢুকে বলেছিল, সব হিসাব নিয়ে ফিরে আসবে।

অসহায়ের মতো তিনি সমস্ত যন্ত্রণা নিয়েও তাকিয়ে রইলেন। আর সেই কালো মূর্তি ক্রমশ বড়ো হতে হতে পাতাহীন শিমুলগাছ ছাড়িয়ে ঢেকে ফেলল গোটা আকাশটা। শুধু একবার সুধাময়ীর মুখটা ভেসে উঠল। সেও অন্য সুধাময়ী, সেই কিশোরী, যে লাল বেনারসি পরে সবে এসে পৌঁছেছে তাঁদের বাড়িতে, তাঁর জীবনে। কিন্তু সে মুখও স্থায়ী হল না, রয়ে গেল শুধু অন্ধকার, শেষ অন্ধকার। আর তখনই ফোঁটা ফোঁটা করে বৃষ্টি নামল।

## ॥ সাতাশ ॥

লীলা স্বপ্ন দেখছিল, যাকে সে কখনো সে স্বপ্নে দেখে না, সেই নিখিলবাবুকে। নিখিলবাবু সুস্থ হয়ে গেছে। একটা নদীর ফাঁকা চরে তারা দুজন। দূরে দাঁড়িয়ে নিখিলবাবু হাত নাড়ছে, যেন চলে যাচ্ছে কোথাও। চেঁচিয়ে কী একটা বলছে, কিন্তু সে কিছু শুনতে পাচ্ছে না। বালি উড়িয়ে হু হু করে বইছে ঠান্ডা হাওয়া। আর তখনই ঘুমটা ভেঙে গেল।

ঘরের ভেতরটা প্রায় অন্ধকার, কিন্তু বাইরের দরজাটা খোলা, হু হু করে ঠান্ডা হাওয়া আসছে, আসছে শেষ হয়ে আসা শীতের বিকেলের শেষ আলোটুকু। খেয়াল করতে পারছে না, দরজাটা কি খোলা রেখেই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, নাকি কেউ ধাক্কা মেরে দরজাটা খুলেছে? চমকে ঘরের ভেতরটা ভালো করে দেখল, না, কেউ নেই। আর ঠিক তখনই বিদ্যুৎটা চমকাল, একটা জোরালো হাওয়া দরজাটাকে দুম করে বন্ধ করেই আবার হাট করে খুলে দিল। বাইরে বোধহয় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। যে-গন্ধটা নাকে এল সেটা তার চেনা, প্রথমে সে ধরতে পারেনি। পর মুহূর্তেই সে চিনতে পারল গন্ধটা কেয়াফুলের। এই টাউনে কোনোদিন কেয়াফুলের গাছ সে দেখেনি। তার স্মৃতিতে কেয়া ফুলের গন্ধের উৎস একটাই। ছোটোবেলায় অল্প কিছু দিন কলকাতায় গড়পারের একটা বাড়িতে ভাড়া থাকত তারা। সেখানে একতলা বাসাবাড়িব দেওয়ালের ঠিক ওপারে তার জীবনের একমাত্র পরিচিত কেয়াগাছটা ছিল। বর্ষাকালে ফুল ফুটলে নেশা ধরানো গন্ধটা আসত। গন্ধটা আসত একটা ভয়কে সঙ্গে নিয়ে, মা বলত, কেয়াফুলের গন্ধে নাকি সাপ আসে। সেই সময় সে ভয়ে দেওয়ালের কাছে যেত না। দেওয়ালের ঠিক এপারে তাদের দিকে ছিল ছোটো ছোটো সবুজ পাতার কয়েতবেল গাছটা, কোনোদিনও সে গাছে ফল হয়নি। গাছটায় উঠে খেলতে গিয়ে দাদা পড়ে গিয়ে হাত ভেঙেছিল। এই টাউনে, এই শীতকালে, কেয়াফুলের গন্ধ কোথা থেকে আসছে সে প্রশ্ন লীলার মনে এলই না, যেন এটাই স্বাভাবিক।

সকালে ঘুম থেকে উঠেও একবার মনে হয়েছিল. কিন্তু এখন সেই মনে হওয়াটা অনেক জোরালো। মনে হচ্ছে, তার কোনো অতীত নেই, সে জীবনে প্রথম ঘুম থেকে উঠল। এই যে টাউন, আর এই টাউনে তার প্রায় বিশ বছরের জীবন, কেমন যেন আবছা দূরের স্মৃতি। এবার সে নতুন করে জীবন শুরু করবে এবং এ এক অন্য জীবন, সে যা চায়, এবার ঠিক তাই হবে। এত ভালো তার কোনো দিনও লাগেনি।

ঘরের আলো জ্বালিয়ে হাতের ঘড়ির দিকে দেখল, পাঁচটা পঁয়ত্রিশ। এ রাম, কী দেরি করে ফেলেছে! সমর নিশ্চয়ই খুব রেগে যাবে, বেচারা একা স্টেশনে তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে। হাতে চিরুনিটা নিয়ে লীলা দাঁড়াল আয়নার সামনে। সত্যি, কী একটা চেহারা হয়েছে! এই অবস্থায় এতদিন পরে সমরের সামনে দাঁড়ানো, মরে গেলেও সে পারবে না। আর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করলে সমরের কোনো মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। আর সে যে আঠাশ বছর ধরে অপেক্ষা করে আছে?

চওড়া গোলাপি পাড়ের সাদা খোলের টাঙাইলটা সে কিনেছিল সখ করেই. এই টাউনেরই বড়ো ঘড়ির মোড়ের যমুনা ক্লথ স্টোর্স থেকে। দু-একবারের বেশি পরা হয়নি। একটু খুঁতখুঁত করছিল, সমর তাকে কোনোদিন সাদা খোলের শাড়ি পরতে দেখেনি। তবে তার যে বয়স হয়েছে, সেটা নিশ্চয়ই সমরও বুঝবে।

যত সরু করে পারা যায়, তত সরু সিঁদুর সে রাখে সিঁথিতে। এটা নিখিলবাবুর সঙ্গে তার সম্পর্ক জানাতে নয়, কিছুটা অন্য পুরুষের নজর থেকে আত্মরক্ষা করতে। সমরকে ছেড়ে আসার পর সে সিঁদুর পরত না। কখনো কখনো মনে হয়েছে, হঠাৎ করে যদি সমর চলে আসে, তাকে এই ভাবে দেখলে কি মনে করবে। কিন্তু বউদি যদি এটাকে তার দুর্বলতা মনে করে, এই ভয়ে সে কিছু করেনি। কিন্তু আজ তার আর কোনো চিন্তাই নেই। আঠাশ বছর পর সে আবার ফিরে যাচ্ছে তার পুরোনো জীবনে, তার আসল জীবনে। মাঝখানের সময়টা সে ভুলে যাবে। মনে মনে ক্ষমা চেয়ে রেখেছে নিখিলবাবুর কাছে, তার কোনো দুঃখও নেই অনুশোচনাও নেই। একদিনের জন্যও তারা একে অন্যকে ভালবাসেনি।

একটু বোধহয় বড়োই হয়ে গেল টিপটা। যাক এই রাতে কে আর এত দেখবে। সুটকেসটা হাতে নিয়ে এক হাতে দরজায় তালা লাগাতে লাগাতে দেখল টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কিন্তু ছাতাটা ঘরের কোথায় রাখা, কিছুতেই মনে পড়ল না। আর খুঁজে দেখবার পক্ষে দেরি হয়ে গেছে।

চেয়ারম্যানের পাড়া হওয়ায় তাদের একটাই সুবিধা, অধিকাংশ দিনই এখানে রাস্তায় আলো জ্বলে। রাস্তায় কোনো রিকশ নেই, এই বৃষ্টির মধ্যে বটতলা পর্যন্ত হাঁটতে হবে।

'দিদি, কোথায় যাচ্ছেন?' প্রশ্নটা শোনবার আগে খেয়ালই হয়নি, কখন মেয়েটা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার সামনে মিলি। ডাক্তারবাবুর মেয়েটাকে তার বরাবর ভালো লাগে। আর বাংলাটাও চমৎকার লিখত। এই টাউন ছেড়ে সে চিরকালের মতো চলে যাচ্ছে। যাবার আগে আর কারুর সঙ্গে না, মিলির সঙ্গে দেখা হওয়াতে ভালো লাগছে।

মেয়েটা তাকে দেখে যেন অবাক। পর মুহূর্তে খেয়াল হল কারণটা, সিঁদুরের টিপ, এই টাউন তাকে এ-ভাবে কখনো দেখেনি। হাসি মুখে লীলা বলল,

—চলে যাচ্ছি রে।

—কোথায়?

—আসলে আমার হাজব্যান্ড আমায় নিতে এসেছেন, আমার জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করছেন। আর বোধহয় তোদের সঙ্গে দেখা হবে না কোনোদিন।

অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকা মেয়েটার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল,

—ভালো থাকিস তোরা সবাই।

ঠান্ডায় বৃষ্টিতে মেয়েটাকে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড় করিয়ে রেখে লীলা হাঁটা লাগাল। দু পা গিয়ে গিয়ে কী ভেবে আবার ফিরে এসে এক দৃষ্টিতে মিলির চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল,

—কখনো দুঃখ পেলে বলাকার কবিতাগুলো পড়িস, মনে শান্তি পাবি।

## ॥ আঠাশ ॥

মা-র চ্যাঁচামেচিতে বাবাও এসে হাজির। কীভাবে যেন নাড়ি টিপে বাবা বলে দেয় জ্বর কত, থার্মোমিটার দিতে হয় না। আজ সে সব দেখে বলল নিরানব্বই ডিগ্রির ওপর। এ রকম হলে বাবা লাল রঙের একটা ওষুধ দাগ মেপে খেতে দেয়, তাকে সেটা খেতে হল। আর এই সুযোগে, কাল রাতে যে ভয়ংকর কেউ একটা এসেছে সে ব্যাপারে মায়ের থিয়োরিটা নতুন করে শুনতে হল এবং তার এই জ্বর যে সাধারণ জ্বর না, এটাও সিদ্ধান্ত আকারে মা জানিয়ে গেল। পাঁচ মিনিটেই তাকে দু-দুটো ভারী লেপের নীচে চাপা দিয়ে, মাথার ওপর কোনো এক ঠাকুরের প্রসাদি ফুল রেখে মা কিছুটা নিশ্চিত হল।

কেমন একটা আধো ঘুম, মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছে, সে চোখ বুজে রইল। কোনো নির্দিষ্ট চিন্তা না, নানা টুকরো-টুকরো বিষয় আসছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে মাথা থেকে। নীচের থেকে মায়ের কিছু-কিছু কথা, হালকা হয়ে আসা ইন্দ্রর পারফিউমের গন্ধ, কাল রাতের ঘটনা, বোধহয় কলে বেরিয়ে যাবার আগে বাবা একবার এল, তার কপালে হাত রাখল—সব মিলিয়ে মিশিয়ে একটা অদ্ভুত শূন্যতা। তাকে ডেকে তুলল মা, দুপুরে খাবার নিয়ে। খেতে ভালো লাগছিল না, কিন্তু মা আবার বকাবকি করবে, এই ভেবে সে কিছুটা খেল। তারপর আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

তার ঘুমটা ভাঙল হঠাৎ। প্রথমেই যেটা মনে হল, সে একটানা গভীরভাবে ঘুমিয়েছে, কোনো স্বপ্নও সে দেখেনি। ধড়মড় করে উঠে বসল। সকাল থেকে মাথাটা ভার হয়ে ছিল, সেটা আর নেই। কিন্তু এভাবে ঘুম ভাঙল কেন? কেউ কি ডাকছে, নাকি ইন্দ্র আবার এল? দেওয়াল ঘড়িতে প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজে। এই শীতকালে তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়, কিন্তু এখান থেকে মনে হচ্ছে পুরোপুরি অন্ধকার বাইরে। কেমন জানি মনে হচ্ছে কোনো একটা জরুরি কাজ আছে, কিন্তু তার দেরি হয়ে যাচ্ছে। সে অনেকক্ষণ মনে করার চেষ্টা করল, কী কাজ? না,

কিছুই মনে পড়ছে না। অস্বস্তিটা থেকেই যাচ্ছে, কেউ কি তার জন্য অপেক্ষা করছে? সে জানে না।

ভারী শালটা গায়ে জড়িয়ে বারান্দায় বেরিয়ে আসতে সে অন্ধকারের কারণ বুঝতে পারল। ঘন কালো হয়ে মেঘ করেছে। মেঘটা গরমকালের কালবৈশাখীর মতো, শীতকালের মেঘের মতো না। আকাশটা যেন তার বাইরে আসার জন্য অপেক্ষা করছিল, একটা দমকা ঠান্ডা হাওয়া বয়ে গেল, আর ছাদের ওপারে মাঠের ওপর আকাশটাকে আধাআধি চিরে বিদ্যুৎ চমকাল। আকাশটা যেখানে মাটিতে মিশেছে। সেখানে বিদ্যুতের আলোয় সে পরিষ্কার পাহাড়গুলো দেখতে পেল। কে যেন বলে উঠল, আর দেরি কোরো না।

গোটা বাড়িতে কোনো সাড়াশব্দ নেই। হতে পারে মা কোথাও বেরিয়েছে আর বাবা রুগি দেখে ফেরেনি। সে পায়ে পায়ে নেমে এল নীচে। দরজা খুলে সোজা রাস্তায়। ফোঁটা ফোঁটা করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। গোটা রাস্তায় কেউ নেই। একটা ছাতা নিয়ে আসবে কিনা ভাবছিল, কিন্তু ভেতর থেকে কেমন একটা তাড়া সে অনুভব করছে, কীসের যেন সে দেরি করে ফেলেছে। যে শালটা গায়ে জড়িয়ে বেরিয়েছিল, সেটা দিয়েই ভালো করে মাথাটা জড়িয়ে নিল। আর তখনই লীলা দিদিমণিকে তার চোখে পড়ল। স্কুলে যতদিন ছিল ততদিন লীলাদিকে তারা সবাই এড়িয়েই চলত, কেমন রসকষহীন ছিলেন, ভয়ই করত। কিন্তু স্কুল থেকে বেরোনোর পর রাস্তাঘাটে যখন দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে কি সুন্দর হেসে হেসে কথাবার্তা বলেন, আর একই পাড়ায় থাকাতে তার সঙ্গে ঘনঘনই দেখা হত।

আকাশে অত মেঘ থাকা সত্ত্বেও এখনো একটু একটু আলো আছে, আর মিউনিসিপ্যালিটির আলো জ্বলে গেছে রাস্তায়। একটা অদ্ভুত অন্ধকারের পাড় দেওয়া আলোতে সে লীলাদিকে দেখল। কী সুন্দর লাগছে! চওড়া গোলাপি পাড়ের একটা তাঁতের শাড়ি, আর কপালে এত বড়ো সিঁদুরের টিপ। এভাবে লীলাদিকে কোনো দিন দেখেনি।

লীলাদি চলে গেলে সে বৃষ্টির মধ্যেও অবাক হয়ে দাড়িয়ে রইল। টাউনের সবাই জানে, লীলাদির স্বামী উন্মাদ, পাগলাগারদে আছে। আবার কেউ কেউ বলে, আসলে লীলাদির স্বামী তাকে ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু সে যাই হোক, সেই ভদ্রলোক ফিরে এসেছেন এতদিন পর, আর কাউকে কিছু না বলে লীলাদি চিরকালের মতো এই টাউন ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। লীলাদির মুখচোখ আনন্দে আলো হয়ে আছে, যেন জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়েছেন। সে মনে মনে বলল,

ভালো থাকবেন দিদি। কিন্তু আবার ফিরে এসে 'বলাকা' পড়তে বললেন কেন? বলাকা'য় তো অনেকগুলো কবিতা, তার কোন- কোনটা পড়ব, তা তো লীলাদি বলে গেলেন না। 'ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা', 'সবুজের অভিযান'—ওটা তো ক্লাস নাইনে লীলাদিই পড়াতেন, ওটাই আবার পড়তে বলছেন? মনে হয় না। তা হলে? 'বলাকা'র সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতা তো 'সাজাহান'। ও তো ঐতিহাসিক প্রেমের কবিতা, ও সব ইতিহাসেই হয়। সে আজ দুঃখ পেলে সাজাহান পড়বে? ধ্যাত! কিন্তু ওই কবিতার নামটা কী? শেষ লাইনগুলো মনে আছে।

*ওগো আমি যাত্রী তাই—*
*চিরদিন সম্মুখের পানে চাই।*
*কেন মিছে*
*আমারে ডাকিস পিছে*
*আমি তো মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে*
*রব না ঘরের কোণে থেমে।*
*আমি চিরযৌবনেরে পরাইব মালা,*
*হাতে মোর তারি তো বরণডালা।*
*ফেলে দিব আর সব ভার,*
*বার্ধক্যের স্তূপাকার*
*আয়োজন।*
*ওরে মন,*
*যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ আজি অনন্ত গগন।*
*তোর রথে গান গায় বিশ্বকবি,*
*গান গায় চন্দ্র তারা রবি।*

যেভাবে বিশু বেরিয়ে এল মিলি প্রায় চমকে গিয়েছিল। উল্টোদিকের দুটো বাড়ির মাঝখানের একটা গলি, সেটাও ঢাকা প্রায় একটা কাঁচা নর্দমায়। সেই অসম্ভব ময়লা নর্দমাটা এড়িয়ে সাবধানে পা ফেলে ফেলে লোকটা আসছে। ময়লা বাঁচাতে লোকটা এতই ব্যস্ত রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে সে যে দেখছে, সেটাও খেয়াল করছে না। শেষ একটা লাফ দিয়ে লোকটা রাস্তার ওপর এসে দাঁড়াল একদম তার সামনে। আর তখনই মিলিকে চোখে পড়ল তার। কেমন একটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে লোকটা তার সামনে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

একটা লোক ওরকম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে,

গোটাটাই কেমন বোকা বোকা। বাধ্য হয়েই কোনোদিনও কথা হয়নি এ রকম একটা মানুষকে জিজ্ঞাসা করল,

—কোথায় চললেন?

তার এই কথা শুনে লোকটা যেন প্রথম নিশ্বাস ফেলল, তারপর কেমন একটা লাজুক গলায় বলল,

—আমি একজনকে খুঁজছি?

মিলি চমকে উঠল, লোকটাও কি তা হলে খবর পেয়েছে?

## ॥ উনত্রিশ ॥

বারোটা নাগাদ পবন ফিরল। আজ ডিউটিতে যাবার আগে রান্নাবান্না করে যেতে পারেনি। ঠান্ডায় রোদ পোয়াতে সে উঠোনে বসেছিল, তাকে ওই অবস্থায় দেখেই কড়া করে অর্ডার দিল,

—বাহার মত, অন্দর আকে বইঠিয়ে।

তাকে আরো কড়া নজরে রাখার নির্দেশ যে পবনকে দেওয়া হবে এটা সে জানতই, কাজেই এই নতুন অর্ডারে খুব একটা অবাক হল না। কিন্তু পুলিশ কিছু খোঁজ পেল কিনা এ ব্যাপারটা পবনের কাছ থেকে একটু বুঝতে হবে। কাজেই পত্রপাঠ পবনের নির্দেশ মেনে ঘরে এসে বসল। আগ বাড়িয়ে কিছু না বলে সে ঠিক করল পবনই আগে মুখ খুলুক, তারপর কথাবার্তাটাকে ওদিকে টেনে নিয়ে যাবে। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও পবনের দিক থেকে কোনো কথাবার্তা আভাস পেল না। তার দিকে কোনো নজর না দিয়ে পবন এক মনে সবজি কাটছে, উনুনে ফুটছে ডাল। পবনের রান্নার পর পর কাজগুলো সে জানে। বিষয়টাকে স্বাভাবিক করতে জিজ্ঞাসা করল চালটা ধুয়ে দেবে কিনা। তার দিকে না তাকিয়ে পবনের জবাব, জরুরত নেহি।

অসহায়ভাবেই সে ভাবছিল, কী করবে। বোঝাই যাচ্ছে, পবনের মুখ সে আজ খোলাতে পারবে না। শুধু আজকের জন্য, নাকি চিরকালের মতো, সেটাই চিন্তা। অনেক কষ্ট করে পবনের আস্থা অর্জন করেছিল, যা তার এই বন্দি জীবনের সবচেয়ে বড়ো সহায় হয়েছিল, সেটা বোধহয় গেল। যাক, তাতে তার কিছু যায় আসে না, পবনকে তার আর দরকার হবে না, যা হবার তা আজকেই হয়ে যাবে। হয় সে আজ এই জেলখানা থেকে মুক্তি পাবে, অথবা আরো বড়ো কোনো শাস্তি তার জন্য অপেক্ষা করছে। সে নিশ্চিত, জেল ভেঙে পালানো কয়েদিকে এভাবে রাখা হবে না। এখন চুপ করে পবনকে দেখা ছাড়া আর কোনো কাজ তার নেই।

সে অবাক হয়ে দেখল, রান্না হয়ে যাবার পর দুটোর বদলে পবন তিনটে থালা বার করল। প্রথম থালায় বিপুল পরিমাণের ভাত আর মানানসই পরিমাণের ডাল আর সবজির ঘ্যাঁট বেড়ে নিয়ে সেই থালা হাতে পবন বেরিয়ে গেল বাইরে।

ও, আজ শুধু পবন একা না, তাকে পাহারা দেবার জন্য আর একজন সান্ত্রি বাইরেও খাড়া আছে। রাগ হতে গিয়েও হল না এটা ভেবে, তার জন্য এত আয়োজন মানে, বাইরের থেকে যে এসেছে তার হদিস বোধহয় এখনো পায়নি।

খাবার সময়ও পবন গম্ভীর, কোনো কথা নেই। রান্নার হাঁড়ি-কড়াই ধুয়ে আবার পুলিশের ধরাচুড়ো পরে পবন যখন বেরিয়ে যাচ্ছে সে শেষ চেষ্টা করল,

—কী হল পবনভাইয়া, কোনো কথাবার্তা বলছ না?

খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে পবন তার দিকে ফিরে তাকাল,

—বিশুবাবু ম্যায় বরবাদ হো গ্যায়া। অউর বরবাদ হুয়া স্রেফ আপকে লিয়ে।

লোকটার চোখে দেশওয়ালি সারল্যের সঙ্গে মিশেছিল একটা অসহায় রাগ। তার খারাপই লাগছিল। বাইরের থেকে তালাটা দেওয়া হল বেশ শব্দ করে, অর্থাৎ তাকে জানান দিয়েই।

সে আবার উঠোনে গিয়েই বসল, ঘরটা ভীষণ ঠান্ডা, বাইরে অন্তত রোদটা আছে। যে এসেছে তার কাছে, তার নিশ্চয়ই চোখে পড়েছে বাইরের পাহারার বহর। বোকার মতো নিশ্চয়ই তার কাছে আসতে গিয়ে ধরা পড়বে না। কিন্তু তা হলে তার সাথে যোগাযোগ করবে কী করে? হতেই পারে, ব্যাপারটা একটু ঠান্ডা হবার জন্য কয়েক দিন অপেক্ষা করবে। কিন্তু এখানে অপেক্ষা করবে কোথায়? সে একশো ভাগ নিশ্চিত, এই টাউনে পার্টির কেউ নেই, কেউ থাকতে পারে না। কাল সকালে যে-লোকটাকে তার বাড়ির সামনে ঘুরঘুর করতে দেখেছে সে-লোকটা এই টাউনের কেউ না। যেখানে কোনো নিরাপদ শেলটার নেই, সেখানে থাকবে কী করে? দুটো রাস্তা খোলা, হয় মরিয়া হয়ে আজই একবার চেষ্টা করবে, অথবা এখন চলে যাবে, পরে কখনো আবার সুযোগ বুঝে আসবে। কিন্তু সেই ‘পরে’টা কবে? সে জানে না, বোধহয় কেউই জানে না। সে মরে যাবে, এইভাবে বাঁচতে পারবে না—এইভাবে দিনের পর দিন অপেক্ষা করা যায় না। আর তার আসল জেলখানায় বাস তো আজ থেকে শুরু হল। এই ঘর আর উঠোনের ওপরের আকাশটুকু, ব্যাস। এই টাউনটাই একটা জেলখানা, কিন্তু বাইরে তো গোটা একটা আকাশ আছে। তার হার্মিটেজ আছে। দেখতে সেটা যতই খারাপ হোক, একটা নদী তো দেখা যায়। শুকনো মাটির

দেশ, প্রথম গরম পড়লে পাতাঝরা ন্যাড়া গাছে টকটকে লাল শিমুলফুল ফোটে। গোবর আর খড়ের গন্ধ ছাপিয়ে বটতলার মোড়টা পার হলে বর্ষাকালে কাঁঠালিচাঁপার গন্ধ পেয়েছিল দু একবার, যদিও গাছটা খুঁজে পায়নি। আর বৃষ্টি এলেই হার্মিটেজে ফুল ফুটবে। সব বন্ধ।

হঠাৎই খেয়াল হল, কখন যেন আকাশটা ঢাকা পড়েছে মেঘে, রোদ নেই বরং ভীষণ ঠান্ডা। বাধ্য হয়েই সে ফিরে এল ঘরে। ঘরের ভেতরেও আলো কমে এসেছে। তার এখন একটাই কাজ। দুপুরে পবন আসবে বলে সে সকালে ব্যাগটা গোছায়নি। গোছানো মানে কাপড়ের ঝোলা ব্যাগে দু-একটা জামাকাপড় আর টুকিটাকি ভরে নেওয়া। ডাক পড়লে যাতে এক সেকেন্ডও দেরি না হয়। শীত লাগছে ভীষণ, ইচ্ছে করছে কম্বলের নীচে ঢুকতে। না, আজ তা আর করা যাবে না, যদি চোখটা লেগে আসে, যদি সিগন্যাল শুনতে না পায়।

মেঘটা আরো ভারী হয়ে আসছে, ঘরের ভেতরটা এখন বেশ অন্ধকার। তার ঘড়ি নেই, ঘরেও কোনো ঘড়ি নেই। এখানে তাকে সময় বুঝতে হয় আন্দাজে, কিন্তু এ রকম অন্ধকারে ক-টা বাজে কিচ্ছু বুঝতে পারছে না। সে জানে, যদি কিছু হয় আজ তবে, তা হবে সন্ধে ছ-টার মধ্যেই। কলকাতায় ফেরার ট্রেনটা সাড়ে ছ-টায়, পার্টি তার জন্য যাকে পাঠিয়েছে যদি এর মধ্যে কিছু করতে না পারে, তবে সে আর বাড়তি কোনো রিস্ক নেবে না, এই ট্রেনেই কলকাতায় ফিরে যাবে। পুলিশ তার বাড়ির দরজার ওপর নজর রাখছে, কিন্তু কমরেডটিও নিশ্চয়ই একই কাজ করছে। সে যদি এখন পাঁচিল টপকে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায় তবে সে তাকে দেখতে পাবে। কিন্তু পুলিশও তো দেখতে পাবে। কীভাবে পুলিশের চোখ এড়িয়ে এ কাজ করা যায়? কিছু করার নেই তাকে একটা রিস্ক নিতেই হবে। এই অন্ধকারটা তাকে সাহায্য করতে পারে। ঠিক আছে, ধরা পড়লে পড়ব, পবনের সঙ্গে এক ঘরে এই টাউনে পচে মরার চেয়ে অন্য জেলখানায় যাবজ্জীবন ভালো। এখানের কনস্টেবলদের হাতে লাঠি ছাড়া আর কিছু থাকে না, সেটা লক্ষ্য করেছে। কিন্তু প্রথম দিনই নীরেনদারোগা তাকে পিস্তল দেখিয়ে রেখেছে, আর জেল-পালানো কয়েদিকে মারলে নাকি কোনো জবাবদিহিও করতে হয় না। সে দাঁড়িয়ে পড়ল উঠোনে নামতে গিয়ে।

এমন সময় বৃষ্টি নামল। এই রাস্তায় বৃষ্টির হাত থেকে মাথা বাঁচানোর মতো কোনো ঢাকা নেই। এই ঠান্ডায় বৃষ্টি মাথায় করে নিশ্চয়ই পুলিশ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে না, মাথা বাঁচাতে কোথাও ঢুকবে, অথবা ছাতা আনতে থানায় ছুটবে। এই সুযোগ।

লাফিয়ে সে নামল জলের মধ্যে। আধো অন্ধকারে ওপর থেকে বোঝা যায়নি, নেমেছে একটা কাঁচা নর্দমার মধ্যে। জলটা ঠান্ডা, তার থেকে বড়ো কথা পাজামার নীচটা নোংরা কাদায় একদম মাখামাখি হয়ে গেল। সাবধানে দুটো বাড়ির পাঁচিলের মাঝখানের সরু গলিটা দিয়ে সে এগোল যতখানি সম্ভব জল-কাদা-পাঁক বাঁচিয়ে। আর শেষে একটা লাফ দিয়ে এসে দাঁড়াল রাস্তার ওপর।

নিজেকে মনে মনে অশ্রাব্য গালাগাল দিল, সে এতটাই ননসেন্স, কাদার ভয়ে চারদিকে না তাকিয়ে সোজা রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না, তার সামনে পুলিশ নেই, দাঁড়িয়ে আছে মিলি—এই জেলখানার মতো টাউনে তার একমাত্র ভালো লাগা মানুষটি। কিন্তু এভাবে সে বেরিয়েছে, কেন বেরিয়েছে মিলিকে কী বলবে? মনে মনে ঠিক করে এসেছিল যদি পুলিশের সামনে পড়েই যায় তবে বলবে, পেটব্যথা করছে, তাই ডাক্তারবাবুর কাছে যাচ্ছে। কিন্তু মিলিকে কী বলবে? কিছু না পেয়ে বোকার মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মিলির সামনে। তবে মনে হচ্ছে, তাকে এই অবস্থায় দেখে মিলিও অবাক হয়েছে। সে আড়চোখে দেখবার চেষ্টা করল, রাস্তায় আর কেউ আছে কিনা—না, কেউ নেই।

মিলিই প্রথম কথা বলল,

—কোথায় চললেন?

কথাটা শুনে একটু আশ্বস্ত হল, অন্তত প্রথম কথাটা তাকে বলতে হল না। না, মিলিকে কোনো মিথ্যা কথা বলবে না, বরং সব কথা খুলে বলবে, সাহায্য চাইবে। মিলি তাকে ফেরাবে না।

—আমি একজনকে খুঁজছি।

## ॥ ত্রিশ ॥

সকালে দোকান খুললে দোকানের দেখাশোনা করে যে ছেলেটা, সেই জগদীশ চলে আসে। জগদীশকে দোকান বুঝিয়ে দিয়ে সুকুর বাবা যায় বাজার করতে, বাজার করে আবার দোকানে এসে বসে, আর জগদীশকে দিয়ে বাজারটা বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। আজকেও বাজারটা দিয়ে গেল। মনের মধ্যে কী চলছে তা নিজেই জানি। কিন্তু একদণ্ড বসে জিরোনো বা চোখের জল ফেলার উপায় নেই, যাও এখন রাবণের গুষ্টির পিণ্ডি রাঁধতে। ন মাসের পোয়াতি বউকে তো আর চুলোর কাজ করতে দেওয়া যায় না। চুলোর কাজ করতে হবে না, কিন্তু হাতে হাতে কাজ একটু এগিয়ে দিতে কী! শাশুড়িরও তো বয়স হয়েছে! না, ঘরে বসে বরের সাথে সারাক্ষণ গুজুর গুজুর করা। তার বড়ো ছেলেও তো হয়েছে সে রকম। না, এবার উঠতেই হবে।

তোলা কাজ করে সুধা, তাকে বললাম, 'মা, একটু আটাটা মেখে দিবি রে।'

কলতলায় বাসন মাজতে মাজতে সুধা কোনো উত্তর দিল না।

—আচ্ছা, ব্যাটার জন্য চারটে রুটি যাবার সময় নিয়ে যাস।

মাথা না তুলেই এবার বলল,

—তাড়াতাড়ি আটা বার করে দাও, আমার আরো দু বাড়ির কাজ পড়ে আছে।

বাজারের থলিটা হেঁশেলের মেঝেতে উপুড় করতেই লাফাতে লাফাতে মাছগুলো বেরিয়ে এল। খুব বড়ো না কইগুলো। কোনোদিনই রোজ মাছ হত না তাদের বাড়িতে, কিন্তু নাতিটা মাছ ছাড়া খেতে চায় না। অল্প হলেও নাতির জন্য দাদু রোজই মাছ কেনে।

কিন্তু কইমাছ তো খেতে ভালোবাসে তার সুরো। সেটা তো তার বাপও জানে। আজ কেন কই কিনে পাঠাল? তবে কি সুরো তার বাপের কাছে কোনো খবর

পাঠিয়েছে? ছুটে বেরিয়ে এলাম বাইরে। সুকুর বাবা কি খবরটা দিতে এল? উঠোনে সুবোধটা দাঁত মাজছে, আর কেউ নেই। রান্নাঘর থেকে সুধাটা চ্যাঁচাচ্ছে, 'ও মা, তোমার জিয়োল্ মাছ পালাচ্ছে।' আবার ফিরে আসতে হল রান্নাঘরে। ঠিক আছে, এক্ষুনি তো সকালের খাবার খেতে বাড়ি ফিরবে। কিন্তু মনের মধ্যে তোলপাড়, শরীরেও যেন বশ নেই। রুটিগুলো ঠিকঠাক গোল হচ্ছে না, আলুর তরকারিটা সাঁতলানোর সময় ধরে গেল।

—কই আমার সোনাবাবু কই, দ্যাখো তোমার জন্য গরম জিলিপি এনেছি।

বাইরে সুকুর বাবার গলার আওয়াজ, নাতিকে ডাকছে। নাতির সাথে তার মা'ও বেরিয়ে এসেছে। বউয়ের সামনে সুরোর কথা বলা যাবে না। হাত নেড়ে ডাকতে মানুষটা এসে দাঁড়াল রান্নাঘরের দরজায়। গলাটা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,

—হ্যাঁ গো, সুরো কোনো খবর দিয়েছে?

লোকটা কপাল চাপড়ে উঠল,

—বোঝো, কোনো পাগলের পাল্লায় পড়েছি! এখনো ওই একই কথা?

দ্যাখো, এখনো লুকোচ্ছে। গলা তুলে জিজ্ঞাসা করলাম,

—তা হলে কইমাছ এনেছ কেন?

—আরে, সস্তায় পেলাম তাই এনেছি।

হে ভগবান, মায়ের পাশে এসে দাঁড়ানোর কেউ নেই এ দুনিয়ায়! আঁচলে চোখ ঢাকলাম। চোখের জলে বোধহয় মনটা একটু নরম হল। পাশে এসে দাঁড়াল, আস্তে করে কাঁধে হাত রাখল, গলাটা নরম করে বলল,

—কী পাগলামো করছ?

সেই এক কথা।

—আমাদের ছেলেটাকে পুলিশ মেরে ফেলেছে, ও আর কোনোদিন ফিরবে না। শুধু শুধু চোখের জল ফেলে লাভ কী?

—কে বলেছে, আমাদের ছেলে মরে গেছে? কে দেখেছে? কাল রাতে আমার সুরোই এসেছে, পুলিশের ভয়ে শুধু ঘরে ফিরতে পারছে না।

—কে বলেছে তোমায়?

—তোমার পুলিশই বলেছে, সকাল থেকে পুলিশ সুরোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

—আরে না বাবা, পুলিশ অন্য লোককে খুঁজছে। পাগলামো কোরো না আর।

চলে গেল সুকুর বাবা।

সবাইকে খেতে দিয়ে রেকাবিতে যে ক-টা রুটি ছিল সুধাকে দিয়ে দিলাম। খাব না আমি। ছেলে না ফিরলে আমি আর জলস্পর্শ করব না। মন দিয়ে ফুলকপি আর বড়ি দিয়ে কইমাছটা রাঁধলাম। এইটা পেলে ছেলে একথালা ভাত খেত। মায়ের মন মিথ্যা কথা বলে না, ছেলে আজ আসবে। তাকে খেতে দিয়ে সামনে বসে দেখব চোখ ভরে।

ভাত খেয়ে সুবোধ গেল স্কুলে, আর সুকু দোকানে। নাতিটা উঠোনে খেলছে। কী ভেবে বাইরের দরজাটা খুললাম, যদি ছেলেটার কোনো হদিশ পাওয়া যায়।

ও বাবা! রাস্তায় এরা কারা? লোকে গিজগিজ করছে। দরজা খুলতে দেখে এগিয়ে এল যে সে তাঁরই বয়সি, উকিলপাড়ার দিকে থাকে, কালীবাড়িতে দেখেছি দু-একবার।

—ও দিদি, আপনাদের পাড়ায় কাল রাতে নাকি ভূত দেখা গেছে। নাতনিটা এত বায়না ধরল, তাই খোঁজ নিতে এলাম। সত্যি দিদি?

বোঝো মাগির কাণ্ড, নাতনির হাত ধরে ভূত দেখতে সকালবেলায় এত দূর চলে এসেছে, মরণ হয় না এগুলোর।

—না বাপু, আমরা ভূতটুত কিছু দেখিনি।

মুখের ওপর দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। এ তো আচ্ছা যন্ত্রণা হল, গোটা টাউন যেন ভেঙে পড়েছে তাদের রাস্তায়, যেন বিনা পয়সার সার্কাস হচ্ছে। ছেলেটা যদি এখন আসতেও চায় এই যমের অরুচি টাউনের আদেখলা লোকগুলোর জন্য পারবে না। কেউ যদি দেখে ফেলে, সুদামমুদির মরা ছেলে ফিরে এসেছে এ কথা রাষ্ট্র হতে এক মিনিটও লাগবে না, পুলিশের কানেও কথাটা চলে যাবে। মর, মর, গুষ্টিসুদ্ধু মর। মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। উঠোনের এক কোণে মাথায় হাত দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। খেয়াল হল, পাটিসাপটা করব বলে কাল রাতে চাল ভিজিয়ে রেখেছিলাম। ধুত, কিচ্ছু করব না কারুর জন্য। মায়ের জন্য ছিটেফোঁটা মায়াদয়া নেই যে সংসারে, সেই সংসারের জন্য কিচ্ছু করব না।

চান করে বড়োবউ উঠোনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে তো আঁচড়াচ্ছেই। এক ছেলের মায়ের আবার এত সাজগোজ কিসের, পিত্তি জ্বলে যায়। তবে কিছু বললে আবার চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করবে। চুপ করে রইলাম।

কতক্ষণ এভাবে বসেছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ মনে হল, কে যেন আস্তে আস্তে কড়া নাড়ছে। হৃৎপিণ্ডটা যেন গলার কাছে এসে আটকে গেছে। বউমা

ঘরে ঢুকে গেছে, উঠোনটা খালি। সোজা আমার ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেব, কেউ দেখতে পাবে না।

না, দরজায় দাঁড়িয়ে পাশের ঘরের মাস্টারনি। কী বলে, কাকে নাকি কড়া নাড়তে শুনেছে। তবে কি....?

ও না, ওর ঘরের কড়া কেউ নেড়েছে কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছে? সে বাপু আমি কী করে জানব?

একটাই ভালো, রাস্তার ভিড়টা আর এখন নেই।

কী করব তাহলে, বেরোব ছেলেটার খোঁজে? কিন্তু কোথায় খুঁজব? আর খুঁজতে বেরোব, সেই ফাঁকে যদি ছেলেটা এসে হাজির হয়। কোথায় থাকতে পারে ছেলেটা? বিশু কি কিছু খবর দিতে পারে, ও কি জানে কার বাড়িতে ছেলেটা লুকিয়ে থাকতে পারে? শত হলেও তো এক পার্টিই করে।

রাস্তায় দু-চারটে লোক আছে, সে থাক গিয়ে, অত খেয়াল করলে আজ চলবে না। যা বাবা, বিশুর দরজায় আবার তালা লাগানো। দিনের এই সময় মাঝখানে অনেকদিন তালা চোখে পড়েনি। কিছু গন্ডগোল হল? নাকি সকালবেলায় থানায় গিয়ে বিশু এখনো ফেরেনি, দেখি আস্তে আস্তে কড়াটা নেড়ে। কড়াতে হাত লাগাইওনি, পেছন থেকে এক ধমক,

—এখানে কী করছেন?

চমকে পেছনে তাকিয়ে দেখি ষণ্ডামতো একটা লোক, হাতে লাঠি। প্রথমে চিনতে পারিনি, পরক্ষণেই চিনলাম, থানার লোক—পুলিশের জামাকাপড় পরেনি বলে প্রথমে খেয়াল করতে পারিনি। কি বলব, আমতা-আমতা করে কিছু বলতে যাব, আবার ধমকে বলল,

—যান, এক্ষুনি যান এখান থেকে।

তাড়াতাড়ি বাড়িতে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। ভয়ে তখনো বুকটা ধুকধুক করছে। ও, তাহলে পুলিশ বাড়ির ওপরও নজর রাখছে। এটা তো আগে ভাবিনি। তা হলে এর জন্য তার সুরো ঘরে আসতে পারছে না। না বাবা, ছেলের আমার আসার দরকার নেই। পুলিশ ধরতে পারলে মেরে ফেলবে। বাবা আসতে হবে না তোকে, তুই এই টাউন ছেড়ে এক্ষুনি পালিয়ে যা। শুধু যদি মাকে একবার জানিয়ে দিয়ে যেতে পারিস, তা হলেই হবে। কিন্তু কে জানাবে, কী করে জানাবে? ভগবান, এই বুড়ি মা-টার প্রতি একবার সদয় হও। চোখটা আবার জলে ভরে এল।

—ও মা, বেলা হয়েছে, যান, চান করে আসুন।

বউমা বোধহয় দেখেছে যে একা উঠোনে বসে কাঁদছি। গলাটা খুব নরম। চোখ মুছে উঠে পরলাম। কাজ থেকে ফিরেছে সুকুর বাবা, সুকু। সবাইকে খেতে দিতে হল। খাব না খাব না করেও মুখে একটু তুললাম। পেট খালি থাকলে আজকাল পেটে একটা ভীষণ ব্যথা ওঠে। কাউকে কোনোদিন বলিনি, বললেই তো ডাক্তার বদ্যি ওষুধপত্র, একগাদা টাকাপয়সা খরচ। অভাবের সংসারে এত বিলাসিতা করা যায় না।

একটু পরে স্কুল থেকে ফিরল সুবোধ, আজ শনিবার হাফ ছুটি। রান্নাঘরে বাসন তুলছি ছেলে লাফাতে লাফাতে ঢুকল,

—ও মা শোনো, কাল রাতে আমাদের পাড়ায় নাকি ভয়ংকর একজন ঢুকেছে। পুলিশ ট্যাঁড়া পিটিয়ে দিয়েছে গোটা টাউনে, সন্দেহজনক কাউকে দেখলেই পুলিশের কাছে খবর দিতে হবে।

—কে বলল তোকে?

—আরে সবাই জানে। স্কুলের স্যাররাও বলছে। তাড়াতাড়ি খেতে দাও এক্ষুনি বেরোতে হবে।

—কোথায় যাবি?

—লোকটাকে খুঁজতে যাব।

—কী? তুই পুলিশের হয়ে খুঁজতে যাবি?

—তুমি পাগল নাকি! আমাদের স্কুলের দাদারা বলে দিয়েছে, সে-রকম কাউকে দেখলে উলটে তাকে খবর দিতে হবে, পুলিশ তাকে খুঁজছে।

—আচ্ছা ধর, খুঁজতে গিয়ে দেখলি তোর মেজদাই ফিরে এসেছে, কী করবি তা হলে?

—মেজদা?

ছেলেটার মুখ চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। কিন্তু পর মুহূর্তেই মুখটা কালো করে বলল,

—সে আর কী করে হবে।

—হ্যাঁ রে, ভগবানের অসাধ্য কিচ্ছু নেই। তুই বল না, মেজদা ফিরে এল কী করবি?

—কী করব? মেজদার সঙ্গে পালিয়ে যাব। তারপর বন্দুক জোগাড় করে, ঢিসুম ঢিসুম...., দুই ভাই মিলে পুলিশ মারব।

দু হাত দিয়ে বন্দুক চালানোর ভঙ্গি করছে সুবোধ। বুকটা কেঁপে উঠল। কিন্তু সত্যি কেউ যদি দুনিয়ার সব পুলিশকে মেরে ফেলে, তবে আমি সবচেয়ে খুশি হই।

এই টাউনে দুপুরে দোকানপাট সব বন্ধ থাকে। খেয়েদেয়ে সুকু আর সুকুর বাবা বিশ্রাম নিচ্ছে, বসে রইলাম উঠোনের কোণে। অন্য দিন কখনো কখনো নিজেও একটু গড়িয়ে নিই, আজ ও সব করার অবস্থায় নেই। আর ঘরে ঢুকেই বা কি করব, সেখানে কর্তামশাই, নিজের ছেলে মরেছে জেনে নিশ্চিন্তে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। এ সংসারের কারোর মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না। নেহাত সুবোধটা ছোটো তা না হলে এই সংসারের মুখে লাথি মেরে যে দিকে দু চোখ যায় সে-দিকে চলে যেতাম।

এমনিতে এই ঠান্ডায় রোদে বসে থাকতে ভালোই লাগে, কিন্তু আজ সব দিক থেকে কপাল খারাপ, দুপুরের পর থেকে মেঘ জমছে, আর ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। কষ্ট লাগছে, লাগুক গে। প্রথমে সুকু, তার পর সুকুর বাবা ঘুম থেকে উঠে দোকানের দিকে চলে গেল। বড়ো ছেলে তো উঠোনে বসে থাকা মায়ের দিকে ফিরেও তাকাল না, তার বাপ অন্তত বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে একবার ফিরে তাকাল, মনে হল কিছু বলবে, কিন্তু কিছু না বলেই বাইরের থেকে দরজাটা টেনে বেড়িয়ে গেল। যাও যাও, আমি কারোর পরোয়া করি না। আমি শুধু বেঁচে আছি ছেলেটার একটা খবর পাবার জন্য।

মেঘটা একদম কালো হয়ে এসেছে, এ রকম মেঘ তো শীতকালে দেখা যায় না। নাতিটা উঠোনে খেলছে, ঠান্ডা না লেগে যায়। আকাশ এত কালো হয়ে এসেছে, মনে হচ্ছে একদম রাত। আকাশ চিরে এমন বিদ্যুৎ চমকাল, চোখটা একদম ধাঁধিয়ে গেল। ঠান্ডা একটা বাতাস জোরে বইতে শুরু করল। বউমা ছুটে এসে নাতিটাকে ঘরে নিয়ে গেল। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি। বৃষ্টিতে তো আর বসে থাকা যায় না, বাধ্য হয়ে রান্নাঘরের সামনে চালাটার নীচে গিয়ে দাঁড়ালাম। এই দুর্যোগে ছেলেটা কোথায়, কে জানে।

সুরো কি এখনো টাউনের কোথাও আছে, না পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এতক্ষণে টাউন ছেড়ে চলে গেছে? কিন্তু যাবেই-বা কী করে? সন্ধ্যার আগে তো ট্রেন নেই। আচ্ছা, সাড়ে ছটার সময় কলকাতা যাবার ট্রেন আছে না? এখন ক-টা বাজে? ছুটে শোয়ার ঘরে ঢুকলাম, বড়ো কাঠের দেওয়াল ঘড়িতে ছ-টা বেজে দশ। ছেলেটা নির্ঘাত এই ট্রেনে কলকাতায় ফিরবে। যাব একবার স্টেশনে? যদি একবার চোখের দেখাটা দেখতে পাই। কিন্তু পুলিশ? একে অন্ধকার, তার ওপর অকালের বৃষ্টি, নির্ঘাত পুলিশ এখন রাস্তায় নেই।

ঠাকুরের আসনের নীচে খুচরো পয়সা রাখা থাকে, নাতিটা বায়না করলে ওই পয়সা দিয়ে এটা-ওটা কিনে দিতে হয়। গোনবার সময় নেই, সবটা আঁচলের খুঁটোতে বেঁধে নিলাম। বউমাকে বলে যাব? দরকার নেই, হাজার জবাবদিহি করতে হবে।

রাস্তায় নামা মাত্র হইহই করে রিকশটা একদম গায়ের ওপর এসে পড়ল। অন্ধ নাকি? আরে এ তো আমাদের নব। আর একটু হলে চাপা দিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু যাক, ভালোই হল নবকে পেয়ে, রিকশ ধরতে বটতলার মোড় পর্যন্ত হাঁটতে হবে না, এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে।

—বাবা একটু স্টেশনে নিয়ে যাবি?

—স্টেশন? তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন।

উরি বাবা রে, কী রিকশ চালাচ্ছে! ভয়ে চোখ বুজে বসে রইলাম। এত জোরে কেউ রিকশ চালায়!

## ॥ একত্রিশ ॥

বটতলার মোড় থেকে মাস্টারমশাইয়ের বাড়িটা দেখা যায় না। মাঝখানে একটা বাঁক আছে। এটা নিয়ে নব একটু ধন্দে পড়ে গেল। নতুনপল্লির ভেতরে রিকশ স্ট্যান্ড নেই। ওখানে রিকশটাকে এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলে লোকের নজরে পড়ে যাবে। একথা ঠিক, লোকটাকে যেতে হবে বটতলার মোড় দিয়েই। শ্মশানের দিক দিয়ে ঢোকা যায়, কিন্তু টাউনের লোকেরা ছাড়া ও রাস্তা কেউ চেনে না। কিন্তু মাল ধড়িবাজ, কিছু বলা যায় না। ও যে যা খুশি ভাবুক পাড়ার মুখেই গাড়ি রাখবে, মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির দরজাটা চোখের আড়াল করা যাবে না।

লোকটাকে কোনো দিন দেখেনি, কিন্তু কেন জানি তার মনে হচ্ছে ঠিক চিনতে পারবে। ঢ্যাঙা, কালো, নাক চোখ টানাটানা—কতদিন কতবার সে ভেবেছে লোকটার কথা, আর সামনে দেখে চিনতে পারবে না? কিন্তু ঝুঁকি নেওয়া যাবে না, যদি গন্ডগোল হয়ে যায়। সে ঠিক করে রেখেছে, কিচ্ছু বুঝতে দেবে না। ভালোমানুষের মতো আলাপটা জমাবে, সে যেন প্যাসেঞ্জার খুঁজছে। ভুলিয়ে ভালিয়ে শ্মশানের ওদিকে নদীর ধারে নিয়ে যাবে। আর যদি গাড়িতে তুলতে পারে, তবে তো কথাই নেই। কালীথানে কবরখানার পেছনটাতে নিয়ে যাবে। ব্যাস, খতম। আর ওসব যদি না হয়, যা হবার হবে, সামনাসামনি যা করার করে দেবে।

—এই এখানে কী?

নব চমকে উঠল। নতুনপল্লির মুখে গাড়িটা বোধহয় পাঁচ মিনিটও রাখেনি। কনস্টেবলটার নাম শিবেন না কি যেন, টাউনে নতুন এসেছে। পুলিশের পোশাক না পরে এমনি জামাকাপড় পরে আছে। না, ঘাবড়ালে চলবে না।

—স্যার, পা-টা খুব ব্যাথা করছে, তাই গাড়িটা রেখে একটু জিরোচ্ছি।

'স্যার' বললে, কনস্টেবলগুলো খুশি হয়।

—না, না এখানে কিছু করা যাবে না, যা ভাগ।

মুখে চলে এসেছিল, শালা তোর বাপের রাস্তা। 'যা ভাগ'? ওসব কিছু বলা যাবে না। গাড়িটাকে টানতে টানতে সে বটতলার দিকে চলল। এটা তো একটা উটকো ঝামেলা হল। নতুনপল্লিতে একটা সাদা ড্রেসের পুলিশ থাকবে, এটা কোনোভাবেই তার হিসাবে ছিল না। কিন্তু নতুনপল্লিতে সাদা পোশাকের পুলিশ কেন?

কেন পুলিশ, সেটা জানা গেল বটতলার স্ট্যান্ডে। পুলিশ নাকি খবর পেয়েছে, নতুনপল্লিতে আটকে রেখেছে যে ছেলেটাকে সেই ছেলেটার পার্টির লোক নাকি কাল রাতে টাউনে ঢুকেছে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে চলে যাবে বলে। তার রিকশয় সেই লোকই এসেছে। স্ট্যান্ড সেই খবর নিয়ে একদম গরম। এতে একটাই লাভ, তার কাছে আর কেউ ভূতের গল্প শুনতে আসছে না। যে পার্টির লোক এসেছে, তারা নাকি একদম খতরনাক। পুলিশের সাথে খুব ঝামেলা হবে, পুলিশ নাকি তৈরি হচ্ছে। কে একটা বলে উঠল—প্যাঁদা, শালা পুলিশকে প্যাঁদা, শুয়োরের বাচ্চাদের খুব বাড় হয়েছে। কেউ একটা প্যাঁদাতে শুরু করলে, অনেক লোক পুলিশ প্যাঁদাতে জুটে যাবে। এক কোণে বসে সে মনে মনে হাসল, এ টাউনে সে ছাড়া আর কেউ জানে না, আসলে কে এসেছে। নে সবাই ছুটে বেড়া অন্যদিকে।

কিন্তু পুলিশটা থাকায় নজর রাখাটা একটু কঠিন হয়ে গেল। অবশ্য পুলিশটা থাকায় সেই লোকও চট করে কিছু করতে পারবে না। তবে পুলিশকে হাত করতে আর কী লাগে? পাঁচটা টাকা পকেটে গুঁজে দিলে মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির দরজা কী, নিজের বাড়ির দরজাও খুলে দেবে। সে মাঝে মাঝে উঠে নতুনপল্লির মোড় পর্যন্ত ঘুরে আসছে। নতুন কিছু নেই, তবে পুলিশটাও নড়ছে না।

সে বটতলা থেকেই ছাতু কিনে খেল, ঘরে গেল না, কোনো প্যাসেঞ্জারও নিল না। চম্পা নিশ্চয়ই চিন্তা করছে। একটাই ভয় তাকে খুঁজতে আবার চম্পা এতদূর চলে না আসে।

ছাতু কেনার সময় কে একটা বলল, নতুনপল্লির দিদিমণি তাকে খুঁজছে, খুব নাকি দরকার। তাকে আবার দিদিমণির কী দরকার? যাক, অন্তত পাড়ার ভেতরে একবার ঢোকা হবে, আর একবার ভালো করে দেখে আসা যাবে।

এ দিদিমণির মাথাটা গেছে। কি সব হাবিজাবি প্রশ্ন। কাল রাতে তার সওয়ারি যে ছিল, সে কেমন, সরু গোঁফ আছে নাকি, সিগারেট খাচ্ছিল নাকি। মনে হয় দিদিমণির কাছে কারুর আসবার কথা ছিল। সে আর কী করে বলে, আপনার লোক আসেনি, যে এসেছে তাকে কেবল এই বান্দা চেনে। আবার বটতলার মোড়।

সকালে তাও রোদটা ছিল, কিন্তু বেলা যত বাড়ছে, আকাশে মেঘ জমছে, ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। এভাবে বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু যত কষ্টই হোক, তাকে বসে থাকতেই হবে। সে জানে, সময় এগিয়ে আসছে। লোকটা নিশ্চয়ই সন্ধ্যার কলকাতার ট্রেনটা ধরার চেষ্টা করবে, আসবে তার আগেই। বুদ্ধি করে আসবে অন্ধকারটা নামার মুখে, কেউ যাতে তাকে দেখতে না পায়।

অন্ধকার করে মেঘ জমেছে। নতুনপল্লির রাস্তায় কোনো লোক নেই। ফোঁটা ফোঁটা করে বৃষ্টি নামল। তার গাড়ি বটগাছটার নীচে, তার বৃষ্টি লাগছে না, কিন্তু বৃষ্টিটা বাড়লে মুশকিল, শীতকাল বলে ছাতা নিয়ে বেরোয়নি। নতুনপল্লি থেকে লক্ষ্মীর রিকশ করে একটা সুটকেসে নিয়ে বেরোল দিদিমণি। সুটকেস মানে, কলকাতার ট্রেন ধরতে যাচ্ছে। তারও সময় চলে আসছে। কিন্তু চুতিয়া পুলিশটা। নতুনপল্লির ভেতরে মাথা ঢাকার কোনো জায়গা নেই, পুলিশটা কি বৃষ্টির মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকবে? এটা যেই ভাবা, নতুনপল্লির ভেতর থেকে পুলিশটা বেরিয়ে এল। গোটা আকাশটাকে জুড়ে বিদ্যুৎ চমকাল। পুলিশটা এসে দাঁড়াল বটগাছের নীচে। সে যেখানটায় আছে, এই ঝুপসি অন্ধকারে তাকে দেখতে পাবে না। কিন্তু ক্যালানের মতো পুলিশটা বটতলায় দাঁড়িয়ে থাকলে সে কী করে ভেতরে ঢুকবে? আর রাস্তা ফাঁকা, তার মতো লোকটাও যদি পুলিশটার দিকে নজর রেখে থাকে তবে তো এই সুযোগেই মাল তুলে পালাবে। দাঁড়িয়ে থাক শালা, সে নতুনপল্লিতে ঢুকে যাবে। আবার ভয়ও লাগছে, আসল কাজ করার আগেই পুলিশের নজরে পড়ে যাবে।

কতক্ষণ তার খেয়াল নেই, হঠাৎ বৃষ্টিটা একটু চেপে আসল, আর পুলিশটা মাথার ওপর হাত চাপা দিয়ে উলটোদিকে ছুটল, বোধহয় থানায় যাচ্ছে। সে রিকশাটা টেনে এক লাফে সিটে উঠে প্যাড্‌লে পা রাখল। বৃষ্টির জলটা কী ঠান্ডা রে বাবা!

কাকপক্ষীও নতুন পল্লির রাস্তায় নেই। রাস্তায় আলো জ্বলছে, কাজেই মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির দরজাটা সে পরিষ্কার দেখতে পারছে। একই রকম শিকলি টানা, শিকলির মুখে ছোটো একটা তালা ঝুলছে। শুধু বৃষ্টির জলে সকালের পায়ের ছাপগুলো ধুয়ে গেছে। কেউ তাকে দেখার নেই, সে রোয়াকের ওপর উঠে এল। শিকলটাকে ধরে একবার টানল, আর তাকে অবাক করে গোটা শিকলটা তালা-সুদ্ধ তার হাতে উঠে এল।

হে ভগবান, এ কী হল? শেকলটাকে আগেই কেউ ভেঙে, কাজ সেরে, লোকের চোখে ধোঁকা দেবার জন্য আলগা করে লাগিয়ে রেখেছিল, না কি পুরোনো লোহা সে টানতেই ভেঙে হাতে উঠে এল? ঘরের ভেতরে ঢুকলেই

বোঝা যাবে। কিন্তু এই ঘরে সে ঢুকবে? ভেতরে গিয়ে কী দেখবে? যদি দেখে মাস্টারমশাই বসে আছে? ভয়ে সে মনে মনে রামনাম করতে শুরু করল। কিন্তু কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে, লোকের চোখে পড়ে যাবে তো।

নিশ্বাস বন্ধ করে দরজাটায় ধাক্কা দিল, একটা অদ্ভুত আওয়াজ করে দরজাটা খুলে গেল। সে চোখটা বন্ধ করে রেখেছিল। এবার আস্তে আস্তে চোখটা খুলল। ঘরের ভেতরটায় ঘুটঘুটে অন্ধকার, বাইরের থেকে কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। পকেট থেকে দেশলাইটা বের করে সে জ্বালানোর চেষ্টা করল। বৃষ্টির হাওয়ায় দেশলাইটা জ্বালানোই যাচ্ছে না। যা থাকে কপালে, সে ঘরের ভেতরে ঢুকল, দেশলাইটা জ্বালাল। একটা দমকা হাওয়ায় তার পেছনে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল, আর সেই হাওয়াতেই নিভে গেল দেশলাইটা। অন্ধকারে সে একা।

কী করে ওই ঘর থেকে বেরিয়েছিল, নিজেই জানে না। ঘরের ভেতরটা অন্ধকারে কিছু দেখতে পায়নি, কিন্তু সে নিশ্চিত. যাকে খুঁজছে সে তার আগেই স্টেশনের দিকে রওনা হয়ে গেছে। যদিও ঠিক সময় কখনো ওই ট্রেন আসে না। কিন্তু তার পোড়া কপালে আজ যদি ঠিক সময়ে চলে আসে তবে দেরি হয়ে গেছে।

রিকশটা সে ঘোরাল প্রায় চোখ বুজে. আর প্যাড্‌লটা মারতেই বুড়িটা তার সামনে এসে পড়ল। গায়ের জোরে ব্রেকটা মারতেই গাড়িটা বোঁ করে ঘুরে গেল অনেকটা। মুখে যে খিস্তিটা চলে এসেছিল, সেটা কষ্ট করে মুখেই আটকাল। একবার দেখেই সে চিনেছে সুদাম মুদির গিন্নি। চম্পা এই বাড়িতে কিছু দিন ঠিকে কাজ করেছিল, তাই তাকেও বুড়ি চেনে। তাকে অবাক করে জিজ্ঞাসা করল,

—বাবা একটু স্টেশনে নিয়ে যাবি?

এই বুড়ি, এই দুর্যোগে, একা একা কী করতে স্টেশনে যাচ্ছে? কিন্তু এখন তার গাড়িতে তোলা মানেই ঝামেলা। কিন্তু যাব না বললে আবার হাজার কথা বলতে হবে, দেরি হয়ে যাবে। নব বলল,

—স্টেশন? তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন।

বুড়ি রোগা পটকা ওজন নেই। যত খুশি জোরে গাড়ি টানা যাবে। একটাই ভয় পড়েটড়ে না যায়।

—শক্ত করে ধরে বসেন মাসিমা, গাড়ি জোরে ছুটবে।

—হ্যাঁ বাবা, খুব জোরে চালা, আমারও খুব তাড়া আছে।

## ॥ বত্রিশ ॥

—কাকে খুঁজছেন?

মিলির সঙ্গো এই প্রথম কথা হচ্ছে। তাদের ওদিককার মেয়েরা প্রথম আলাপেই এরকম সরাসরি প্রশ্ন করে না। এদিকের মেয়েরাই এ রকম, নাকি মিলিই এ রকম? মিলিকে এভাবে দেখে সে খুশিই হয়েছে। এই সময়ে মিলির সঙ্গো দেখা হবে, ভাবতেই পারেনি।

কি উত্তর দেবে? মিলি তার সম্পর্কে কতটা জানে, সব কথা সে কি বোঝাতে পারবে? কারণ যতই ভালো লাগুক, মিলিকে নিয়ে পড়ে থাকলে তো চলবে না, তার এখন অনেক কাজ।

—আসলে আমি কাকে খুঁজছি, এটা আপনাকে বোঝানো খুব কঠিন।

—বুঝেছি, আমাকে বিশ্বাস করে সব কথা বলতে পারছেন না। অবশ্য আপনার জায়গায় থাকলে আমিও হয়তো তাই-ই করতাম।

এই রে মেয়েটা তার উত্তরে কষ্ট পেল। না, মিলিকে দুঃখ দিতে পারবে না সে মরে গেলেও।

—না না, আমি তা বলিনি। আপনাকে আমি সব কথা বলতে পারি। আসলে আমার সমস্যাটা কী, সেটা না বললে, আপনাকে বোঝানো মুশকিল।

--তা হলে বোঝান সেটা।

এই খেয়েছে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে লম্বা গল্প বলতে গেলে সমস্যা। পুলিশটা নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও আছে।

—আমি সত্যি কথা বলছি, এভাবে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি কথা বলতে পারব না। এক্ষুনি আমাকে এই জায়গায় ছেড়ে চলে যেতে হবে।

--চলুন তা হলে।

মানে? মেয়েটা তার সঙ্গো যেতে চাইছে? কী ঝামেলা! সত্যি, আগে অন্য সময় এভাবে বলেনি কেন? যেভাবে হোক, কাটাতে হবে।

—আচ্ছা আপনি কী করছেন এখানে, এই ঠান্ডায় বৃষ্টিতে একা, একটা ছাতা পর্যন্ত আনেননি?

—এই তো এতক্ষণে পুরুষ মানুষের মতো একটা কথা বলেছেন। আপনি বেরোলে ঠিক আছে, আর আমি 'অবলা' মেয়ে, আমি কেন বেরিয়েছি।

ও বাবা, এ মেয়ের সঙ্গে তো সাবধানে কথা বলতে হবে।

—তা না, আপনি আমাকে যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেটাই আপনাকে করেছি, কোথায় যাচ্ছেন।

—আমিও একজনকে খুঁজছি।

—কাকে?

অদ্ভুতভাবে হেসে মেয়েটা বলল,

—হতে পারে আপনি যাকে খুঁজছেন, তাকে আমিও খুঁজছি।

এই হল মেয়েদের নিয়ে বিপদ, এত হেঁয়ালি করে। কী বলতে চাইছে মিলি? এটা ঠিক, কাল রাতে যে এসেছে, সে তো আর একা কাজটা করবে বলে আসেনি। নিশ্চয়ই খোঁজখবর নিয়েই একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করে এসেছে। মিলি কি পার্টির...

—ঠিক করে বলুন তো কী বলতে চাইছেন?

—এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে আপনার বিপদ হবে। ডান দিকে বটতলা, ওখানে অনেক লোকজন, ধরা পড়ে যাবেন। আমার সঙ্গে নদীর দিকে আসুন।

মিলি নদীর দিকে হাঁটা দিল।

নদীর উঁচু পাড়টায় হাওয়া আরো জোরে দিচ্ছে। জামাকাপড় অনেকটাই ভিজে গেছে, ঠান্ডায় একদম ভেতর থেকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

—দাঁড়ান, কথা আছে আপনার সঙ্গে। আমি যাকে খুঁজছি, আপনিও তাকে খুঁজছেন। আপনি কাকে খুঁজছেন?

—একজন ম্যাজিশিয়ানকে।

—প্লিজ হেঁয়ালি না করে বলবেন, কে সে?

—তার আগে বলুন, আপনি কাকে খুঁজছেন?

—কাউকে বলবেন না প্লিজ। আমার পার্টির কেউ একজন এসেছে এই টাউনে, আমাকে এই জেলখানা থেকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে।

—শুধু আপনাকে মুক্ত করতে?

পাল্টা প্রশ্নটা এমন অদ্ভুত, কী উত্তর দেবে, ভেবে পেল না বিশু।

—আমি যার জন্য অপেক্ষা করছি, সে কোনো একজনকে মুক্ত করতে

আসেনি। আপনি তো অল্প দিন হল এখানে এসেছেন, হয়তো বোঝেননি। এই টাউনটা তার সব কিছু নিয়ে, তার সময়, তার লোকজন, তার ভূত ভবিষ্যৎ সব কিছু নিয়ে বহুদিন হল আটকে আছে। কাল রাতে কেউ একজন এসেছে, যে এই গোটা টাউনটাকে এবার মুক্তি দেবে।

কী বলবে ভেবে না পেয়ে বিশু চুপ। মিলি এবার বলল,

—বলুন না, এ রকম হয় না?

—জানি না।

—ও. আপনিও জানেন না।

—কাল রাতে এ রকম কেউ একজন এসেছে, সেটা আপনি কি করে জানলেন?

—একদিন-না-একদিন তো কাউকে ভাঙতেই হবে এই জেলখানা। বলুন, সময়কে এভাবে চিরকালের মতো আটকে রাখা যায়?

—কিন্তু তা যে আজকেই হবে, আপনি জানলেন কী করে?

—আমি জানি।

—আপনি খুব রবীন্দ্রনাথ পড়েন।

—এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এলেন কোত্থেকে?

মিলি যেন বিরক্ত।

—আপনি রক্তকরবীর নন্দিনীর মতো কথা বলছেন।

—এবার মিলি হাসল,

—আপনার নামই তো বিশু, আপনি তা হলে বিশুপাগলের মতো গান গাইতে গাইতে আমার সাথে চলুন।

এবার বিশুর হাসার পালা,

—সত্যি তো, আপনি আমাকে ভালো কথা মনে করিয়েছেন। কিন্তু আমি যে গান গাইতে পারি না। আহা, আমিও যদি আপনাকে শোনাতে পারতাম,

*'তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ,*

*ওগো ঘুমভাঙানিয়া'।*

—চেষ্টা করুন, পারবেন।

—ঠিক আছে আমি চেষ্টা করব, কিন্তু আপনি এখন বাড়ি যান। এই বৃষ্টিতে ভিজে ঠান্ডা লাগাবেন।

—আমি জানি, আমার কথা আপনি বিশ্বাস করছেন না। তাতে আমার অবশ্য কিছু যায় আসে না। শুধু আপনাকে জানিয়ে রাখি, বাড়িতে ফিরে যাবার জন্য আমি বেরোইনি। যে এসেছে, তাকে আমায় খুঁজে বার করতেই হবে।

—খুঁজবেন যাকে, সে কোথায়?

—সে তো ম্যাজিশিয়ান, যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে।

—তা হলে তাকে খুঁজবেন কোথায়, আপনি বরং বাড়িতে তার জন্য অপেক্ষা করুন। সময় মতো সে আপনাকে ডেকে নেবে।

—সে কাউকে ডাকে না।

—তা হলে কোথায় খুঁজবেন তাকে?

সামনের অন্ধকারের দিকে হাত বাড়িয়ে মিলি বলল,

—ওইখানে, ওই মাঠে, ওই তেপান্তরের মাঠে।

—এই দুর্যোগে, ওই মাঠে? আপনি পাগল হয়েছেন? ওখানে কিচ্ছু নেই।

—আপনি জানেন না, ওই মাঠের ওপারে একটা অন্য পৃথিবী আছে। একটা আলোর সমুদ্র আছে। আর দুই পৃথিবীর মাঝখানে ধোঁয়াধোঁয়া পাহাড়ের নীচে আছে সাঁওতালদের গ্রাম। আপনিও চেষ্টা করলে শুনতে পারবেন, ওরা গান গাইছে আর নাচছে।

—আপনি সত্যিই শুনতে পাচ্ছেন?

—চোখ বুজে নিজের বুকে হাত রেখে নিজের মনের কাছাকাছি যান। আপনিও শুনতে পারবেন। অন্য দিন ওরা ভালোবাসার গান গায়, ফসলের জন্য গান গায়, মেঠো ইঁদুরের জন্য গান গায়। আজ অন্য গান গাইছে, যুদ্ধের গান গাইছে, প্রতিহিংসার গান গাইছে। ওরাও আজ খবর পেয়েছে।

মিলির গলাটা বয়সের তুলনায় অনেক ভারী। কেমন একটা নেশা জড়ানো গলায় মিলি বলে যাচ্ছে। শুনতে শুনতে তারও যেন নেশা হচ্ছে, ভালো লাগছে শুনতে। কিন্তু মিলি যা শুনতে পাচ্ছে, তা তো সে শুনতে পাচ্ছে না। বিদ্যুৎ চমকাল, আর সঙ্গে সঙ্গে মিলি চেঁচিয়ে উঠল,

—দেখুন দেখুন বিশুবাবু, সে আসছে।

কই সে তো কিছু দেখতে পেল না।

—এবার, এবারই শুরু হবে। যা হবে তা ভয়ংকর, যা হবে তা সুন্দর।

—কী হবে এবার?

—গুহার ভেতর থেকে চাবুক মারতে মারতে সে সময়কে বার করে এনে ফেলবে ওই তেপান্তরে, মাঠে ; তারপর শুরু হবে যুদ্ধ। আকাশ থেকে নেমে আসবে আগুন। তারপর এক সময় সে সময়ের পাগলা ঘোড়ার মুখে লাগাম পরিয়ে দিয়ে চেপে বসবে তার পিঠে। ব্যাস।

—ব্যাস?

—ভাসিয়া মাদ্রিদের পাহাড়ের ঢালে জলপাই ঝোপের ওপর দিয়ে উড়বে হলুদ প্রজাপতি। জানেন রোজ রাতে মাসিমা কাঁদেন, সুরো ফিরে এসে বলবে—আর কাঁদিস না, এই তো আমি ফিরে এসেছি। তারপরই তো আসল ম্যাজিক শুরু হবে। পৃথিবীর রং, গন্ধ, স্বাদ, সব কিছু পাল্টে যাবে।

—আপনি সত্যি বিশ্বাস করেন, সময়ের মুখে লাগাম পরিয়ে দেওয়া যায়?

—আপনি জেলখানা থেকে মুক্তি চাইছেন, আর এই বিশ্বাসটুকুও নেই আপনার? আপনাকে কেউ বলেনি, আপনার আসল জেলখানা যে ঘরটা থেকে পালিয়েছেন সেটা নয়, আসল জেলখানা এই টাউনটা। এখান থেকে কেউ পালাতে পারে না, সময়ের গরাদে আমরা সবাই আটকে আছি। সময়কে হারিয়ে দিতে না পারলে ও আপনাকে চিরকাল এই টাউনে আটকে রেখে দেবে। চলুন বিশুবাবু, আপনার পালানোর একমাত্র সুযোগ আজ।

—আচ্ছা, আমার না হয় পালানো দরকার, কিন্তু আপনি কেন চলে যেতে চাইছেন? আপনার তো এখানে সব আছে?

—কী সব আছে?

—সব নেই? অন্যরা হিংসে করবে এ রকম বাবা-মা। আর সুন্দর দেখতে যে ভদ্রলোক আপনার কাছে আসেন। যদি কিছু মনে না করেন বলি, আপনাদের দুজনকে চমৎকার মানাবে।

—এই বিষয় নিয়ে আলোচনার সময় এখন আমার নেই। এই সব কিছুই এখন আমার কাছে অতীত।

—এত সহজে এত বড়ো কথা বলবেন না, প্লিজ।

—এই যুদ্ধ শুরু করার আগে আমাকে একটা যুদ্ধে জিততে হয়েছে। আপনি ভুলে গেছেন বোধ হয়, এই জেলখানা পর্যন্ত আসতে যে-রাস্তায় আপনাকে হাঁটতে হয়েছে, সে-রাস্তায় যেতে গেলেও একটা যুদ্ধে আগে জিততে হয়।

—আরে আমাদের কথা ছাড়ুন। উদ্বাস্তু পরিবারে আধপেটা খেয়ে থাকা ছেলে আমি, লড়াই করেই আমাদের বাঁচতে হয়, লড়াই আমাদের রক্তে। আপনার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন সে ভদ্রলোক, একদিন বেনারসি আর সোনা জহরতে মুড়ে আপনাকে নিয়ে যাবেন। অবসর সময়ে আপনি সুঁচ-সুতো দিয়ে ফ্রেমে 'পতি পরম গুরু' লিখবেন। আর আমার জন্য যে মেয়েটা বসে আছে, সারাদিনে পাঁচটা বাচ্চা পড়িয়ে সংসার চালায়। আপনাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা?

কথাটা বলে ফেলেই মনে হল, ঠিক হল না, এতটা কড়া কথা বলা। মিলি চুপ। তারপর গলাটাকে নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল,

—এত অহংকার! তবে বিশুবাবু জেনে রাখুন, লড়াই কেবল রক্তে থাকে না। আসল লড়াই থাকে ভাবনায়। ভাবনায় লড়াই না থাকলে শুধু রক্ত দিয়ে কিচ্ছু হয় না। বোঝা গেল, আপনাকে বুঝিয়ে কোনো লাভ নেই। আপনি থাকুন আপনার রক্তের অহংকার নিয়ে।

—সরি, আমার কথায় রাগ করবেন না। সত্যি আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না, আমাকে বুঝিয়ে দিন।

—ওহ্, বোঝানোর মতো সময় নেই। শুনুন, আমাদের ইতিহাস যিনি পড়ান তিনিই আমাকে বুঝিয়েছেন, আজ দাঁড়িয়ে আমরা কেউ জানি না কালকে কী হবে। কালটা আমাদের কাছে সময়ের জুয়াখেলা, দানে জোড়ও উঠতে পারে, বেজোড়ও উঠতে পারে। আমি এত অসহায়, আপনি এত অসহায়, মানুষ এত অসহায়! কাল কি হবে তা যদি আমি ঠিক করতে না পারি, তবে আমরা কীসের স্বাধীন, কীসের মুক্ত। আমার চোখ বন্ধ করে সময় আমাকে তার ইচ্ছে মতো নিয়ে যাবে, তা চিরকাল চলতে পারে না। সময়কে আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে হবে।

—মিলি প্লিজ দাঁড়ান, আমি এবার আপনার কথা ধরতে পারছি। ঠিক, ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস, ইউটোপিয়ান অ্যান্ড সায়েন্টিফিক কমিউনিজম।

—এবার আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কি বলছেন।

—এঙ্গেলসের লেখা থেকে বলছেন তো?

—আমি ওনার কোনো লেখা পড়িনি।

—তাই? দাঁড়ান আপনাকে বলি। এঙ্গেলস বলেছেন, যখন শোষণহীন সমাজ তৈরি হবে, যখন শোষণের পাহারাদার রাষ্ট্রটা শুকিয়ে মরবে, মানুষ নিয়ন্ত্রণ করবে প্রকৃতির শক্তিগুলোকে। মানুষ আর তখন ইতিহাসের অচেতন উপাদান হিসাবে থাকবে না, সে সচেতনভাবে নিজের ইতিহাসকে তৈরি করবে। ভারি চমৎকারভাবে এঙ্গেলস লিখেছিলেন, এ হল আবশ্যিকতার রাজ্য থেকে স্বাধীনতার রাজ্যে মানুষের উত্তরণ।

—তা হলে অপেক্ষা করছেন কেন, চলুন আমার সঙ্গে, আপনাদের নেতাই তো বলেছেন।

—আপনি বুঝছেন না, সে পরিবর্তন এ রকম এক রাতে আসে না।

—শুরু তো হয় কোনো এক রাতে।

—না না, তার অনেক প্রস্তুতি এবং সে প্রস্তুতি লাগে দুনিয়া জোড়া।

—দুনিয়ার কোনো একটা জায়গা থেকে তো তা শুরু হয়।

—উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

—বাঃ, সময়কে আপনি ক্রীতদাস করতে চান, আর সময় আপনাকে সুযোগ করে দেবে। আপনাদের বলিহারি। যাক ও সব, আপনাকে শেষবারের মতো জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি আসবেন আমার সঙ্গে?

—আপনি কী পাগলামো করছেন! ব্যাপারটা এভাবে হয় না। তার অনেক প্রস্তুতি আছে, মানুষকে সংগঠিত করতে হয়, সচেতন করতে হয়। পরিবর্তনের জন্য পার্টি লাগে। আমাদের পার্টি তো এই কাজটাই করতে চাইছে, আপনি আসুন আমাদের পার্টিতে।

—আমি কোনো পার্টিকে চিনি না, আপনার পার্টিকেও চিনি না। আমার মুক্তি আমার, আর কেউ তা চাইছে কি না, তা আমার জানার দরকার নেই।

—কিন্তু আপনি তো একা মুক্তি পাবেন না।

—কে বলল আমি একা? আমি তো আপনার মত 'উপযুক্ত সময়'-এর দোহাই দিয়ে, যে জেলখানা ভাঙা যায় সেই জেলখানায় চিরকাল আটকে থাকতে চাই না। আমি তো সবাইকে ডাকতে বেড়িয়েছি। আমার কপাল খারাপ আপনাকেই প্রথম বললাম, আর আপনিই রাজি হচ্ছেন না। তবে সবাই আপনার মতো নয়। আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু আমি তো সাঁওতালদের গান শুনতে পাচ্ছি। আপনি টের পাচ্ছেন না পায়ের তলার মাটি কাঁপছে।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে গেল মিলি। তারপর জিজ্ঞাসা করল,

—আপনি তা হলে আমার সঙ্গে আসছেন না?

—না, পার্টির নির্দেশ ছাড়া আমি কিছু করব না।

—ও, আপনার ভেতর থেকে কোনো নির্দেশ আসে না, সবটাই বাইরের থেকে কেউ বলে দেয়। আর তাই বোধহয় আপনি শুনতে পাচ্ছেন না, ঘণ্টা বাজছে। এতদিন বন্ধ থাকার পর টাউনের বড়ো ঘড়িটা চলতে শুরু করছে।

বিশু কান পেতে শোনবার চেষ্টা করল কিন্তু সামনের নদীর আওয়াজ ছাড়া কিছুই সে শুনতে পেল না। এই অসময়ের বৃষ্টিতে নদীটা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। এই অন্ধকারেই সে ছুটে চলা জলের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে।

—আপনার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে বিশুবাবু। আজকের পর থেকে আপনি বেঁচে থাকবেন, কিন্তু প্রাণ থাকবে না। আমি আমার বাবাকে দেখেছি, কী কষ্ট! যে সময় ডাক এসেছিল, সাড়া দিতে পারেননি। আর আপনিও পারলেন না।

শেষ কথাটা বলতে বলতে মিলির গলার স্বরটা মিলিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে

কিছু দেখতে না পেলেও বোঝা যাচ্ছে, মিলি নেমে যাচ্ছে নদীর দিকে। জলের শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই। সে আস্তে আস্তে ডাকল,

—মিলি, মিলি, আপনি কোথায়?

কোনো উত্তর নেই। এবার সে গলা তুলেই ডাকল, আর তার উৎকণ্ঠার অবসান ঘটাতে বিদ্যুৎ চমকাল। সে আলোতেই দেখল, নদীর পারে সে একাই দাঁড়িয়ে, মিলি নেই!

এভাবে কতক্ষণ দাড়িয়ে ছিল তার খেয়াল নেই। অবশেষে একটা সময়ে মনে হল, এভাবে একা দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজে কোনো লাভ নেই, ভীষণ ঠান্ডা লাগছে। তার থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে যাই ঘরে। পবন ফিরে আসার আগে ঘরে ঢুকে যেতে হবে, হাবভাব করতে হবে যেন মাঝখানে কিছুই হয়নি, সে আগের মতো 'গুডবয়'ই আছে।

## ॥ তেত্রিশ ॥

সব দিক থেকেই আজ তার কপাল খারাপ। বৃষ্টিটা এমনভাবে হচ্ছে যে গাড়িতে স্পিড তুলতে ভয় লাগছে। জোরে বৃষ্টি হলে কোনো অসুবিধা নেই, ঝামেলা শালা এই রকম বৃষ্টিতেই। রাস্তাটা এমন কাদাকাদা হয়ে আছে, জোরে চালালেই চাকা পিছলে যেতে পারে। আজ সে অন্য কিছুর পরোয়া করে না, কিন্তু তার সওয়ারি সুদামমুদির গিন্নি। পড়ে গিয়ে বুড়ির হাত-পা ভাঙলে কেলেঙ্কারি। আর এখন অ্যাকসিডেন্ট হলে সে ছুটে গিয়েও কাউকে ধরতে পারবে না। হে ভগবান, ট্রেনটা যেন রোজকার মতো লেট করে। একটাই সুবিধা, এই ঠান্ডায় অকালের বৃষ্টিতে গোটা টাউন ঘরে সিঁধিয়ে গেছে, রাস্তা বিলকুল খালি।

স্টেশন রোড থেকে প্ল্যাটফর্মে ওঠার সিঁড়িতে ওঠবার গলির মুখ থেকে স্টেশনটা পুরোপুরি দেখা যায়। সামনের দিকে তাকিয়ে তার বুকটা ধক করে উঠল, ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে। ভগবান, গরিবের কথা শুনলে না? সিঁড়ির গোড়ায় গাড়িটাকে দাঁড় করিয়েই সে খাড়া সিঁড়িটা বেয়ে ছুটল। সওয়ারির ভাড়া নেবার সময় তার নেই। ট্রেনটা এখানে পাঁচ ছ মিনিট দাঁড়াবে, কামরা তো মোটে ছ-টা, ঠিক ধরে ফেলা যাবে। ছুটতে ছুটতেই নব পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে, কানপুরিটা এখনই বার করে নিতে হবে, একদম সময় নেই, আসল সময় যদি পকেটে আটকে ফাটকে যায়। কিন্তু সামনের দিকে তাকিয়ে সে সঙ্গে সঙ্গে হাত পকেটে থেকে বার করে নিয়েছে। সিঁড়িটার ঠিক মুখে আলোর নীচে ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে নীরেনদারোগা, আর চার পাঁচটা পুলিশ এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এই লোকটাকে নব যমের মতো ভয় করে, সে একা না, তাদের লাইনের সকলেই। কিন্তু আজ তো তার ভয় পেলে চলবে না। আর ভয় করবারই-বা কি আছে, সে এখনো পর্যন্ত কিছু করেনি।

হাঁফাতে হাঁফাতে ট্রেনটার সামনে এসে দাঁড়াল। কিন্তু কোথায় খুঁজবে? তার এটা হিসেবেই ছিল না। গোটা ট্রেনের মাত্র দুটো কামরায় আলো জ্বলছে, বাকি গোটা ট্রেনটা অন্ধকার। তবে নানা ভয়ে লোক অন্ধকার কামরায় উঠতে চায় না। আর সে যাকে খুঁজছে তার সঙ্গে তো দামি জিনিস আছে, মরে গেলেও সে অন্ধকার কামরায় উঠবে না। শেষের আগের কামরাটায় আলো আছে, সে ছুটল ওদিকেই। পুলিশরা যেখানে দাঁড়িয়ে, কামরাটা তার থেকে দূরে, আর ওখানে প্ল্যাটফর্মটা অন্ধকার। ঠান্ডার জন্য সব ক-টা জানালা ভেতর থেকে বন্ধ করা। সে লাফিয়ে উঠল কামরাটায়। কামরাটায় খুব বেশি লোকজন নেই। কামরায় আলো আছে, তাতেও হাতে গোনা কয়েকটা লোক। নব পাগলের মতো খুঁজছে, এক খোপ থেকে আর এক খোপ। না নেই, ঢ্যাঙা কালো টানাটানা চোখ-নাক, এ রকম কেউ নেই।

এবার সামনে ইঞ্জিনের পরের পরের কামরাটা। প্ল্যাটফর্মে দুটো আলোই জ্বলে, একটা সিঁড়ির মুখে, আর একটা দক্ষিণের দিকে, আলো-জ্বলা কামরাটার একটু আগে। দৌড়োতে গিয়ে মনে হল, পুলিশের সামনে দৌড়োনোটা ঠিক হবে না। সে তাড়াতাড়ি পা চালাল সামনের দিকে। দু পাও এগোয়নি, তাকে চমকে দিয়ে সিগনালের লাল আলোটা সবুজ হয়ে গেল। তার মানে, সে যা ভেবেছে ট্রেনটা তার আগেই স্টেশনে ঢুকে গেছে। পুলিশের তোয়াক্কা না করেই নব ছুট লাগাল। পেছনের কামরায় নেই মানে, সামনের কামরায় আছেই। এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে, দু-একটা জানালা খোলা আছে। হয় চা খাবার জন্য খুলেছিল, কিংবা জানালা ভাঙা, বন্ধই হয় না। চলতে শুরু করলে কামরায় ওঠা ঠিক হবে না, জানালা দিয়েই ভেতরটা ভালো করে দেখতে হবে। আর চোখে পড়লেই রানিং ট্রেনে উঠে যাবে। ট্রেনেই যা করবার করে চেন টেনে অন্ধকারে নেমে যাবে। পুলিশ আছে, এখানেই বরং কিছু করা অসুবিধে।

কামরাটার কাছে সে যখন পৌঁছোল তখনো ট্রেনটা ছাড়েনি। দৌড়োতে দৌড়োতেই নবর চোখে পড়ল প্ল্যাটফর্মের আলোর নীচে দাঁড়িয়ে নিবেদিতা স্কুলের বাংলার দিদিমণি। ঠিকই তো, খানিক্ষণ আগে দিদিমণি নতুনপল্লির থেকে বেরিয়েছে। কিন্তু মাথায় গন্ডগোল নাকি, বৃষ্টির মধ্যে হাতে সুটকেস নিয়ে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে? ট্রেন তো ছেড়ে দেবে? যাক মরুক গে দিদিমণি, তার নিজের কাজ আগে করতে হবে। প্রথম জানালাটায় নেই। এই কামরায় লোক আগেরটা থেকে অনেক বেশি, খুঁজতে সময় লাগছে। কিন্তু ট্রেনটা নড়তে শুরু করেছে। আর তখনই দিদিমণি এগিয়ে গেল ট্রেনের দরজাটার দিকে। আরে কী

কাণ্ড, ট্রেনে উঠে পড়ল, কিন্তু সুটকেসটাকে না নিয়ে। তার চোখের সামনে ঠিক আগের অন্ধকার কামরাটা দিদিমণিকে যেন গিলে নিল, আর সুটকেসটা রয়ে গেল প্ল্যাটফর্মে। ওই অবস্থাতেও নব চ্যাঁচাল, 'ও দিদিমণি, সুটকেস নিলেন না তো।'

কথাটা কানে গেল বলে মনে হল না। সোজা ঢুকে গেল যেন ঘোর লাগা কোনো মানুষ।

দু নম্বর জানালাটা দিয়ে নব পাগলের মতো ভেতরটা তন্নতন্ন করে দেখছে। ট্রেনের সাথে পাল্লা দিয়ে নব জানালার শিক ধরে ছুটছে। না নেই এখানেও। তিন নম্বর জানালা। উলটোদিকের জানালার পাশে বসা লোকটা অনেকটা ঢ্যাঙা। কিন্তু ঠান্ডায় একটা মাফলারে মাথা-মুখ সব জড়ানো। কিন্তু কাল তো টুপি পরেছিল? তাও মুখটা ভালো করে দেখতে হবে। মুখটা উলটোদিকে ফেরানো। ওই তো মুখটা এদিকে ফেরাচ্ছে।

নব হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল লাইনের পাশে রাখা পাথরগুলোতে। হাঁটুর নীচে একটা প্রচণ্ড যন্ত্রণা। তার ঠিক কানের পাশ দিয়ে চলন্ত ট্রেনের চাকার ভয়ংকর আওয়াজ। জানালা ধরে ছুটতে ছুটতে কখন প্ল্যাটফর্মটা শেষ হয়ে গেছে সেটা নব খেয়ালই করতে পারেনি। অনেক কষ্টে নব উঠে দাঁড়াল। দূরে চলে যাওয়া ট্রেনটার পেছনের লাল আলো দুটো কেবল দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল, জানোয়ারের মতো একটা আওয়াজ। নব পকেট থেকে টেনে বার করল কানপুরিটা। তারপর শরীরের সমস্ত জোর দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'খানকির ছেলে, আজ পালালি, কিন্তু একদিন তোকে ধরবই, দেখব সেদিন। কোন্ বাপ তোকে বাঁচায়।'

বৃষ্টি আর কুয়াশায় ট্রেনের পেছনের লাল আলো দুটোও মিলিয়ে গেল।

## ॥ চৌত্রিশ ॥

ওরে বাবা, কীভাবে রিকশ চালাচ্ছে রে! ভয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছি। এই নবটার বোধহয় মাথায় গন্ডগোলই হয়েছে। কাল রাতে ভূত দেখেছে বলে পাড়া মাথায় করল, আজ দ্যাখো কীভাবে রিকশ চালাচ্ছে? এত জোরে কেউ চালায়? তবে এক দিক থেকে ভালো, তাড়াতাড়ি স্টেশনে পৌঁছোনো দরকার। মনে মনে ঠিক করে রেখেছি, কিচ্ছু করব না, দূর থেকে কেবল একবার চোখের দেখা দেখব। আর যদি কাছে পাই—দেখো, চোখ ভেঙে জল আসছে। বড়ো ঠান্ডা লাগছে, হাওয়া, তার ওপর বৃষ্টি। মাথার ওপর রিকশর ঢাকনাটা তুলে দিলে বৃষ্টির জলটা থেকে রেহাই পাই। না দরকার নেই, চারদিকে নজর রাখতে হবে।

রিকশটা হুড়মুড় করে স্টেশনের সিঁড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল। এই যা ভয় পেয়েছি, ট্রেনটা চলে এসেছে। যাক, ছেড়ে চলে তো যায়নি। ভাড়া না নিয়েই রিক্‌শওয়ালাটা সোজা ছুট লাগাল সিঁড়ি দিয়ে। কী হয়েছে আজ চম্পার বরের? এত তাড়া কীসের ওর? সে যাক যেখানে খুশি, কিন্তু আমাকেও তাড়াতাড়ি যেতে হবে, কখন আবার ট্রেনটা ছেড়ে দেয়। একবার চোখের দেখা দেখতেই হবে। কিন্তু নবর মতো অত জোরে বাপু আমি উঠতে পারব না। হাঁটুতে পুরোনো একটা ব্যথা আছে, সিঁড়ি ভাঙতে গেলে মটমট করে ওঠে। তার ওপর বৃষ্টির জলে একদম পেছল হয়ে আছে সিঁড়িটা। তাও যত তাড়াতাড়ি পারা যায় উঠতে শুরু করলাম।

চার পাঁচটা সিঁড়ি উঠেছি তখনই চোখে পড়ল, সিঁড়িটার ঠিক মুখে দাঁড়িয়ে আছে দারোগাটা। ট্রেনের দিকে তাকিয়ে আছে বলে পেছনে আমায় দেখতে পায়নি। দাঁড়িয়ে গেলাম। আঁটকুড়োর ব্যাটা এখানেও চলে এসেছে, মরেও না এগুলো। তাড়াতাড়ি নেমে এসে দাঁড়ালাম রিকশটার আড়ালে। আমাকে দেখতে

পেলে সব বুঝতে পারবে। তবে একটা কথা ভেবে স্বস্তি হচ্ছে, যে ভাবে কোমরে হাত দিয়ে ট্রেনের দিকে তাকিয়ে আছে, মনে হচ্ছে না সুরোকে পেয়েছে। পারবি না, ছেলের আমার তুখোড় বুদ্ধি। কিন্তু এত কাছে এসেও ছেলেটাকে একবার দেখতে পাব না। চাদরটাকে নাক পর্যন্ত ঘোমটার মতো টেনে সিঁড়ির অন্য দিকটা দিয়ে উঠতে শুরু করলাম। কয়েকটা সিঁড়ি উঠেছি, ট্রেনটা সিটি দিল, এই রে ছেড়ে দেবে। ওই পেছল সিঁড়ি দিয়েই ছুটতে শুরু করেছি। সিঁড়িটা পার করে উঠলাম আর ট্রেনটা ছেড়ে দিল। দারোগাটার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম চলে যাচ্ছে ট্রেনটা। ভগবান এত নিষ্ঠুর, ছেলেটাকে একবারটির জন্যেও চোখের দেখা দেখতে দিল না।

দারোগাটা ঘুরে দাঁড়াতেই একদম আমার মুখোমুখি। ভুরুটা কুঁচকে আমাকে জিজ্ঞাসা করল,

—এখানে কী করছেন?

হাবভাবেই বুঝলাম রেগে গেছে। বেশ হয়েছে। ধরতে পারেনি আমার সুরোকে। হেসে হেসে বললাম,

—বাবা, তুমি যাকে খুঁজতে এসেছিলে আমিও তাকে খুঁজতেই এসেছিলাম।

আমার কথা শুনে মনে হল আরো রেগে গেল, কেমন ঝাঁজিয়ে উঠে বলল,

—কি বলছেন?

—হ্যাঁ বাবা, তুমি যাকে খুঁজছিলে, আমিও তাকে খুঁজতেই এসেছিলাম।

আমার দিকে লোকটা চুপ করে তাকিয়ে আছে। যেন মনে মনে ভাবছে কী করবে আমায়। এবার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা ওর মুখের সামনে নাড়তে নাড়তে বললাম,

—পেলে না তো তাকে। পাবেও না।

দারোগাটা তখনও চুপ। এবার আমি হাততালি দিয়ে উঠলাম,

—কোনদিনও ধরতে পারবে না।

আমি জোরে জোরে হাসতে শুরু করলাম। এত জোরে আমি জীবনে কখনো হাসিনি। খিলখিল করে হাসলাম। পুলিশগুলো আমার চারদিকে পাথরের মুর্তির মতো দাঁড়িয়ে।

—মা কালীর দিব্যি। সে আবার আসবে, আবার আসবে, কিন্তু তোমরা কিচ্ছু করতে পারবে না, কোনদিনও কিচ্ছু করতে পারবে না।

বৃষ্টিটা আবার ঝেঁপে এল।